জালালাবাদে ইসলামী আন্দোলন

জামায়াত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা...

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

জালালাবাদে ইসলামী আন্দোলন

জামায়াত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা . . .

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জালালাবাদে ইসলামী আন্দোলন

জামায়াত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা . . .

অধ্যাপক ফজলুর রহমান

www.pathagar.com

জালালাবাদে ইসলামী আন্দোলন
জামায়াত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা . . .
অধ্যাপক ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মাওলানা হাবিবুর রহমান
মীরগঞ্জ ভিলা, মোহিনী ১০৪/বি
লামাপাড়া, শিবগঞ্জ, সিলেট।

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০০৮ইং

মূল্য
২০০.০০ (দুইশত) টাকা মাত্র।

বর্ণবিন্যাস
মোঃ শহিদুল ইসলাম

প্রচ্ছদ
রায়হান
Final Touch
আম্বরখানা, সিলেট

মুদ্রণ
পি এ প্রিন্টার্স
৪ আর এম দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
ফোন : ০৪৪৭৭৮০০৮১৩, ০১৯১৯ ০৩১৯১৭

পরিবেশক
শিব্বিরীয়া লাইব্রেরি
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট
ফোন : ০১৭১৫ ৬০২০২১

দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ০৪৪৭৭৮০৩২১১

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সাবেক আমীর
বর্ষীয়ান জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

Prof. Ghulam Azam
119 QAZI OFFICE LANE, MAGHBAZAR
DHAKA-1217 BANGLADESH.

PHONE: 401074
141 HIJRI
.... 199 ISAYE

অভিমত

বৃহত্তর সিলেটে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে অধ্যাপক ফজলুর রহমান দক্ষিণ এশিয়ায় উপমহাদেশের ইতিহাস থেকে অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ফলে এ বইটিতে এদেশে মুসলিম শাসনের অনেক চিত্র পাওয়া যায়। সাত আটশ বছরের দীর্ঘ ইতিহাস অধ্যয়ন করা যাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এ বইটি থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য তারা সহজেই পেয়ে যাবেন।

সিলেটে কখন, কিভাবে ও কাদের চেষ্টায় জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন গড়ে উঠে এবং জামায়াতের বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে কারা প্রয়োজনীয় অবদান রেখেছেন সে বিষয়ে লেখক যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হওয়ায় তাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

বৃহত্তর সিলেটে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত সকলের জন্য এ বইটি প্রেরণা যোগাবে বলে আমি আশা করি। তাদের পূর্বসূরীগণ অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে যে আন্দোলনকে সিলেটে অগ্রসর করে গেছেন, সে মহান আন্দোলনকে দ্রুত সাফল্যের পথে অগ্রসর করার উদ্দেশ্যে তারা তৎপর হলেই লেখকের শ্রম সার্থক হবে।

২৬শে এপ্রিল
২০০৮

গোলাম আযম
[illegible]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

জালালাবাদ বলতে বর্তমান সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জকে এমনকি আসামের করিমগঞ্জকেও বুঝায়। কেননা উপরিউক্ত এলাকাগুলো সাবেক সিলেট জেলার ৫টি মহকুমা ছিল। অতীতে এ এলাকাগুলোতে ৮টি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য ও একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ছিল। ১৩০৩ সালে হযরত শাহজালাল (র) এর অভিযানের মাধমে একটি খণ্ড রাজ্য অর্থাৎ গৌড়ে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। সময়ের ব্যবধানে গোটা অঞ্চল মুসলিম শাসনের অধীনে চলে আসে। বইটিতে খুবই সংক্ষিপ্তাকারে এ ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতাঁর সূর্য অস্তমিত হয়। বৃহত্তর সিলেট তথা জালালাবাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে ১৭৭০ সালে। তাঁর পর ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলে যে সব আন্দোলন সংগঠিত হয় তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এসেছে।

হযরত শাহজালাল (র) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে এ অঞ্চলে তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাতের বিশ্বাসভিত্তিক একটি সমাজ গড়ে উঠে। গড়ে উঠে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে সিলেট অঞ্চলের সুযোগ্য আলেম সমাজ। ইসলামী আন্দোলন ও সমাজ বিনির্মানে আলেম সমাজের অবদান অবিস্মরণীয়। বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাদের মধ্য থেকে মাত্র ৫০জনের জীবনের কয়েকটি দিক খুবই সংক্ষিপ্তকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ হয়। স্বাধীনতা অর্জিত হয়। সিলেট আসাম প্রদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল। অথচ আসাম যায় ভারতে আর সিলেট আসে পাকিস্তানে, পরবর্তীতে বাংলাদেশে- এর প্রেক্ষাপট বইতে আলোচিত হয়েছে।

১৯৫৩ সালে সিলেট জামায়াতে ইসলামীর কাজের সূত্রপাত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন দায়িত্বশীলদের ইন্তেকালের পর এ অঞ্চলে জামায়াতের সাংগঠনিক কার্যক্রম কিভাবে আরম্ভ হয় তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লোকের অভাব অনুভূত হয়। এ অনুভূতি থেকে জামায়াতের অতীত লেখার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি সাংগঠনিক জেলা 'সিলেট উত্তর' । এ উদ্যোগ বেশিদূর অগ্রসর না হওয়ায় গ্রন্থকারকে এগিয়ে আসতে হয়। বিষয়টি জামায়াতে ইসলামীর সিলেট অঞ্চলের 'আঞ্চলিক বৈঠকে' আলোচিত হয় এবং গ্রন্থকারকে সহযোগিতা করার জন্য আঞ্চলিক টীম সদস্য মৌলভী বাজারের সাবেক জেলা আমীর দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব ও মহানগর শুরা সদস্য, দক্ষিণাংশের থানা আমীর জনাব জাহেদুর রহমান চৌধুরীকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ তিনজনের যৌথ বৈঠকে পর্যালোচনার মাধ্যমে গ্রন্থ রচনার কাজ অগ্রসর হয়।

সূচনালগ্নের ইতিহাস লেখার প্রয়োজনে লন্ডনে বসবাসরত মাওলানা মুকাররম আলী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা সৈয়দ আবু নছর, অধ্যাপক

www.pathagar.com

মাওলানা সৈয়দ একরামুল হক, মাওলানা আব্দুন নূর মরহুম, দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে-এর সাবেক আমীর জনাব আব্দুস সালাম, সুনামগঞ্জের ডা. করম আলী, মৌলভী বাজারের জনাব সৈয়দ মুদাব্বির হোসেন প্রমুখের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। উনারা সবাই জামায়াতের এ অঞ্চলে সূচনালগ্নে জড়িত ছিলেন।

উপরিউক্ত সাক্ষাৎকার ও স্মৃতি থেকে তথ্য উপাত্ত জোগাড় করা হয়। অতীত আলোচনা করতে গিয়ে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উপর আলোকপাত করতে হয়েছে। ফলে উপমহাদেশের কিছু রাজনৈতিক ঘটনাবলি স্বাভাবিকভাবে আলোচনায় চলে এসেছে। যেমন মাওলানা মওদুদী মরহুমের ফাঁসীর দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে সিলেটে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই জানা নেই মাওলানা মওদুদী মরহুমকে কেন ফাঁসির দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়? তৎকালীন সরকার তাঁর সাথে কী আচরণ করেছিল? কেন জামায়াতে ইসলামীকে ১৯৬৪ সালে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল? উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে এ সংক্রান্ত আলোচনা চলে এসেছে।

পৃথক নির্বাচনের ব্যাপারে আজকাল কোন চর্চা নেই। অথচ এর একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। পৃথক নির্বাচন এ উপমহাদেশের ইতিহাস বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মাওলানা মওদুদী মরহুম পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য সারা দেশে আন্দোলন করেছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে পৃথক নির্বাচনের ইতিহাস ও যৌক্তিকতা আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৫৬ সালে মাওলানা মওদুদী মরহুম সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। তাঁর সফরের পর থেকে এ ভূখন্ডে জামায়াতে ইসলামী বিকশিত হয় এবং প্রতিটি রাজনৈতিক ইস্যুতে ভূমিকা রাখে। দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপর আলোচনা না করে শুধু জামায়াতে ইসলামী পরিচালিত রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বর্ণনা দিলে সামঞ্জস্যহীন ঘটনা মনে হতে পারে ভেবে খুবই সংক্ষিপ্তাকারে দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অতীতের কথা লিখতে গিয়ে সিলেটের কথা ও দেশের কথা চক্রাকারে এসেছে। দেশের প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে সিলেটের কর্মকান্ড উল্লেখ করলে তা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মনে হত। আবার সিলেটের কথা বলার আগে দেশের ঘটনা প্রবাহের ধারাবাহিক বিবরণ দিলে তা দেশের ইতিহাসের আলোচনা হয়ে যেত। তাই 'সাইক্লিক অর্ডারে' সিলেটের কথা ও দেশের কথা এসেছে।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের পতন এবং জিয়াউর রহমানের উত্থানের মাধ্যমে দেশের পট পরিবর্তন হয়। পরবর্তীতে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়। যার ফলশ্রুতিতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ- ১৯৭৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে। জামায়াতের আত্মপ্রকাশের পটভূমি আলোচনা করা হয়েছে । সংগঠনের আত্মপ্রকাশের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত জালালাবাদে জামায়াতের অবস্থান ও ক্রমবিকাশের বর্ণনা দিয়ে বই সমাপ্ত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে দেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বিবরণ দিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি । কারণ ইতিহাসের এ অধ্যায় সবার স্মৃতিতে আছে।

www.pathagar.com

বইয়ের পান্ডুলিপি তৈরি হবার পর আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর পরামর্শে একটি কপি সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব কামারুজ্জামানের কাছে প্রেরণ করা হয়। পান্ডুলিপির অন্য একটি কপি সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের কাছে পাঠানো হয়। জনাব কামারুজ্জামান পান্ডুলিপি পাঠ করে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু পরামর্শ প্রদান করেন। এদেশের ইসলামী আন্দোলন ও রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বর্ষিয়ান জননেতা মুহতাঁরাম অধ্যাপক গোলাম আযম পান্ডুলিপি পাঠ শেষে কিছু মন্তব্য লিখেন। তাঁর নিজ হাতে লিখিত মন্তব্য বইয়ের প্রারম্ভে সংযোজিত হয়েছে।

১৯৯৮ সালে সিলেট মহানগর সিলেট উত্তর, সিলেট দক্ষিণ, মৌলভীবাজার , সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ এ ছয়টি সাংগঠনিক জেলার উদ্ভব হয়। জেলাগুলো এক 'জোনের' অন্তর্ভুক্ত। এ সাল থেকে সংগঠনের সঠিক রেকর্ড লেখকের হস্তগত হয়। তাই এ সাল থেকে জেলা ও উপজেলা নেতৃবৃন্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ রচনাকালে যে সকল বই পুস্তকের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে তাঁর একটি তালিকা পরিশিষ্টে প্রদান করা হয়েছে।

যার অনুপ্রেরণা ও বারবার তাগাদার কারণে এ বই সমাপ্ত করা সম্ভব হল তিনি আমার জীবন সঙ্গিনী জামায়াতে ইসলামীর এক দায়িত্বশীলা খায়রুন্নেছা খাতুন। কম্পিউটার কম্পোজ করে আমাকে বাববার দেখিয়েছেন ভাই মো.শহিদুল ইসলাম। প্রাথমিক প্রুফ দেখেছেন ভাগ্নে জুনেদ আহমদ । বই প্রকাশের যাবতীয় খরচ বহনের দায়িত্ব নিয়েছেন সিলেট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সম্মানিত আমীর স্নেহাস্পদ মাওলানা হাবিবুর রহমান।

আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ। সবাইকে আল্লাহ্ তায়ালা জাযায়ে খায়ের দান করুন । বইটিতে তথ্যগত বা তত্ত্বগত ভুল থাকলে কিংবা কোন কিছু বাদ পড়লে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ্। জালালাবাদে ইসলামী আন্দোলন বেগবান হউক মহান মাবুদের কাছে এই মোনাজাত করছি।

মোঃ ফজলুর রহমান　　　　তারিখ : ১ জুন ২০০৮
দার আল খায়ের
মানিকপীর রোড, নয়াসড়ক
সিলেট। ফোন : ০৮২১ ৭১৫৬৫৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়
পূর্ব কথা /১৩
২য় অধ্যায়
১৯৫৮ সালের সামরিক আইন ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ /৬৯
৩য় অধ্যায়
সিলেটের মুসলিম শাসনের ইতিকথা /১১৬
৪র্থ অধ্যায়
সিলেট অঞ্চলের আলেম সমাজ /১৪৩
৫ম অধ্যায়
বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী কিছু ঘটনা /১৭৬
৬ষ্ঠ অধ্যায়
১৯৭৫ সালের দেশের পটপরিবর্তন ও পরবর্তী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া /১৮৬
৭ম অধ্যায়
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ /২০৬
৮ম অধ্যায়
মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জে জামায়াতের সূচনালগ্নের কার্যক্রম /২১৬
৯ম অধ্যায়
নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী /২২৯
১০ম অধ্যায়
শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন যাঁরা /২৫১
১১শ অধ্যায়
উল্লেখ করার মত কিছু ঘটনা /২৫৬
১২শ অধ্যায়
জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা /২৭৪
পরিশিষ্ট /৩১৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়
পূর্বকথা

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন তৎকালীন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের পলাশী প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতাঁর সূর্য অস্তমিত হয়। ঐদিন পলাশী প্রান্তরে বাংলা বিহার উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব-নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বাহিনীর সাথে বিলাত থেকে আগত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান রবার্ট ক্লাইভ এর নেতৃত্বে তাঁর বাহিনীর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর আলী খানের মিরজাফরীর কারণে নবাব যুদ্ধে পরাজিত হন। ফলে বণিকের মানদন্ড পরিণত হয় রাজদন্ডে। ইংরেজরা তাদের রাজনৈতিক সীমানা বাড়াতে থাকে। ১০০ বছরের ব্যবধানে ১৮৫৭ সালে মোঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লি তাদের পদানত হয়। ফলে পুরো উপমহাদেশ তাদের দখলে চলে যায়।

একনজরে বাংলার মুসলিম শাসকবৃন্দ (সুলতান/নবাব)

সময়	নাম
১২০৩-১২০৬	ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী
১২০৬-১২০৮	মালিক ইয়াজ উদ্দিন মুহাম্মদ শিরীন খিলজী
১২০৮-১২১০	হুসাম উদ্দিন ইওয়াজ
১২১০-১২১৩	সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী
১২১৩-১২২৭	সুলতান গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খিলজী
১২২৭-১৩৪১ দিল্লির সুলতানদের নিয়োগকৃত সুবাদারবৃন্দ	
১৩৪২-১৩৫৬	সুলতান সামস উদ্দিন ইলিয়াছ শাহ
১৩৫৬-১৩৮৯	সুলতান সিকান্দর শাহ
১৩৮৯-১৩৯৬	সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ
১৩৯৬-১৪০৬	সুলতান সাইফুদ্দিন হামজা শাহ
১৪০৬-১৪১৪	সুলতান সামস উদ্দিন/আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ
১৪১৪-১৪৩২	যদু ওরফে জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ

www.pathagar.com

১৪৩২-১৪৩৬	সামস উদ্দিন আহমদ শাহ
১৪৩৬-১৪৬০	নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ
১৪৬০-১৪৭৪	রুকন উদ্দিন বরবক শাহ
১৪৭৪-১৪৮১	সামস উদ্দিন ইউসুফ শাহ
১৪৮১-	ছিকন্দর শাহ (২য়)
১৪৮১-১৪৮৭	জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহ
১৪৮৭-	শাহজাদা বারবাক শাহ
১৪৮৭-১৪৯০	সাইফ উদ্দিন ফিরোজ শাহ
১৪৯০-১৪৯১	নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ
১৪৯১-১৪৯৪	সামস উদ্দিন মুজাফফর শাহ
১৪৯৪-১৫১৯	সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
১৫১৯-১৫৩২	আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ
১৫৩২-১৫৩৯	গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ
১৫৩৯-১৫৪০	শের শাহ সূর
১৫৪০-১৫৪৫	খিজির খান
১৫৪৫-১৫৫৫	মুহাম্মদ খান সূর
১৫৫৫-১৫৬১	খিজির খান বাহাদুর শাহ
১৫৬১-১৫৬৪	গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ
১৫৬৪-১৫৭২	সুলায়মান কররানী
১৫৭২-	বায়জিদ শাহ কররানী
১৫৭২-১৫৭৬	দাউদ শাহ কররানী

www.pathagar.com

১৫৭৬-১৭০৩ মুঘল সম্রাটগণ কর্তৃক নিযুক্ত সুবাদারবৃন্দ	
১৭০৩-১৭২৩	নবাব মুর্শিদ কুলি খান
১৭২৭-১৭৩৯	সুজাউদ্দিন
১৭৩৯-১৭৪০	সরফরাজ খান
১৭৪০-১৭৫৬	আলীবর্দী খান
১৭৫৬-১৭৫৭	সিরাজ-উদ-দৌলা
ইংরেজ কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়ার অধীনে পরাধীন নবাব	
১৭৫৭-১৭৬০	মীর জাফর আলী খান
১৭৬০-১৭৬৩	মীর কাসিম
১৭৬৩-১৭৬৫	মীর জাফর আলী খান
১৭৬৫-১৭৬৬	নাজমুদ্দৌলা
১৭৬৬-১৭৭০	সাইফুদ্দৌলা

(বি. দ্র. উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের সময় ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ করাচী অঞ্চলের অত্যাচারী শাসক রাজা দাহিরকে শায়েস্তা করার জন্য মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ সালে রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু দখল করেন। অতঃপর তিনি পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হন। এ সময় তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে আর অগ্রসর না হয়ে ফিরে যান। যাবার প্রাক্কালে মুসলিম শাসক নিয়োগ করে যান। ফলে সিন্ধু থেকে মুলতান পর্যন্ত মুসলমান শাসন কায়েম হয়। এর পাঁচশ বছর পর ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের মাধ্যমে ১২০৩ সালে মুসলিম সালতানাত কায়েম হয়। প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর পর ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হয়।)

বাংলার পরাধীনতাঁর ১৯০ বছর এবং দিল্লির পরাধীনতাঁর ৯০ বছর পর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান[১] এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আন্দোলনের ফলে দুটি দেশ স্বাধীন হয়। কংগ্রেস একজাতিতত্ত্বের (মূল কথা ;- ভারতের সকল বাসিন্দা এক জাতি) ভিত্তিতে এবং

১. পাকিস্তান দুটি খন্ডে বিভক্ত ছিল যথা– পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ এবং অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান বর্তমানে পাকিস্তান।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ দুই জাতিত্বের (মূল কথা :-মুসলমানগণ ঈমান, আকিদা, আমল-আখলাক, চাল-চলন, জীবনযাপন পদ্ধতি, তাহযীব-তমদ্দুন, সর্বব্যপারে একটি আলাদা জাতি) ভিত্তিতে ইংরেজ বিতাড়নের লক্ষ্যে স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন চালিয়ে যায়।

পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন- "পাকিস্তানের অর্থ- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ।" "১৪ শত বছর আগে আমাদের সংবিধান রচনা হয়েছে। আল কুরআনই হবে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান।"

১৯৪০ সালের ২২ ও ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের উপস্থাপনায় পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ :

পাকিস্তান প্রস্তাব

"নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অত্র অধিবেশনের সুবিবেচিত অভিমত এই যে, এ দেশে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই কার্যকর হইতে পারে না কিংবা মুসলমানদের নিকট তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না যদি না অতঃপর বর্ণিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে তাহা পরিকল্পিত হয়। যথা, ভৌগলিক নৈকট্য সমন্বিত ইউনিটগুলির প্রয়োজন অনুসারে স্থানিক রদবদল পূর্বক সীমানা চিহ্নিত করিয়া অঞ্চল গঠন করিতে হইবে এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল যেমন, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল সমন্বয়ে অবশ্যই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করিতে হইবে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত ইউনিটগুলি স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হইবে।

ইউনিট ও অঞ্চলগুলিতে সংখ্যালঘুদের সহিত পরামর্শক্রমে তাহাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্তে সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ও ম্যান্ডেটরী নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করিতে হইবে এবং ভারতের যে সকল অংশে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে তাহাদের সহিত পরামর্শক্রমে তাহাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যেও সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করিতে হইবে।"

এ সময় উলামায়ে কেরামের একাংশ দুই জাতিতত্ত্বের বিপক্ষে এবং এক জাতিতত্ত্বের পক্ষে কংগ্রেসের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে ভারতভূমিকে অখণ্ড রেখে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একই সময়ে দেওবন্দের মশহুর আলেম "এক জাতিতত্ত্ব ও ইসলাম" নামে একখানা বই লিখে এক জাতিতত্ত্ব ও অখণ্ড ভারতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। উপমহাদেশের অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন দার্শনিক কবি ড.আল্লামা ইকবাল পাকিস্তান তথা মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির বিপক্ষে একজাতিতত্ত্বের পক্ষে ফতোয়া প্রদান, বই লেখা এবং ভারতীয় কংগ্রেসের সাথে আন্দোলন করার মারাত্মক পরিণ তি সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে কবিতাঁর মাধ্যমে সজাগ করেন।

www.pathagar.com

ড. ইকবালের কবিতাঁর অংশ :

বোঝেন নি ঐ আজমবাসী
দ্বীনের মর্ম- বিহ্বলতা,
দেওবন্দে তাইত হুসেন আহমদ
কন আজব কথা।
ওয়াতন থেকে মিল্লাত হয়
এই কথা ফের গান যে তিনি
বোঝেননি হায় নবীর মাকাম
আল - আরাবীর মান যে তিনি।
নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দাও
নিজেকে, - এই দ্বীনের দাবি,
পৌঁছতে না পারো যদি
সবই হবে ' বু-লাহাবী।'

(অনুবাদ : কবি ফররুখ আহমদ)

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (জন্ম-১৯০৩ ও মৃত্যু-১৯৭৯) দুই জাতিতত্ত্বের সমর্থনে কুরআন, হাদীস ও ইসলামের ইতিহাস ঘেটে অত্যন্ত তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ (মাসআলায়ে কওমিয়াত) নামে একটি বই লিখে জাতির সামনে পেশ করেন। (বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে)

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর বইতে উল্লেখ করেন:

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির উপর এক নতুন জাতীয়তাঁর প্রাসাদ গড়েছেন। এ জাতীয়তাঁর ভিত্তি বস্তুবাদী ও গতানুগতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নয় বরং আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের উপর। সে মানুষের সামনে এক প্রাকৃতিক সত্যতা পেশ করে যার নাম ইসলাম। এ খোদার বন্দেগী ও আনুগত্য, মনের পবিত্রতা ও সৎকর্মশীলতা এবং তাঁরওয়ার দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানায়। তাঁরপর বলে যে, এ আহবানে যে সাড়া দিবে সে এক জাতিভুক্ত এবং যে আহবান প্রত্যাখ্যান করবে সে অন্য জাতিভুক্ত। একটি জাতি ঈমান ও ইসলামের, তাঁরা এক উম্মাহ । অন্য জাতি কুফর ও পথভ্রষ্টতাঁর। তাঁর অনুসারীগণ তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্য থাকলেও তাঁরা এক জাতিভুক্ত।”

www.pathagar.com

"ইসলামী জাতীয়তা যে পরিসীমা এঁকে দিয়েছে তা কোন ভাবপ্রবণ ও জড়বাদী পরিসীমা নয়- বরং একটি বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত পরিসীমা। এ পরিসীমা পরিবেষ্টন করে আছে কালেমা তাইয়্যেবা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ (স)। এ কালেমার উপর বন্ধুত্ব এবং এর উপর দুশমনি। এর স্বীকৃতিই একত্র করে-এর অস্বীকৃতি পৃথক করে। যাদেরকে পৃথক করে দিয়েছে তাদেরকে না রক্তের সম্পর্ক, না মাটির, না ভাষার, না বর্ণ ও বংশের, না হালুয়া রুটির, না রাষ্ট্রের সম্পর্ক একত্র করতে পারে। যাদেরকে কালেমা একত্র করে দিয়েছে তাদেরকে কেউ পৃথক করতে পারে না।"

"আমি মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত থাকব যতক্ষণ আমি জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে ইসলামী মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করব। এ দৃষ্টিভঙ্গি যখন পরিত্যাগ করব, অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদ গ্রহণ করে, তখন আমার অজ্ঞতা হবে যদি আমি মনে করি আমি এখনও মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত।"

এ বইটি এক জাতিতত্ত্বের বিপক্ষে এবং দুই জাতিতত্ত্বের পক্ষে এক বিরাট হাতিয়ারে পরিণত হয়। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বইটির লক্ষ লক্ষ কপি ছাপিয়ে প্রচার করেন এবং জনমত গড়ে তুলেন। ফলে এক জাতিতত্ত্বের পক্ষের উলামা এবং কংগ্রেস সমর্থক ও তাদের প্রভাবান্বিত ব্যক্তিবর্গ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীর উপর সাংঘাতিক ক্ষেপে যান এবং নানাভাবে তাঁর বিরোধিতা করতে থাকেন। তাঁরা ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদ এবং খণ্ড বিখণ্ড করার প্রস্তাব ও পরামর্শকে অসহ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। জবাবে মাওলানা লিখেন :

"মুসলমান হিসেবে আমার কাছে এ প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নাই যে, ভারত অখণ্ড থাকবে না দশ খণ্ডে বিভক্ত হবে। সমগ্র পৃথিবী এক দেশ। মানুষ তাকে সহস্র খন্ডে বিভক্ত করেছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবী যত খন্ডে বিভক্ত হয়েছে তা যদি ন্যায়সঙ্গত হয়ে থাকে , তাহলে ভবিষ্যতে আরো কিছু খন্ডে বিভক্ত হলেই বা ক্ষতি কি? এ দেব প্রতিমা খণ্ড বিখণ্ড হলে মনোকষ্ট হয় তাদের, যারা একে দেবতা মনে করে। আমি যদি এখানে এক বর্গ মাইল জায়গা পাই যেখানে মানুষের উপর খোদা ব্যতিত আর কারো প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব থাকবে না, এ সামান্য ভূখণ্ডকে আমি সমগ্র ভারত থেকে অধিকতর মূল্যবান মনে করব।" (সিয়াসী কাশমাকাস-তৃতীয় খণ্ড, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী) পারে না।

মাওলানা মওদুদী ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক মত এক হলেও তিনি মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের ঈমান, আকিদা ও আমল আখলাক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যদিও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতে পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার ওয়াদা করেছেন কিন্তু বাস্তবে তাদের অধিকাংশের ঈমান, আকিদা ও আমল আখলাকের যে অবস্থা, তাতে তাদের দ্বারা ইসলামী হুকুমাত কায়েম করা এবং সুষ্ঠুভাবে তা পরিচালনা করা মোটেও সম্ভব হবে না। তিনি ১৯৪০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সেমিনারে "ইসলামী হুকুমাত কিসতাঁরাহ কায়েম

www.pathagar.com

হোতি হ্যায়।"(ইসলামী বিপ্লবের পথ) শিরোনামে বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে তিনি বলেন:- লেবু গাছের চারা রোপণ করে যেমন মিষ্টি আমের ফল আশা করা যায়না তেমনই ইসলামে অজ্ঞ, ইসলাম বিরোধি বিশ্বাস ও আমল আখলাক সম্পন্ন অধিকাংশ লোকদের সমন্বয়ে গঠিত আন্দোলনের দ্বারা ইসলামী হুকুমাত কায়েম বাস্তবে সম্ভব হবে না। তিনি তাঁর বক্তব্যে ইসলামী হুকুমাতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এবং তা কায়েম করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন। মাওলানা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে, পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং "তরজমানুল কুরআন" নামক মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার উপযুক্ত লোক তৈরি করার জন্য পরামর্শ দিতে থাকেন। কিন্তু তেমন ফল হল না। মাওলানা আক্ষেপ করে বলেন- "আমি যখনই অনুভব করলাম যে, আমার সব প্রচেষ্টা অরণ্যে রোদন হচ্ছে তখন আমি একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত করলাম।"

"প্রকৃতপক্ষে এ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না যে, কোন এক ব্যক্তির মনে হঠাৎ এক খেয়াল চাপল যে, সে একটা দল করবে আর অমনি কিছু লোক একত্র করে একটা দল বানিয়ে ফেলল। বরং এ ছিল আমার ক্রমাগত বাইশ বছরের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, গভীর অধ্যয়ন, চিন্তা ও গবেষণার ফসল যা একটা পরিকল্পনার রূপ কায়েম করে এবং সে পরিকল্পনার ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়।" (জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর)

"আমি এবং আমার সাথে একমত এমন অনেকে গত তিন বছর ধরে এ চেষ্টা করে আসছিলাম যে, বর্তমানে মুসলমানদের যে বড় বড় দলগুলো আছে তাদের সকলে অথবা তাদের যে কোন একটি দল তাদের গঠনপদ্ধতি ও কর্মসূচিতে এমন কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসুক যাতে করে ইসলামের এই প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় এবং একটি নতুন দল গঠনের প্রয়োজন না থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের সেই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। এরপর যারা বর্তমান দলগুলোর উপর সন্তুষ্ট নয় এবং সত্যিকারের ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী তাদেরকে একত্র করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর রইল না। অতএব ১৯৪১ সালের আগস্টে তাদেরকে দিয়ে একটি সম্মেলন আহবান করা হয় এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়। (জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন)

"১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট ৭৫জন সদস্য এবং ৭৪ টাকা চৌদ্দআনা তহবিল নিয়ে পুঞ্চরোড, মুবারক পার্ক, লাহোর-তরজমানুল কুরআন দফতরে সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়। উপমহাদেশ তথা সারা বিশ্বে সার্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত দ্বীন কায়েমের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করাই জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারিত হয়।

সম্মেলনে মাওলানা মওদুদী সর্বসম্মতিক্রমে জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, "জামায়াতে ইসলামীতে যাঁরা যোগদান করবেন তাঁদেরকে

www.pathagar.com

এই কথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, জামায়াতে ইসলামীর সামনে যেই কাজ রয়েছে তা কোন সাধারণ কাজ নয়। দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাঁদেরকে পাল্টে দিতে হবে। দুনিয়ার নীতি নৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি সবকিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে। দুনিয়ায় আল্লাহ-দ্রোহিতাঁর ওপর যেই ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তা বদলিয়ে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর কায়েম করতে হবে। সকল শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম । . .... প্রতিটি পদক্ষেপের পূর্বে তাঁদেরকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে তাঁরা কোন কঠিন পথে পা বাড়াচ্ছেন ।" (সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী-এ. কে. এম. নাজির আহমদ, পৃষ্ঠা নং ২৯-৩০)

ভারত বিভাগ ও দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত জামায়াতের গঠনমূলক কার্যক্রম বিশেষ করে দাওয়াতি কাজ ও সংগঠন সম্প্রসারণের কাজ চলতে থাকে। ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪আগস্ট পর্যন্ত মোট রুকন সংখ্যা হয় ৬২৫জন। ভারত বিভাগের ফলে ভারতীয় অংশে ২৪০জন রুকন থেকে যান। আর পাকিস্তান ভূখন্ডে যারা ছিলেন এবং যারা হিজরত করে আসেন তাদের সংখ্যা হয় ৩৮৫ জন। তম্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র রুকন ছিলেন মাওলানা আব্দুর রাহম (জন্ম ১৯১৮ ও মৃত্যু ১৯৮৭)। জামায়াতে ইসলামী ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের সংগে সংগে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান নামে আলাদা স্বাধীন সংগঠনে পরিণত হয়।

সিলেটে ইসলামী আন্দোলনের সুবাতাস

ভারত বিভাগের সময় সিলেটে ইসলামী আন্দোলনের তেমন কোন কাজ শুরু হয় নি। তবে মাওলানা মওদুদী রচিত সাহিত্য এবং মাসিক 'তরজমানুল কুরআন' সম্পর্কে কয়েকজন ব্যক্তি জানতেন। তাদের অন্যতম হলেন:

১. জনাব আব্দুল্লাহ বানিয়াচঙ্গী- তিনি মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৪৬ সালের ৭, ৮ ও ৯ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কনভেনশনে তিনি ডেলিগেট হিসেবে যোগদান করেন। সেখানে তিনি মাওলানা মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি কিছু বই-পুস্তক সাথে নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে বানিয়াচং আসন থেকে জামায়াতে ইসলামীর নমিনী হন।

২. মাওলানা মাহমুদ উসমানী-তিনি উর্দুভাষী ছিলেন। তিনি সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। তিনি তরজমানুল কুরআন ও কিছু ইসলামী সাহিত্য সিলেটে আনেন।

৩. মাওলানা ছাখাওয়াতুল আম্বিয়া-তাঁর বাড়ি রফিপুর, গোলাপগঞ্জ। তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলামের নেতা ছিলেন। তিনি মাওলানার রচিত ইসলামী সাহিত্য ও 'তরজমানুল কুরআন' সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

www.pathagar.com

৪. মাওলানা আব্দুর রব কাসেমী-বাড়ি কানাইঘাট। তিনি মনসুরিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দেওবন্দে অধ্যয়নকালীন সময়ে মাওলানার পক্ষে বিপক্ষে প্রচারণা শুনেন এবং নিজে মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

৫. মাওলান মুহাম্মদ হোসেন-জৈন্তার নিজ পাটে তাঁর বাড়ি। তিনি জ্ঞানের সমুদ্র ছিলেন, তাঁকে বলা হত "বাহারুল উলূম" অর্থাৎ জ্ঞানের সমুদ্র। তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসার অধ্যাপক ছিলেন। আসাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী সিলেটের বাসিন্দা জনাব আব্দুল হামিদ সিলেট আলীয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে তাঁকে নিয়ে আসেন। তিনি মাওলানা মওদুদী ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিলেন। মাওলানা মওদুদীর মতামত যে সঠিক তা তিনি দলিল দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাক জামায়াতের সাবেক আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব কলকাতা আলীয়া মাদরাসায় মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের ছাত্র ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ হোসেন সাহেব তাঁর প্রিয় ছাত্র আব্দুর রহীমকে মাওলানা মওদুদী সম্পাদিত মাসিক 'তরজমানুল কুরআন' এর একটি কপি দিয়ে বলেছিলেন; 'আব্দুর রহীম: এই পত্রিকা নিয়মিত পড়বে। অনেকে এ পত্রিকার মর্ম বুঝতে পারবে না, তুমি পারবে'। মাওলানা আব্দুর রহীম ১৯৬৭ সালে সিলেটের জিন্নাহ হলে জামায়াতে ইসলামীর এক কর্মী সমাবেশে এই তথ্য প্রদান করে বলেন, আমার উস্তাদ মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন সাহেবের মাধ্যমেই আমার জামায়াতে ইসলামীর সাথে পরিচয় ও যোগাযোগ হয়।

৬. প্রফেসর মজদুদ্দিন-তিনি সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাসট্রির সাবেক সভাপতি সাফওয়ান চৌধুরীর শ্রদ্ধেয় দাদা এবং দরগা মহল্লার মুহিউস-সুন্নাহ চৌধুরীর শ্রদ্ধেয় পিতা। তিনি এমসি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সেখানেই তিনি মাওলানা মওদুদী সম্পর্কে অবহিত হন।

উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গ মাওলানা মওদুদী, জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানার রচিত ইসলামী সাহিত্য এবং "তরজমানুল কুরআন" সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোন সংগঠন কায়েম করেন নি।

জামায়াতের প্রতি পাকিস্তান সরকারের আক্রোশ

দেশ বিভাগের পর জামায়াতে ইসলামী বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী পাকিস্তান সরকারের মারাত্মক রোষানলে পড়েন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তেকালের মাত্র ২৩দিন পর ১৯৪৮ সালের ৪ অক্টোবর মাওলানাকে গ্রেফতাঁর করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ১৯৫০ সালের ২৮মে তিনি কারামুক্ত হন। ১৯৫৩ সালের ২৮ মার্চ মাওলানাকে সামরিক আইনে গ্রেফতাঁর করা হয় এবং ৮মে সামরিক আদালতে মৃত্যু দন্ডাদেশ প্রদান করা হয় ।

www.pathagar.com

মাওলানার মৃত্যু দন্ডাদেশের সংবাদে সারাদেশ তথা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচন্ড বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয়। অবশেষে ১৯৫৫ সালের ২৯এপ্রিল তিনি নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালের ৪ঠা জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীকে পাকিস্তান সরকার বেআইনী ঘোষণা করে এবং মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদীসহ সকল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মজলিশে শুরা সদস্যবৃন্দকে গ্রেফতাঁর করা হয়।

সিলেটে জামায়াতে ইসলামী সংগঠন ও এর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে খুবই সংক্ষেপে পাকিস্তান সরকার ও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা দরকার।

পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর ব্রিটিশ ভারতে বিলাতের রাণীর শেষ প্রতিনিধি ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন । তিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হতে চাইলেন। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ ও কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কোন অবস্থায়ই একজন ইংরেজকে রাষ্ট্রপ্রধান করতে সম্মত হলেন না। ফলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্ষুব্ধ হন। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হলেন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল। অন্যদিকে পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু হলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। নেহেরু পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁর মেয়ে ইন্দিরা এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও লেডী মাউন্টব্যাটেন উভয় পরিবার পারিবারিক দিক দিয়ে খুবই ঘনিষ্ঠ হন। নেহেরু মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল বানিয়ে রাখতে রাজি হয়ে যান। নেহেরু এবং মাউন্টব্যাটেন উভয় ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানের প্রাপ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ তৎকালীন ৫৫ কোটি রুপীসহ সকল সম্পদ আটক করেন।

এ সময় ভারতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেন যে ১৭দিন পর যখন আগস্ট মাস সমাপ্ত হবে তখন পাকিস্তান সরকার সরকারি কর্মচারীদের বেতন দিতে ব্যর্থ হবে। ফলে তাঁরা ভারতের সাথে পুনঃ একত্রিত হতে বাধ্য হবে। বাস্তবিকই মাস শেষে বেতন প্রদান করা ছিল বড় সমস্যা। অন্যদিকে হিন্দুদের দ্বারা তাড়িত হয়ে লাখ লাখ মুহাজির পাকিস্তানের উভয় অংশে আশ্রয় নেয়। তাদের খাদ্য, বাসস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ছিল মহাসংকট। একই সময়ে কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়। ফলে পাকিস্তান সমস্যা স্থানে পরিণত হয়।

এ সময় পাকিস্তানের হাল ধরেন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব, সর্বস্তরের নাগরিকদের ত্যাগ, কুরবানী ও দেশপ্রেম সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয় এবং নতুন দেশ টিকে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য পাকিস্তানের ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্থলে দলীয় সিদ্ধান্তে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম লীগ প্রধান ঢাকার খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন। তিনি ছিলেন নরম ও দুর্বল প্রকৃতির লোক। লিয়াকত আলী খান ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তিনি সরকারি কার্যক্রম চালিয়ে যেতে লাগলেন। ইতোমধ্যে দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টি হল। একই সাথে শুরু হল আমলাদের ষড়যন্ত্র।

www.pathagar.com

আমলাদের ষড়যন্ত্রে পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালের ১৬অক্টোবর নিহত হন। এরপর আমলাদের চক্রান্তে ক্ষমতাধর আমলা পাঞ্জাবী চক্রের হোতা গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন। তিনি খাজা নাজিমুদ্দীনকে পাক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পর গোলাম মোহাম্মদ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে খাজা নাজিমুদ্দীনের কেবিনেট বাতিল করেন এবং আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন থেকে উড়ায়ে নিয়ে এসে (Flown in) আরও এক সরকারি আমলা রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আলী (বগুড়াকে) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। আমলাদের চক্রান্তের জাল সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ '৫৫ সালে সমগ্র পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। গণপরিষদ ভেঙে দেন এবং সামরিক আমলা মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা, জেনারেল আইয়ুব খান এবং অখণ্ড ভারতপন্থী কংগ্রেস নেতা সীমান্তগান্ধী খান আব্দুল গাফফার খানের ভাই ডা.খান সাহেবকে কেবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শরীক করেন। গণপরিষদের স্পীকার মৌলভী তমিজ উদ্দীন খান মাওলানা মওদুদীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মাওলানা তাকে মামলা করার পরামর্শ এবং সমস্ত খরচ বহনের আশ্বাস দেন।"গণপরিষদ ভেঙে দিবার ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের এখতিয়ার বহির্ভূত"-এই মর্মে সিন্ধু হাইকোর্টে স্পীকার মৌলভী তমিজ উদ্দীন খান মামলা দায়ের করেন এবং পক্ষে রায় পান। সরকার সুপ্রীম কোর্টে আপীল করে। সুপ্রীমকোর্ট সমঝোতামূলক রায় দেয়। গভর্নর জেনারেলের অর্ডিনেন্স জারি করে কনভেনশনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার এখতিয়ার বাতিল করে এবং নতুন গণপরিষদ পরোক্ষভাবে নির্বাচন করার আদেশ প্রদান করে। ইতোমধ্যে গোলাম মোহাম্মদ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এবার সামরিক কর্মকর্তা মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন। নতুন গণপরিষদ গঠিত হবার পর-প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন হয়। আরো এক আমলা চৌধুরী মুহাম্মদ আলী এবার প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় বছর পর ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচিত হয় এবং ২৩শে মার্চ কার্যকর হয়। শাসনতন্ত্র মোতাবেক ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা চলে যাক তা সামরিক ও বেসামরিক আমলারা মেনে নিতে পারল না। শুরু হল আবার ষড়যন্ত্র। প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর শাসনতন্ত্র বাতিল করে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খানকে মার্শাল-ল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করেন। এই আইয়ুব খান পরে প্রেসিডেন্ট হন এবং ১০ বছর দাপটের সাথে ক্ষমতা পরিচালনা করেন। অধিকার বঞ্চিত জনগণ শুরু করে আন্দোলন। শুরু হয় গণ অভ্যুত্থান। ফলে বাধ্য হয়ে আইয়ূব খান সেনাপতি ইয়াহইয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহইয়া খান ক্ষমতা হাতে নেন। তিনি গণসেন্টিমেন্ট অনুভব করে উপায়ন্তর না দেখে জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ লাভ করে ১৬০টি আসন। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসনও লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভূট্টোর নেতৃতে পিপুলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও বিজয়ী হতে পারে নি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জনগণের ভোটে এটাই অখণ্ড পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচনের সময় পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, বিবেচনা ও পছন্দের মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হল । নির্বাচনের রায়ে প্রতিয়মান হয় যে, ভবিষ্যৎ-এ দুই অঞ্চলের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা দুঃসাধ্য হবে।[২] নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার কথা। কিন্তু ভুট্টো আওয়াজ তুললেন 'এধার হাম ওধার তুম।' অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার দাবি করলেন। এক দেশ দুই প্রধানমন্ত্রী! বাস্তবে তা কি সম্ভব? যা হবার তাই হল। ভুট্টো এবং ইয়াহইয়া ষড়যন্ত্র করলেন- শেখ মুজিবের আহবানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল। ইয়াহইয়া খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, ইপিআর, পুলিশ, সিভিল অফিসার, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র জনতা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর লেলিয়ে দিলেন। শুরু হল গণহত্যা। স্বাভাবিকভাবে প্রতিরোধ শুরু হল, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, পাকিস্তান আজও সামরিক শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

একনজরে পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ

গভর্নর জেনারেল	
১৯৪৭-'৪৮	কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ
১৯৪৮-'৫১	খাজা নাজিম উদ্দিন
১৯৫১-'৫৫	গোলাম মুহাম্মদ
১৯৫৫-'৫৬	মেজর জেনারেল ইস্‌কান্দার মির্জা
বি.দ্র.: ৫৬ সালে শাসনতন্ত্র পাস হবার পর রাষ্ট্রপ্রধানের পদবী হয় প্রেসিডেন্ট	
১৯৫৬-'৫৮	মেজর জেনারেল ইস্‌কান্দার মির্জা
১৯৫৮-'৬৯	ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান
১৯৬৯-'৭১	মেজর জেনারেল ইয়াহইয়া খান

২. বি:দ্র: জাতীয় নির্বাচনের পর ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার নিয়মিত বার্ষিক অধিবেশন আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদুদীর সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনায় আসে। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, 'যদি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পর্যায় ক্রমে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে জামায়াত এর বিরোধিতা করবে না। এ বিষয়ে এখানকার (পূর্ব পাকিস্তানের) প্রাদেশিক জামায়াতকে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পূর্ণ এখতিয়ার দেওয়া হয়।" (পলাশী থেকে বাংলাদেশ-অধ্যাপক গোলাম আযম। পৃষ্ঠা নং-১১)

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী	
১৯৪৭-'৫১	লিয়াকত আলী খান
১৯৫১-'৫৩	খাজা নাযিম উদ্দিন
১৯৫৩-'৫৫	বগুড়ার মুহাম্মদ আলী
১৯৫৫-'৫৬	চৌধুরী মুহাম্মদ আলী
১৯৫৬-'৫৭	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
১৯৫৭	আই.আই. চুন্দ্রীগড়
১৯৫৭-'৫৮	ফিরোজ খান নূন

সিলেটে জামায়াতে ইসলামীর কাজের সূত্রপাত

সিলেটে ১৯৫৩ সালে বন্দর বাজার বাটা সু কোম্পানির ম্যানেজার হয়ে আসেন বিহার থেকে আগত মুহাজির জনাব আকিল খান। সাথে আসেন তাঁর ভাই জনাব কামিল খান। তিনি সিলেট জামেয়া ইসলামীয়া স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সময়ে সিলেটের জেলা প্রশাসক ছিলেন জনাব নোমানী। তিনি নিজের উদ্যোগে মিরের ময়দানে বর্তমান ব্লু-বার্ড স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ এলাকায় একটি উন্নতমানের ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাম দেন ' জামেয়া ইসলামীয়া '। স্কুলটি অবশ্য স্থায়ী হয় নি। তাঁর বিদায়ের পর স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করা যায় যে, প্রশাসক জনগণের নিয়ন্ত্রক। প্রশাসন যে দিকে জনসাধারণকে চালায় জনগণ সে দিকে ধাবিত হয়। জেলা প্রশাসক নোমানী সাহেব ভবিষ্যত বংশধরদেরকে ইসলামী আদর্শের ছাঁচে গঠন করতে চাইলেন, জনগণ তা গ্রহণ করল। পরবর্তী জেলা প্রশাসক এসে এ আদর্শ পছন্দ করলেন না, ফলে জামেয়া স্কুল বন্ধ হয়ে গেল।

কামিল খান সাহেব জামায়াতের কর্মী ছিলেন। তিনি নিয়ে আসেন জামায়াতে ইসলামীর উর্দু সাহিত্য ও তরজমানুল কুরআন। তাদের বাসা ছিল জিন্দাবাজার, বর্তমানে আল হামরা শপিং সিটির বিপরীতে রাস্তার পূর্ব পাশে। তাঁর বাসা থেকে আলীয়া মাদরাসা ও হোস্টেল নিকটেই ছিল। তিনি মাদরাসার ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ইসলামী সাহিত্য বিতরণ করেন। এ সময় সাহিত্য পড়ে এবং কামিল খানের সাথে মোলাকাত করে যারা আকৃষ্ট হন- তাঁরা হলেন মাওলানা মুকাররম আলী (বিয়ানীবাজার) মাওলানা কাজী সৈয়দ মুশতাঁর আহমদ, সৈয়দ আবু নসর (জগন্নাথপুর); আব্দুল লতিফ (নবীগঞ্জ), মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (জামালগঞ্জ); মাওলানা আজিজুর রাজা চৌধুরী (ছাতক);শাহ হাবিবুর রহমান (পীরমহল্লা)। সৈয়দ একরামুল হক (জগন্নাথপুর) ১৯৫২ সালে সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসায় ১ম বর্ষ আলিম ক্লাসে ভর্তি হন। উল্লেখিত ব্যক্তিগণ তাঁর সিনিয়র ছিলেন। সৈয়দ আবু নসর তাঁকে মাওলানা মওদুদীর বই পড়ান। তিনি আকৃষ্ট হন। কিন্তু তিনি দাওয়াত কবুল করেন নি। দেওবন্দ থেকে মাওলানা মওদুদীর বিরুদ্ধে যে

www.pathagar.com

সমস্ত বই পুস্তক প্রকাশ করা হয় তা একরামুল হক সাহেবের হস্তগত হয়। ফলে তিনি জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে যান। যদিও তিনি ফরম পূরণ করেন নি তবুও তিনি নিয়মিত বই পড়তেন এবং কাজে সহযোগিতা করতেন। পরে তিনি ১৯৫৭ সালে সিলেটে ইসলামী ছাত্র সংঘের কাজের সূত্রপাত করেন। কামিল খান তাঁর বাসায় আনুষ্ঠানিক জামায়াতের বৈঠক আরম্ভ করেন। বৈঠকে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ যোগদান করতে থাকেন। এ সময় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সম্পাদক জনাব নুরুল হক সাহেবের শ্বশুর উমাইর গাঁও নিবাসী মাওলানা সিদ্দিক আলী জামায়াতে শরিক হন। আস্তে আস্তে দাওয়াতের পরিধি বাড়তে থাকে। শরীক হন ডা.কুদরত উল্লাহ (কানাইঘাট), ডা.সাজিদ আলী (শেখঘাট), কাজীটুলার জনাব আবুল হাসিম, মাওলানা মনিরুজ্জামান জালালাবাদী, (চুনারুঘাট) ডা.সাইয়্যেদ আফসার মাহমুদ, (বাড়ি মৌলভীবাজার-তখন তিনি সিলেট মেডিকেল স্কুলের ছাত্র), মেডিকেল স্কুলের ছাত্র জনাব ইউনুস (উর্দুভাষী) ডা.আব্দুল মালিক (হোমিও ডাক্তার, বাড়ি কুলাউড়া), মাস্টার আব্দুর রাজ্জাক (বাড়ি গোলাপগঞ্জ), আলীয়া মাদরাসার ছাত্র সামসুল হক (বাড়ি গোয়াইন ঘাট), আব্দুল হাই (বাড়ি উমাইরগাঁও)। কলেজ-ছাত্রদের মধ্যে থেকে জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হন এম.সি. কলেজের ছাত্র নুরুজ্জামান (বাড়ি গোয়াইন ঘাট) এবং মদনমোহন কলেজের ছাত্র আব্দুস ছালাম (বাড়ি বালাগঞ্জ)-এ দুইজনই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তখন মেধাবী ছাত্ররা কম্যুনিস্ট পার্টির অংগ সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত হত। উক্ত দু'জনই ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত ছিলেন। আস্তে আস্তে তাঁরা উপলব্ধি করেন ছাত্র ইউনিয়নের কার্যক্রম ইসলাম বিরোধি এবং সংগঠন নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী। এ সময় শাসনতন্ত্র ইসলামীকরণের আন্দোলন শুরু হয়। ছাত্র ইউনিয়ন এ আন্দোলনের বিরোধিতা করে। নুরুজ্জামান ও আব্দুস সালাম ধার্মিক ছিলেন। তাই তাঁরা ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় তাঁরা জিন্দাবাজারে জামায়াতে ইসলামীর অফিসের সন্ধান পান এবং উভয়ই জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে সংগঠনে শরীক হন। তবে উচ্চ শিক্ষার জন্য তাদেরকে ঢাকায় চলে যেতে হয়। ঢাকায় তাঁরা জামায়াতের সাথে শরিক হন। সিলেটে তাঁরা ইসলামী আন্দোলনে বেশি দিন কাজ করার সুযোগ পান নি।

ডা. কুদরত উল্লাহ তাঁর বাসায় (বর্তমানে প্লেনিট আরাফ, জিন্দাবাজার, সিলেট) আরো একটি সাপ্তাহিক বৈঠক আরম্ভ করেন। কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অফিস খোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কাজী ম্যানশন জিন্দাবাজারের রাস্তার পূর্ব দিকে একটি দু'তলায় অফিস ভাড়া করা হয়। বর্তমানে এই জায়গাটি প্ল্যানিট আরাফের অন্তর্ভুক্ত।

সামসুল হক সাহেবের জামায়াতে যোগদান

জনাব কামিল খান সিলেটে আসার আগে ঘটনাবহুল ইতিহাস আছে যা উল্লেখ করা দরকার। ভারত বিভাগের সময় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চলাকালীন অবস্থায় যে সকল দাঙ্গা আক্রান্ত মজলুম মুসলিম পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক জামায়াতের কর্মী ও সমর্থক ছিলেন। তাদের যোগাযোগের কারণে আমীরে

www.pathagar.com

জামায়াত মাওলানা মওদুদী করাচী থেকে মাওলানা রফি আহমদ ইন্দোরিকে পূর্ব পাকিস্তান সফরে পাঠান। তিনি ১৯৫১ সালে এ অঞ্চলে আসেন এবং বিভিন্ন শহর বন্দর সফর করে কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। তিনি কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি টিম পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ছয় সদস্যের একটি টিম ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আসে। টিমের সদস্যরা ছিলেন : ১। চৌধুরী আলী আহমদ খান, ২. জনাব আসাদ গিলানী, ৩. মাওলানা আব্দুল আজিজ শারকী, ৪. মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ (সম্পাদক, সাপ্তাহিক এশিয়া), ৫. সীমান্ত প্রদেশের আমীর সর্দার আলী খান ৬. শিয়ালকোট জেলার আমীর মাওলানা আব্দুল গফফার হাসান।

এই টিম দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সফর করে এবং জামায়াতের দাওয়াত প্রদান করে। সিলেটে একটি টিম আসে। টিমে যারা আসেন তাঁরা হলেন: মাওলানা আব্দুল আজিজ শারকী: ২. মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ, ৩. সর্দার আলী খান, ৪. মাওলানা আব্দুল গফফার হাসান। এ টিমের পক্ষ থেকে শাহজালাল (র) এর দরগা মসজিদে বক্তব্য রাখা হয় এবং গোবিন্দ পার্কে (বর্তমান হাসান মার্কেট) একটি জনসভা করা হয়। জনসভায় জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত এবং পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ইসলামী করণের পক্ষে দাবি উত্থাপন করে বক্তব্য প্রদান করা হয়। জনসভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব সামসুল হক (কানাইঘাট)। তিনি বক্তাদের কথায় খুবই অনুপ্রাণিত হন। মিটিং শেষে তিনি তাদের সাথে মত বিনিময় করেন। তাঁদের পরামর্শে জনাব সামসুর হক ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন প্রাদেশিক সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে তিনি মুগ্ধ হন এবং তৎক্ষণাৎ জামায়াতের সহযোগী সদস্য (মুত্তাফিক) ফরম পূরণ করেন। তিনি সিলেটে এসেই নেজামে ইসলামের সভাপতি মাওলানা আতাহার আলী সাহেবের কাছে তাঁর সদস্যপদের ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে দেন এবং সংগঠনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। উল্লেখ্য যে, এর আগে তিনি নেজামে ইসলামের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি নেজামে ইসলামী পার্টির কানাইঘাট থানার সেক্রেটারী ছিলেন। সামসুল হক সাহেব কানাইঘাটের ঝিংগাবাড়ি মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন। তিনি বি.এ পাস ছিলেন। কিছুদিন পর সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষক পদে তাঁর চাকরি হয়। তখন তিনি সিলেট শহরে চলে আসেন। সরকারি আলীয়া মাদরাসায় এসে জামায়াত কর্মীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়। তখন সংগঠনের সভাপতি (তৎকালীন পরিভাষা নাজেম) জনাব কামিল খানের সাথেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর নেতৃত্বে জনাব হক সাহেব সাংগঠনিক কাজ শুরু করে দেন। কিছুদিন পর ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বন্যা হয়। বন্যার্তদের সাহায্যার্থে কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি টীম রিলিফ সামগ্রী নিয়ে আসে। রিলিফ টিম জনাব সামসুল হক সাহেবকে সাথে নিয়ে চট্টগ্রাম যায়। রিলিফ কাজ শেষে সাংগঠনিক প্রয়োজনে জনাব সামসুল হককে চট্টগ্রাম রেখে দেওয়া হয়। তিনি আলীয়া মাদরাসায়

www.pathagar.com

শিক্ষকতা থেকে ইস্তফা দিয়ে চট্টগ্রাম জেলা সংগঠনের আমীর শের আলী খানের সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। ১৯৫৬ সালের প্রথমদিকে জামায়াতের বিভাগীয় সংগঠন কায়েম হয়। এ সময় চট্টগ্রাম বিভাগীয় আমীর নিযুক্ত হন জনাব আব্দুল খালেক আর সামসুল হক সাহেব হন বিভাগীয় সেক্রেটারী।

মাওলানা মওদুদীর প্রথম কারাবরণ

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তেকালের ২৩দিন পর মাওলানা মওদুদীকে ১৯৪৮ সালের ৪অক্টোবর কারারুদ্ধ করা হয়। মাওলানাকে কেন জেলে আটক করা হল তা জানার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে মাওলানা নিজেই বলেন :

“আমি ১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোর ল’কলেজে এক বক্তৃতা দেই। এতে আমি ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইন কানুন সম্পর্কে সব ভুল ধারণা অপনোদন করি। আমি স্বীয় বক্তৃতায় প্রথমে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করি এবং তাঁর পরে চারটা মূলনীতি বর্ণনা করি যা স্বীকার না করলে পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারে না

১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে হবে।
২. সরকারকে অংগীকারে আবদ্ধ হতে হবে যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমানার মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে।
৩. ব্রিটিশ শাসনামলের উত্তরাধিকার ইসলাম বিরোধি আইনগুলো সংশোধন করতে হবে।
৪ ভবিষ্যতের যাবতীয় আইন-কানুন ইসলাম অনুযায়ী রচিত হবে।

আমি প্রস্তাব পেশ করি, আমাদের গণপরিষদের কর্তব্য প্রথমে আইনের ভাষায় এ মূলনীতিগুলো মঞ্জুর করা। এর পরই এ সরকার ইসলামী সরকার বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া এখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে না । যেমন কোন ব্যক্তি কালেমা তাইয়্যেবা মুখে উচ্চারণ না করে মুসলমান হতে পারে না, তেমনি কোনো রাষ্ট্র সে পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না যে পর্যন্ত সে স্বীকার না করে, তাঁর বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ। যতক্ষণ সে স্বীকার না করবে, দুনিয়াতে যারা এ সরকার পরিচালনা করে তাঁরা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই তা করে, যতক্ষণ সে স্বীকার না করবে যে তাঁর আইন কানুনের উৎস কুরআন-সুন্নাহ, যে পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত না করবে যে তাঁর চতুঃসীমার মধ্যে অনৈসলামী আইন জারি হতে পারবে না, ততক্ষণ তা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে না।

এ দাবি উত্থাপন করার পর যখন আমরা তাঁর পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা শুরু করলাম অমনি ক্ষমতাসীনরা কি করে আমাদের মুখ বন্ধ করা যায় সে চেষ্টায় মেতে উঠলেন। প্রকাশ্যে তো আর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে রাজি নয়, এমন কথা ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। এ জন্য যাতে আমাকে ও আমার সঙ্গী সাথীদেরকে অন্য কোনো অভিযোগের

www.pathagar.com

ফাঁদে আটকানো যায় সে জন্য একটি ষড়যন্ত্র তৈরি হলো। ষড়যন্ত্রটা হচ্ছে, ১৯৪৮ সালের মে মাসে পেশোয়ার থেকে জনৈক ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। ইনি আজাদ কাশ্মীরের পাবলিসিটি অফিসার ছিলেন। তিনি আমার সাথে গোপন আলাপ করার ইচ্ছে ব্যক্ত করলে আমি তাকে নির্জন কক্ষে ডেকে আনলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কাশ্মীরের জেহাদে অংশ গ্রহণ করছেন না কেন? আমি বললাম এর একটি কারণ রয়েছে যা আমি ব্যক্ত করতে চাই না।

তিনি বললেন অন্তত আমাকে তো বলুন। আমি শুধু ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আমি বললাম-যে জাতির সাথে পাকিস্তানের সরকার যুদ্ধ করে না তাঁর সাথে পাকিস্তানের নাগরিকরা কি করে যুদ্ধ করতে পারে? আমি এটা বুঝতে পারি না কিন্তু আমি এ ব্যাপারে নীরবই থাকতে চাই, আমার মতামত ব্যক্ত করতে চাই না। পরের দিনই তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি জারি করে দেন যে, মাওলানা মওদূদী কাশ্মীরের জেহাদকে হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে, এ যুদ্ধে যারা নিহত হচ্ছে তাদের হারাম মৃত্যু হচ্ছে। এরপর এ মিথ্যাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলো। শ্রীনগর রেডিও তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করলো এবং কাশ্মীরে যুদ্ধরত মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে প্রচার করতে লাগলো যে পাকিস্তানের অমুক আলেম বলেছেন যে তোমরা যুদ্ধ করে মরলে তোমাদের হারাম মৃত্যু হবে।

আমি রেডিও পাকিস্তানকে লিখলাম যে অধিকৃত কাশ্মীর রেডিও আমার নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে আমাকে এর প্রতিবাদ করার এবং এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা, তা জনগণের সামনে বলার অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু আমাকে অনুমতি দিতে সরাসরি অস্বীকার করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনের দাবি নস্যাৎ করা আমাদের ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিতে কাশ্মীর সমস্যার চেয়েও জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার নাম নিয়ে কাশ্মীরের মুজাহিদদের উৎসাহ ভংগ করা হচ্ছিল। অথচ তাদের সে ব্যাপারে পরোয়াই ছিল না। তাদের কেবল চিন্তা ছিল ইসলামী শাসনের আন্দোলনকে কিভাবে পর্যুদাস্ত করা যায়। আজ পর্যন্ত সে মিথ্যা অপবাদের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। যখনি আমি পাকিস্তানের সংস্কারের জন্য কোনো চেষ্টা চালাই অমনি এ মিথ্যার ফানুস ওড়ানো শুরু হয়। অথচ আমি একাধিকবার এর প্রতিবাদ করেছি। এ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার পর ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে আমাকে এবং মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী ও মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদকে গ্রেফতাঁর করা হয়।" (জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী)

উল্লেখ করার মত কয়েকজন সুধী

জনাব সামসুল হক চট্টগ্রাম চলে গেলেন। কামিল খান সাহেবের নেতৃত্বে জামায়াতের কাজ অগ্রসর হল। বাকায়দা অফিস খোলার পর লাহোর থেকে 'তরজমানুল কুরআন'

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে 'জাহানে নও'[৩] এবং উর্দু ও তৎকালীন প্রকাশিত স্বল্প সংখ্যক বাংলা বই আনার ব্যবস্থা করা হল। কামিল খান সিলেটে বসবাসরত উর্দুভাষীদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকলেন। জেলরোড আসলাম ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মালিক ইঞ্জিনিয়ার আসলাম খান, ধোপা দিঘীর পূর্বপার ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মালিক আসলাম সাহেবের ভাই ও ভাগনে আকরাম খান ও ইকবালখান, টেকনিকেল রোডের রাইস মিলের মালিক ইউসুফ খান জামায়াতের সমর্থক ও সুধী হন। উল্লেখ্য যে, এ চার জনের বাড়ি পাঞ্জাব। তাঁরা শিলং এ ব্যবসা করতেন। দেশ ভাগের সময় হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার প্রাক্কালে তাঁরা জীপ-যোগে যা আনা সম্ভব তা নিয়ে এসে সিলেটে ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং আর্থিক দিক দিয়ে ভাল অবস্থানে চলে যান। তাঁরা সবাই জামায়াতের সুধী ছিলেন। তাদের মধ্যে জনাব আসলাম খান সাহেব সংগঠনের জন্য খুবই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। জামেয়া স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি কামিল খানকে তাঁর নিজস্ব ফার্মে চাকরির ব্যবস্থা করেন। মাওলানা মুকাররাম সাহেবের পড়াশুনা শেষ হওয়ার পর তাঁর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। মাওলানা মুকাররম সাহেব অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি 'জাহানে নও' ও 'তরজমানুল কুরআন'-এর গ্রাহক ও ইসলামী সাহিত্যের পাঠক বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। নাবিস্কো কোম্পানি সিলেটের এজেন্ট কাজির বাজারের জনাব মাহমুদ আলী জামায়াতের পৃষ্ঠপোষক হন। তাঁর সেইলসম্যান জনাব আজির উদ্দীন আহমদ খুবই আগ্রহের সাথে জামায়াতের পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য পড়তে থাকেন। পরে এই আজির উদ্দীন সাহেব জাহানে নও, দৈনিক সংগ্রাম এবং করাচীর প্রখ্যাত দৈনিক উর্দু জং-এর সংবাদদাতা নিযুক্ত হন। তদুপরি তিনি জামায়াতের রুকন ও শহর আমীর হন।

তৎকালীন সময়ের সুধীদের মধ্যে বিশেষভাবে যারা সংগঠনকে সহযোগিতা করেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক মজদুদ্দিন, ডা.আফিয়া খাতুন ও সাবেক শিক্ষা সচিব হেদায়াত আহমদ চৌধুরীর শ্রদ্ধেয় আব্বা অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা কুমার পাড়া নিবাসী জনাব মুদাররিছ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা মিরের ময়দান নিবাসী জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শেখঘাটের হাজী হায়াত উল্লাহ, হাজী কুতুব উদ্দীন, ভাটিপাড়ার খান বাহাদুর গোলাম মোস্তফা চৌধুরী, রায়নগর নিবাসী ব্যবসায়ী জনাব গোলাম মোস্তফা, "আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দু" বর্তমান জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক জনাব নজাবত আলী, দাওয়াতুল ইসলাম ইউকের সাবেক আমীর জনাব আব্দুল সালাম সাহেবের শ্রদ্ধেয় শ্বশুর জনাব মমতাজ আলী মজুমদার এবং

৩. 'জাহানে নও' বের হয় ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রথম দিকে পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক মাওলানা হেলাল উদ্দীন। পরবর্তীতে সম্পাদক হন হাফেজ হাবিবুর রহমান। খুলনা থেকে জনাব সামসুর রহমান ১৯৫০ সালে 'তাওহীদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। তিনি ১৯৫২ সালে জামায়াতে যোগদান করেন। সামসুর রহমান সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক 'তাওহীদ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক জাহানে নও'এর আত্মপ্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের নিকট জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র হিসেবে কাজ করে।

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের আজীবন সম্পাদক জনাব নূরুল হক। উল্লেখ্য যে, জনাব নূরুল হক সাহেবের সাথে মাওলানা মওদুদীর নিয়মিত পত্র যোগাযোগ ছিল।

মাওলানা মওদুদীর ফাঁসির দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

মাওলানা মওদুদীর ফাঁসির দন্ডাদেশ হওয়ার পর সারা দেশ এবং বিশ্বের সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় উঠে। পাকিস্তানের উভয় অংশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে প্রতিবাদ হতে থাকে। শুধু দেশেই নয় বিদেশে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের ফিলিস্তিন, মিশর, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রতিক্রিয়া হয় এবং এ সমস্ত দেশ থেকে মাওলানাকে মুক্তিদানের জন্য তাঁরবার্তা আসতে থাকে।

সিলেটে সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা হয় গোবিন্দপার্কে (বর্তমান হাসান মার্কেট) দরগাহ মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা আকবর আলী মসজিদের মিম্বর থেকে প্রতিবাদ সভার ঘোষণা দেন। উক্ত ঘোষণা শুনে মাওলানা মোকাররম আলী গোবিন্দপার্কের প্রতিবাদ সভায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন নেজামে ইসলাম পার্টি সিলেটের নেতা লালদিঘির পারস্থ পাকিস্তান ক্লথ স্টোরের মালিক মাও: মাহমুদ আলী (বাড়ি কানাইঘাট)। কামিল খান দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। মিছিল করার পর সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে টেলিগ্রামবার্তা পাঠানো হয়।

মাওলানার ফাঁসির আদেশের কারণ

মাওলানা মওদুদীকে প্রথম কারারুদ্ধ করা হল। তাঁরপর মুক্তি দিয়ে আবার ফাঁসির দন্ডাদেশ প্রদান করা হল। কেন সরকার বারবার এই আচরণ করে এ ব্যাপারে কিছু তথ্য মাওলানার ভাষণ থেকে:

"জেল থেকে মুক্তি লাভের পর (১৯৫০ সালের ২৮শে মে) আমরা পুনরায় দাবি তুলি যে, এখন আদর্শ প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। খাজা নাজিমুদ্দীন মরহুমের আমলে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরুও হয়েছিল। কিন্তু তাঁর গতিরোধ করার জন্য আবার এক চক্রান্ত করা হয় এবং ১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামীর উপর তৃতীয় হামলা চালানো হয়। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবি ধামাচাপা দেয়ার জন্যই খতমে নবুয়্যাতের আন্দোলন পাকিয়ে তোলা হয়েছিল। (মুনীর রিপোর্ট থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং আমি এ সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য আমার গ্রন্থ 'কাদিয়ানী সমস্যায় 'বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।) এসময় খতমে নবুয়্যত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে বহু বুঝানো হয় যে আল্লাহর ওয়াস্তে একবার শাসনতন্ত্রটা পাস হতে দিন এবং এর পরে আপনারা এ সমস্যা তুলবেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের রিপোর্ট তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শাসনতন্ত্র পাশ হতে আর বেশি বিলম্ব ছিল না। শুধুমাত্র গণপরিষদে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট পেশ হতে এবং শাসনতন্ত্র মঞ্জুর হতে যা দেরী ছিল। কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল, খাজা নাজিমুদ্দীনের রিপোর্ট যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। লাহোরে সামরিক আইন জারি হলো। খাজা নাজিমুদ্দীনের ওজারতী গেল, আর সে সাথে

www.pathagar.com

আমলাতন্ত্রের রাজত্ব এমন মজবুতভাবে শিকড় গেড়ে বসলো যে আজও পর্যন্ত তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় নি।

১৯৪৯ সাল থেকে একটি সরকারি অথবা আধাসরকারি প্রচার সেল জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অবিরাম কুৎসা অভিযান চালিয়ে আসছে। এটি ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। রীতিমত বেতনভুক্ত অথবা মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত লোকেরা জামায়াতের বিরুদ্ধে নানা রকমের অপবাদ রটনা এবং ইসলাম সম্পর্কে লোকদের মনে যতদূর সম্ভব সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকে। সরকারি তহবিল থেকে এ জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়। বহু পত্র-পত্রিকা এই কাজ করতে থাকে, বহু বই পুস্তক আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ করা হয় এবং সরকারিভাবে প্রত্যেক মহলে তা বিলি করা হয়। জামায়াতে ইসলামীর দুর্নাম রটানোর জন্য কোনো সুযোগ বাকি রাখা হয় নি। আর সে সাথে প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়ে জনগণের মনে বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় যেন, লোকে অনন্যোপায় হয়ে ভাবতে শুরু করে যে ইসলামের নিকট কোনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও নেই, আর বর্তমান যুগে কার্যোপযোগী কোনো আইনও নেই।

১৯৫৫ সাল থেকে আলেমদের একটা গোষ্ঠী আমাকে এবং জামায়াতে ইসলামীকে গালিগালাজ করা ও আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় লেগে রয়েছে। আমি জেলে থাকা অবস্থায়-ই এ কাজ শুরু করা হয়। আর আজ ১৫বছর হয়ে যাচ্ছে গালাগালির এ অভিযান ক্রমশ জোরদার ও তীব্রতর হয়ে চলেছে।" (জামায়াতে ইসলামীর ঊনত্রিশ বছর, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী)

এ ব্যাপারে আরো কিছু তথ্য:

মাওলানাকে জেলে প্রেরণের পর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে আদর্শ প্রস্তাব পাস করা হয়। প্রস্তাব পাসের পর এটাই বাস্তবতা ছিল, আদর্শ প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ এগিয়ে যেতে থাকবে। কিন্তু কার্যত এ ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হল না।

মাওলানা জেল থেকে বের হবার পর আদর্শ প্রস্তাব অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি করে আন্দোলন শুরু করেন। এ সময় তাঁর 'ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন' ও 'ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি' নামে দুইটি বই প্রকাশিত হয়। জামায়াত নেতৃবৃন্দ জনমত গঠনের কাজ চালিয়ে যান। কিন্তু শাসকগণ শাসনতন্ত্র ঠেকিয়ে রাখার জন্য বাহানা খুঁজতে থাকেন। তাঁরা ঘোষণা দেন:

১. কাশ্মীর এখন বিপন্ন, তাই পাকিস্তান বিপন্ন, এখন জেহাদের সময়, এখন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় নয়।
২. "মোল্লাদের শাসন" হলেই তা ইসলামী শাসন হয় না। বরং মুসলমানদের যে কোন শাসনকে ইসলামী শাসন বলা যায়।
৩. আদর্শ প্রস্তাব পুরাতন জীর্ণ ইসলামের নীতি অনুযায়ী করা হয় নি। বরং করা হয়েছে আধুনিক ইসলাম অনুযায়ী।

www.pathagar.com

৪. আধুনিক যুগের কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্রের জন্য ইসলামী আদর্শে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন যুক্তিসঙ্গত নয়।

৫. মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মাযহাবী ফিরকা থাকার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম সম্ভব নয়।

৬. ধর্মীয় গোঁড়ামির নামে রাষ্ট্র গঠিত হলে আধুনিক দুনিয়া উপহাস করবে।

মাওলানা মওদুদী ও জামায়াত নেতা এবং কর্মীগণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে উপরিউক্ত প্রচারণার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে থাকেন। ফলে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠে। মাযহাবী মতপার্থক্য যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রতিবন্ধক নয় তা প্রমাণ করার জন্য ১৯৫১ সালের ২১ জানুয়ারি বিভিন্ন মতের ২১ জন মশহুর আলেম করাচীতে একত্রিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে ২২দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে সরকারের নিকট পেশ করেন। জামায়াত ২২ দফা মূলনীতি ছাপিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া জামায়াত ৯ দফা দাবি সম্বলিত কাগজে জনগণের সাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করে। উক্ত ৯ দফা দাবি ছিল নিম্নরূপ:

১. ইসলামী শরিয়তই হবে দেশে শাসনতন্ত্রের প্রকৃত উৎস।

২. শরিয়তের খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা চলবে না।

৩. সকল শরিয়ত বিরোধি আইন-কানুন বাতিল করতে হবে।

৪. সরকারের কর্তব্য হবে ভালো কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা।

৫. আদালতে বিচার ব্যতিরেকে নাগরিক অধিকার হরণ করা চলবে না।

৬. শাসন বিভাগ এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দেশের আদালতে বিচার প্রার্থনা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।

৭. বিচার বিভাগে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ চলবে না।

৮. মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যথা: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা এ পাঁচটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

৯. কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলমান সংখ্যালঘু ঘোষণা করতে হবে।

সাক্ষর অভিযান এবং মিটিং মিছিল একসাথে চলতে থাকে। ১৯৫৩ সালের ১৮ জানুয়ারিতে ৩১ জন বিশিষ্ট উলামাদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে শাসনতন্ত্রের খসড়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করে সরকারের নিকট পেশ করা হয়। এ মাসেই কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘু ঘোষণা করার জন্য সর্বদলীয় কনভেনশন আহুত হয়। কনভেনশনের যোগ দেয় মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, মজলিসে আহরার, জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান, জমিয়তে আহলে হাদীস, আঞ্জুমানে তাহাফুজে হুকূকে শিয়া প্রভৃতি দল।

মাওলানা মওদুদী উক্ত কনভেনশনে যোগ দেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, কাদিয়ানী সমস্যাকে পৃথকভাবে বিবেচনা না করে একে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই শরিক

www.pathagar.com

করা হোক। ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় কনভেনশনের কার্যকরী পরিষদের এক বৈঠকে Direct Action ঘোষণা করা হয়। জামায়াতে ইসলামী Direct Action-এর তীব্র বিরোধিতা করে এবং কর্মসূচি থেকে দলের সম্পর্কচ্যুতি ঘোষণা করে। পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোথাও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কার্যকর হয়নি। ৪ থেকে ৬মার্চ পাঞ্জাবে গোলযোগ চলে।

"প্রথম দিন থেকেই জনসাধারণের উপরে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চার্জ ও গুলীবর্ষণ শুরু করে। চৌঠা মার্চ অপরাহ্নে জনৈক ছদ্মবেশী পুলিশ এক জনসভায় হাজির হয়ে জানালো যে পুলিশ অমুক স্থানে জনতাঁর উপর লাঠি চালনা করেছে এবং জনৈক ব্যক্তির গলায় বাঁধা কুরআন শরিফ লাথি মেরে ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে দিয়েছে। অতঃপর সে কুরআন শরীফের কিছু ছিন্ন পাতা জনতাকে দেখিয়ে দিল। এর ফলে জনতা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-মজুর , ছাত্র-শিক্ষক, এমনকি সরকারি দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দও সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করলো। এভাবে সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করে তোলা হচ্ছিল।

অপর একটি ঘটনা এ জ্বলন্ত আগুনে জ্বালানী কাঠ সংযোগ করল। ঐ একই দিনে এক খানা জীপ গাড়ি থেকে জনসাধারণের উপরে অবিরাম গুলীবর্ষণ করা হচ্ছিল। অনুসন্ধানে জানতে পারা গেল জীপ গাড়িতে কয়েকজন কাদিয়ানী আরোহণ করেছিল।

এভাবে সরকারের বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়। কিন্তু বেশিদিন এ গোলযোগ চলতে পারে নি। ৬ মার্চ লাহোরে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গোলযোগ সম্পূর্ণরূপে থেমে যায়।

৪ এবং ৫ মার্চ মাওলানা মওদুদীর সভাপতিত্বে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার অধিবেশনে "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" তীব্র নিন্দা করা হয় এবং এর ভয়াবহ পরিণাম ফল বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে এ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়। এ সময়ে মাওলানা মওদুদীর "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক একখানা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এ বইখানিতে তিনি মুসলমান ও কাদিয়ানীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করে সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠ সমাধান পেশ করেন। আটাশে মার্চ হঠাৎ সামরিক আইনের কর্তৃপক্ষ মাওলানা মওদুদী এবং জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতাঁর করেন। গ্রেফতারের কোনই কারণ বলা হল না।

"কাদিয়ানী সমস্যা" পুস্তিকার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ প্রচার এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে মাওলানা মওদুদী এবং তাঁর সহকর্মী মালিক নসরুল্লাহ খান আজিজ ও জনাব নকী আলীকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। উক্ত অভিযোগে মাওলানা মওদুদীর প্রতি ৮ই মে সামরিক আদালত কর্তৃক ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়।"

মাওলানার মুক্তি

"মাওলানার বিনাশর্তে মুক্তির জন্যে শুধু পাকিস্তান থেকে নয়, সারা মুসলিম বিশ্ব থেকে জোরদার দাবি উঠেছিল তাঁর বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে। সরকার অবশেষে চৌদ্দ বছরের

www.pathagar.com

কারাদন্ড হ্রাস করে সাড়ে তিন বছর করে। অতঃপর পাকিস্তানে এক আইন বিভ্রাটের ফলে মাওলানা দু'বছর নয়মাস পরে মুক্তি লাভ করেন। আইন বিভ্রাট এই যে, ১৯৫৪ সালের শেষের দিকে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মরহুম মুহাম্মদ আলী ঘোষণা করেছিলেন যে, সেই বছরই ২৫শে ডিসেম্বর কায়েদে আযমের জন্মদিনে তিনি জাতিকে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র উপহার দিবেন।

গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ মাওলানা মওদুদীকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলতে না দেখে বড়ই মর্মপীড়া ভোগ করছিলেন। এদিকে আবার প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইসলামী শাসনতন্ত্রের ঘোষণা তাঁর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল। তাই তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ ভেঙে দিলেন।

এর ফলে দেশে এক শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। গণপরিষদ ভেঙে দেবার ফলে যাবতীয় আইন কানুন বাতিল হয়ে যায়।

এদিকে মাওলানার মুক্তির জন্যে হাইকোর্টে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন করা হয়। কিন্তু কোর্টে শুনানী শুরু হবার পূর্বেই সরকার বিনা শর্তে মাওলানার মুক্তি ঘোষণা করে।" (আব্বাস আলী খান লিখিত মাওলানা মওদুদী - একটি জীবন একটি ইতিহাস)

প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের সিলেটে আগমন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ছয় সদস্য বিশিষ্ট টীম কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এসেছিল তাদের মধ্যে জনাব চৌধুরী আলী আহমদ খান ঢাকায় এবং জনাব আসাদ গিলানী রাজশাহীতে থেকে যান। সংগঠনের সিদ্ধান্তে তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে রাখার ব্যবস্থা করা হয় চৌধুরী আলী আহমদ খানকে পূর্ব পাক প্রাদেশিক আমীর এবং মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। চৌধুরী আলী আহমদ খান সিলেটে সাতদিনের সফরে আসেন। তিনি হাতে-কলমে কর্মীদেরকে সাংগঠনিক কার্যক্রম শিক্ষা দেন। অন্য দিকে সুধী সমাবেশের আয়োজন করে দাওয়াত সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। তাঁরপর ক্রমান্বয়ে মাওলানা আব্দুর রহীম, মাওলানা ছিফাতুল্লাহ, জনাব আব্দুল খালেক বিভিন্ন প্রোগ্রামে সিলেটে আসতে থাকেন। প্রোগ্রামগুলি সাধারণত সাবেক জিন্নাহ হল বর্তমানে সুলেমান হলে অনুষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক গোলাম আযমের জামায়াতে যোগদান

ইতোমধ্যে জামায়াতের পূর্বাঞ্চলের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা সংঘটিত হয়। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে যোগদান করেন। এর আগে তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক, রংপুর তাবলীগ জামায়াতের আমীর এবং তমদ্দুন মজলিশের উত্তরবঙ্গের সংগঠক ছিলেন। জনাব আব্দুল খালেকের সংস্পর্শে এসে তিনি জামায়াতে শরীক হন। জামায়াতে যোগদানের পর তাঁর উপর পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ১৯৫৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতাঁর করা হয়। তিনি ছিলেন 'ভাষা সৈনিক।' ৫২ সালে তিনি

www.pathagar.com

আঁরো একব্বার গ্রেফতাঁর হন। জেলে থাকা অবস্থায় তিনি জামায়াতের রুকন হন। তৎকালীন রাজশাহী অঞ্চলের দায়িত্বশীল জনাব আসাদ গিলানী রংপুর কারাগারে সাক্ষাৎ করে সেখানেই তাঁর রুকনিয়াতের শপথ করান। জেলে থাকা অবস্থায় তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এপ্রিল মাসে তিনি হাইকোর্টের নির্দেশে মুক্ত হন। মুক্তি লাভের পর তিনি রাজশাহী বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর আমীরে জামায়াতের নির্দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে লবী করার জন্য তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। রাওয়ালপিন্ডির মারী এবং করাচীতে গণপরিষদের দুটো অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি মারী ও করাচিতে অত্যন্ত দক্ষতাঁর সাথে তাঁর দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে নিখিল পাক জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সম্মেলন করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়। এটাই মাওলানা মওদুদীর উপস্থিতিতে দেশভিত্তিক পাকিস্তান জামায়াতের ২য় সম্মেলন। এ সম্মেলনে বাংলা ভাষীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম। উল্লেখ্য, এর আগে ১৯৪৯ সালের ৬-৮ মে লাহোরে জামায়াতের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলে থাকার কারণে সে সম্মেলনে মাওলানা মওদুদী হাজির হতে পারেন নি। সম্মেলনে বাংলাভাষী কেউই উপস্থিত ছিলেন না। '৫৫ সালের সম্মেলন শেষে কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, মাওলানা মওদুদী পূর্ব পাকিস্তানে সফর করবেন। ১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি মাওলানা প্রথম বারের মত পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন এবং ৬ মার্চ ফেরত যান। প্রথমবারের মত এ সফরে তিনি ৪০ দিন অবস্থান করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সফর করেন।

মাওলানা মওদুদীর প্রথম সিলেট সফর

১৯৫৬ সালের ৩০ শে জানুয়ারি মাওলানা মওদুদী সিলেটে আসেন। তাঁর আগমনের খবর ঢাকা থেকে পূর্বেই জানিয়ে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। সিলেটের কর্মীগণ রাতদিন কাজ করতে থাকেন। মাওলানার সিলেট সফরের আগে ছাতক সিমেন্ট ফেক্টরীতে বদলী হয়ে আসেন উর্দুভাষী ইঞ্জিনিয়ার জনাব ইজহার আহমদ কোরেশী। তিনিই ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির প্রথম মুসলমান ইঞ্জিনিয়ার এবং উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল। ইঞ্জিনিয়ার ইজহার আহমদ কোরেশী জামায়াতের নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন। মাওলানার সিলেট সফরকে সামনে রেখে তিনি প্রতি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে জীপযোগে সিলেটে আসতেন, সফরের যাবতীয় খোঁজ-খবর নিতেন এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতা দান করতেন। মাওলানা মওদুদী ও সফরসঙ্গীদের থাকা খাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয় এবং জনাব আকরাম খান সাহেবের কাজী ইলিয়াসের ভাড়া বাসায় রাখার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তের পর সিলেটের দুই মশহুর ব্যক্তিত্ব প্রফেসর মজদুদ্দীন ও অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা জনাব মোদাররিছ চৌধুরী জামায়াতের জিন্দাবাজার অফিসে আসেন। তাঁরা সফরের বিভিন্ন কর্মসূচির খোঁজখবর নেন।

www.pathagar.com

মাওলানা ও তাঁর সফর সঙ্গীদের মেহমানদারীর সমস্ত দায়িত্ব প্রফেসর মজদুদ্দীন নিজ দায়িত্বে নিয়ে আসেন। তিনি দরগা মহল্লাস্থ নিজ বাড়ির উত্তরে "পাক্কা বাড়ি" সম্পূর্ণ খালি করে মেহমানদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। নির্দিষ্ট দিনে মাওলানা মওদুদী ট্রেনযোগে সিলেট রেল স্টেশনে আগমন করেন। সাথে আসেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ, অধ্যাপক গোলাম আযম এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ইন্তেজামিয়া কমিটির সদস্যবৃন্দসহ শ'খানেক লোক রেল স্টেশনে মেহমানদেরকে অভ্যর্থনা জানায়। বিকেলে সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানার ভাষণের তরজমা করেন অধ্যাপক গোলাম আযম। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মজদুদ্দীন। সর্বশ্রেণীর লোক মাওলানার বক্তব্য গভীর আগ্রহে শ্রবণ করে। পরদিন জিন্নাহ হলে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দান করেন। সুধী সমাবেশেও সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর মজদুদ্দীন। সফরে সিলেট অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া পড়ে। অভ্যর্থনা কমিটির হাতে এই উপলক্ষ্যে এত অর্থ সংগ্রহ হয় যে, সফরের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করে বাড়তি আয় দিয়ে জামায়াত অফিস সংলগ্ন একটা পাঠাগার খোলার ব্যবস্থা করা হয়।

সামসুল হক সাহেবের উপর সিলেট জেলার দায়িত্ব প্রদান

১৯৫৬ সালের শেষ দিকে জনাব কামিল খান খুলনা চলে যান। ফলে নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। সামসুল হক সাহেবকে সিলেটে ফেরত আনা হয়। তিনি চট্টগ্রামে রুকন হন। সিলেটে এসে তিনি সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সমগ্র সিলেট অঞ্চলে সংগঠন সম্প্রসারণে উদ্যোগী হন। তখন সিলেট অঞ্চলের যাতায়াত এত সহজ ছিল না। লোকেরা ২০/ ২৫ মাইল পায়ে হেঁটে সিলেট শহরে আসত। রাস্তাঘাট ছিল সীমিত। শিলং রোড ছাড়া পাকা রাস্তা বলতে গেলে ছিলই না। পুরান আমলের 'মুড়ির টিন' খ্যাত সীমিত বাস সীমিত রাস্তায় চলাচল করত। সুনামগঞ্জের রাস্তা ছিল কাঁচা তাঁরপর ফেরী ছিল কমপক্ষে পাঁচটি। মৌলভীবাজার যেতে ফেরী ছিল দুটো। তেমনি বিয়ানীবাজার যেতেও ফেরী ছিল দুটো। তখনকার দিনে ফেরীতে কোন পন্টুন ছিল না। বাঁশ গেড়ে রশি দিয়ে ফেরী বেঁধে রাখা হত । বেশিরভাগ ফেরীতে কোন ইঞ্জিন ছিল না। দুটো বড় আকারের কাঠের নৌকা মজবুত তক্তা দিয়ে যুক্ত করে ফেরী বানানো হত। ফেরী চলত বৈঠা ও বাঁশের লগির সাহায্যে। কোন কোন জায়গায় দুই পারে রশি বেঁধে রশি টেনে ফেরী চালানো হত। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ফেরী টোটেলী বন্ধ থাকত। বাস ভাড়ার একটা ধারণা দেওয়া যাক-বাসে আপার ও লোয়ার দুই শ্রেণীর আসন ছিল। ভাড়া ছিল মাইল প্রতি ৫ পয়সার সামান্য কম। ট্রেনে ৩য় শ্রেণী, ইন্টার ক্লাস ও প্রথম শ্রেণী এই তিন শ্রেণীর আসন ছিল। এ সময় ৮ টাকা ট্রেন ভাড়া দিয়ে সিলেট থেকে ঢাকা যাওয়া সম্ভব হত। ঢাকা-সিলেটে বাহন হিসেবে বিমান চালু হয় ষাট দশকের প্রথম দিকে। ঐ সময় ভাড়া ছিল ১৫ টাকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় তখন বড়মাপের আলেম ও পীর সাহেবগণ ওয়াজ মাহফিলে যেতে পালকি ব্যবহার করতেন। তবে কোন জামায়াত নেতা কোনদিন পালকি ব্যবহার করেন নি।

www.pathagar.com

বর্ষার সময় নৌকা ছাড়া উপায় ছিল না। তবে আজকালকার মত ইঞ্জিন নৌকা ছিল না। বহু জায়গায় কিছু নৌকায় কিছু পায়ে হেঁটে যেতে হত। আবার সবসময় নৌকা পাওয়া যেত না। বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট সময় নৌকা ছাড়ত। এগুলোকে বলা হত 'গয়নার নাও'। নির্দিষ্ট সময়ের পরে গেলে আর নৌকা পাওয়া সম্ভব ছিল না। কোন জায়গায় গিয়ে ঐদিনে ফিরে আসার কল্পনাও করা যেত না। রাস্তাঘাটও নিরাপদ ছিল না। ট্রেন ছিল খুবই সীমিত । ট্রেনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া যেত না। তখন মটর সাইকেলের প্রচলন ছিল না। থাকার জন্য আবাসিক হোটেল ছিল আঙ্গুলে গোনা কয়েকটি । মান ছিল অত্যন্ত নিম্ন। বলা হত, চিৎ হয়ে শুইলে চার আনা আর কাত হয়ে শুইলে দুই আনা (ভাড়া)।

শিক্ষার হার ছিল খুবই কম। সিলেটে মুরারীচাঁদ কলেজ (এম.সি. কলেজ) ও মদন মোহন কলেজ, হবিগঞ্জে বৃন্দাবন কলেজ, সুনামগঞ্জে একটি এবং মৌলভী বাজারে একটি ছাড়া কোন কলেজ ছিল না। কামিল পড়তে হলে সিলেটে আসা ছিল জরুরি। কেননা সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসা ছাড়া আর কোন কামিল মাদরাসা ছিল না। ঢাকা থেকে ২/৪টি দৈনিক পত্রিকা বের হত। পৃষ্ঠা ছিল সীমিত। সিলেটে ১/২দিন পরে আসত। টেলিভিশন সম্প্রচার তখনও শুরু হয় নি। রেডিও স্টেশন ছিল তবে রেডিওর প্রচলন ছিল খুবই সীমিত। আর ধর্মীয় কারণে অনেকেই ঘরে রেডিও রাখতে সাহস করত না। ছাপাখানা ছিল আঙ্গুলে গোনা মাত্র কয়েকটি। ছাপার মান আজকালকার মত এত উন্নত ছিল না। টাইপগুলো ছিল ধাতু ও কাঠ নির্মিত। মিউনিসিপাল ব্যবস্থা ছিল। এলাকা ছিল সীমিত। লোক সংখ্যা ছিল কম। ভোটার ছিল আরো কম। কেবলমাত্র টেক্সদাতাগণ ভোট দিতে পারতেন।

এ সময় মহিলাদের মধ্যে সাংগঠনিক কোন কাজ ছিল না। সিলেটে তো নয়ই সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও মহিলাদের মধ্যে সংগঠন সৃষ্টি হয় নি। শুধু জামায়াত নয় অন্য কোন রাজনৈতিক দলে মহিলাদের আনা গোনা ছিল খুবই সীমিত। পাকিস্তানের গণপরিষদে তৎকালীন সময়ে কোন মহিলা সদস্য ছিল না। এমনকি পূর্ব পাকিস্তান, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদেও কোন মহিলা সদস্য ছিল না। সিলেটে মহিলারা চলাফেরা করতেন, তবে কোন মার্কেটে মহিলাদের দেখা যেত না। শহরে ভদ্র পরিবারের মহিলাগণ বোরকা পরতেন। তাঁরপর রিকশায় শাড়ি পেঁচিয়ে ঘোমটা দেওয়া হত। রিকশাওয়ালাকে আড়াল করে মহিলারা রিকশায় উঠতেন। সাথে পুরুষ রাহ্বার থাকা বাধ্যতামূলক ছিল।

মাওলানার সফর শেষে সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস

মাওলানা মওদুদী কেবল একজন সুবক্তা, সুলেখক, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও মুফাসসীরই ছিলেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ সংগঠক। প্রথমবারের মত পূর্ব পাকিস্তানে সফর করে তিনি সংগঠন পুনর্বিন্যাস করেন।

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত চৌধুরী আলী আহমদ খান ও জনাব আসাদ গিলানী পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরত যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় মাওলানা অনুমতি প্রদান করেন। তিনি বাংলা ভাষীদেরকে নেতৃত্বে নিয়ে আসেন। পূর্ব পাক আমীর নিযুক্ত হন মাওলানা আব্দুর রহীম এবং সেক্রেটারী হন অধ্যাপক গোলাম আযম। এ ব্যাপারে অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর "জীবনে যা দেখলাম" আত্মজীবনী গ্রন্থে যা লিখেন নিচে তাঁর কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল :

"পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা সফর সমাপ্ত করে তিনি জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করেন। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংগঠনের পর বিভাগীয় স্তর রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে সংগঠন সম্প্রসারিত থাকায় তা আগেই চালু করা সম্ভব হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে তখনও বিভাগীয় সংগঠন শুরু হয় নি। মাওলানার সফরের মাধ্যমে জামায়াত দাওয়াত ও সংগঠনের দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানেও সংগঠনের বিভাগীয় স্তর কায়েম করা প্রয়োজন বলে মাওলানা অনুভব করলেন। তখন সরকারিভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা-এ চারটি বিভাগ ছিল। জনাব আব্দুল খালেককে গাইবান্ধার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হল । জনাব আসাদ গিলানী লাহোরে চলে যাবার পর উত্তরবঙ্গের দায়িত্ব আমার উপরই ন্যস্ত ছিল। মাত্র মাস দেড়েক দায়িত্ব পালনের পরই আমাকে করাচীতে চলে যেতে হল। রাজশাহী বিভাগ বলতে উত্তরবঙ্গকেই বুঝায়। মাওলানা আমার উপরই বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব দিলেন। প্রাদেশিক সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সাথে এটা অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হল। মাওলানা নির্দেশ দিলেন যে, রাজশাহী বিভাগে জনাব আব্বাস আলী খানকে নিয়ে যেন আমি সফর করি এবং বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে যেন খান সাহেবের উপর অর্পণ করা হয়।

খুলনা বিভাগের আমীরের দায়িত্ব দেবার মতো কোন বাংলাভাষী রুকন পাওয়া গেল না। মাওলানা ইউসুফ তখন মঠবাড়িয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করছেন। কলেজের অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ঢাকায় অবস্থান করে জামায়াতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিলেন। কিন্তু তিনি তখনো রুকন হননি। মাওলানা তাঁকে খুল নার আমীর নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে রুকন বানিয়ে ছিলেন। রুকনিয়াতের শপথ ও বিভাগীয় আমীরের শপথ একসাথে নিলেন।

মাওলানা হেলাল উদ্দীন মুসলিম লীগের জেলা পর্যায়ের নেতা ছিলেন এবং আলিমদের সংগঠনের কাজও করেছেন। তাই ধারণা ছিল যে, এ দায়িত্ব তিনি সামলাতে সক্ষম হবেন। কিন্তু জামায়াতের মতো একটি সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন হঠাৎ করে নতুন লোকের পক্ষে অসম্ভব। স্বাভাবিক কারণেই অল্প কিছুদিন পরই এ দায়িত্ব পালনে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদুদী তখন প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আব্দুর রহীমকে কয়েক মাস খুলনা অবস্থান করে যখন সম্ভব মাও. ইউসুফের উপর দায়িত্ব অর্পণের চেষ্টা করার পরামর্শ দেন। ঢাকা বিভাগের দায়িত্ব

www.pathagar.com

দেবার মতো কোন বাংলাভাষী লোক ছিল না। তাই বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব লালবাগস্থ রহমতুল্লাহ হাইস্কুলের হেড মাস্টার সাইয়্যেদ হাফিজুর রহমানের উপর ন্যস্ত করা হয়।

মাওলানার সর্বশেষ প্রোগ্রাম

মাওলানা ৬মার্চ লাহোরে ফিরে গেলেন। এর দু'দিন আগে ৪মার্চ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড হলে এক সুধী সমাবেশে মহামূল্যবান এক ভাষণ দেন। এর শিরোনাম ছিলো 'পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও এর সমাধান'। এ ভাষণটি পরবর্তীতে বাংলা ও উর্দুতে পুস্তিকাকারে বিলি করা হয়। উক্ত সমাবেশে

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, হাইকোর্টের এডভোকেট, ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট সাংবাদিকসহ বাছাই করা লোকদেরকে কার্ড-মারফত দাওয়াত দেওয়া হয়। অনেকেই এসেছেন এবং মাওলানার বক্তব্য শুনে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আমি প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক এবং পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা জনাব আবুল হাশিমকে এ সমাবেশে আসবার জন্য দাওয়াত দিতে তাঁর বাসায় গেলাম। তিনি আগ্রহের সাথে দাওয়াত কবুল করলেন। তিনি বললেন, "আমি জেনেছি যে, মাওলানা মওদুদী মাদরাসা পাস গতানুগতিক মাওলানা নন; কুরআন ও হাদীসে পান্ডিত্য অর্জন করে তিনি মাওলানা হয়েছেন। এ কারণেই তাঁর বক্তব্য শুনতে যাবো।"

তিনি যথাসময়ে আসলেন। তাঁকে মঞ্চের নিকটবর্তী ভালো একটি চেয়ারে বসালাম।মাওলানার বক্তৃতা তিনি তন্ময় হয়ে শুনলেন। সুধী-সমাবেশ শেষ হলে আমি তাঁকে মাওলানার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম। তিনি উর্দুতেই মাওলানাকে বললেন, "আপনার বক্তব্যের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।" (জীবনে যা দেখলাম, ২য় খণ্ড-অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫২)

মাওলানার এ সফরে জনগণের নিকট সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামীর নাম ব্যাপক পরিচিতি লাভ করলো। শিক্ষিত ও সুধী মহলে মাওলানা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হল। রাজশাহী বারের সভাপতি মাওলানার বক্তব্য শুনার পর আমাকে বললেন, "বিরাট মাওলানা পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আসবেন শুনে কল্পনা করেছিলাম যে, বিশাল পাগড়ি মাথায় এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে সজ্জিত অবস্থায় দেখবো। এখন দেখলাম যে রীতিমতো একজন প্রতিভাবান ভদ্রলোক।"

"মাওলানা জামায়াতের দাওয়াতকে ব্যাপক করে দিয়ে গেলেন এবং সাংগঠনিক কাঠামোকে পুনর্গঠিত করে তাঁর দাওয়াতের প্রভাবকে কাজে লাগাবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন।" (জীবনে যা দেখলাম, ২য় খণ্ড-অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৪)

সংগঠনের উদ্যোগে প্রথম স্কুল স্থাপন

মাওলানা মওদুদীর সফর শেষে জনাব সামসুল হক সিলেট অঞ্চলে কাজ অগ্রসর করার চেষ্টা করেন। প্রাদেশিক সেক্রেটারী অধ্যাপক গোলাম আযম সাংগঠনিক কাজে কয়েক দফা সিলেটে আসেন। তাঁরা উভয়ই সিলেট শহরসহ মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ,

www.pathagar.com

কানাইঘাটের গাছবাড়ি মাদরাসা, উমাইরগাঁও প্রভৃতি স্থানে সফর করেন, সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, প্রশ্নের উত্তর দেন বৈঠক শেষে ঘরোয়া পরিবেশে বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। যেখানে সংগঠন নেই সেখানে প্রাথমিক সংগঠন গড়ার এবং যেখানে প্রাথমিক সংগঠন আছে সেখানে সংগঠন মজবুত ও সম্প্রসারণের পরামর্শ দিয়ে আসতেন।

১৯৫৭ সালে সিলেট মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক ডা.কুদরত উল্লাহ উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে গেলেন। যাবার সময় তিনি তাঁর বাসা দ্বীনের কাজে ব্যবহারের এখতিয়ার সংগঠনের হাতে ন্যস্ত করে গেলেন। সিদ্ধান্ত হল ডাক্তার সাহেবের বাসায় (বর্তমানে প্ল্যানেট আরাফ, জিন্দাবাজার) একটি প্রাথমিক ইসলামী স্কুল খোলা হবে। সামসুল হক সাহেব যখন ঝিঙ্গাবাড়ি মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন, তখন তাঁর সহকর্মী ছিলেন জনাব মুদাচ্ছির আলী (বাড়ি জকিগঞ্জ)। তাঁকে আনা হল । তাঁকে প্রতিষ্ঠান প্রধান করে স্কুল উদ্বোধন করা হল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে মূল্যবান পরামর্শ দিলেন জনাব মুদাররিছ চৌধুরী। সিলেটে বসবাসরত উর্দুভাষী জামায়াত সমর্থক ব্যক্তিদের সন্তানদেরকে দিয়ে প্রথম ক্লাস চালু হল। সাথে যোগ দিলেন মন্তাজ আলী মজুমদার সাহেবের সন্তানগণ। মাওলানা মুকাররম আলীও এই স্কুলে ক্লাস নিতেন। পরের বছর সামরিক আইন জারি হবার পর স্কুল চালু রাখা সম্ভব না হওয়ায় আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দুর স্কুলের সাথে অত্র স্কুলটি একত্রীভূত করা হয়।

সিমেন্ট ফ্যাক্টরির ইমাম সাহেবের জামায়াতে যোগদান

ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির প্রথম মুসলিম ইঞ্জিনিয়ার জনাব ইজহার আহমদ কোরেশীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছাতকে সংগঠন কায়েম করার উদ্যোগ নেন। নিজে উর্দুভাষী, স্টাফের প্রায় সবাই হিন্দু, তাই কাজ করার সূত্র (Source) অনুসন্ধান করতে থাকেন। একদিন তিনি আসরের নামাজ জামায়াতে আদায় করলেন ফ্যাক্টরির মসজিদে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে মুছল্লী পেয়ে ইমাম সাহেব মহাখুশী। নামায আদায় করে দুজন সুরমা নদীর পারে হাঁটলেন এবং গল্প করলেন। এর পুনরাবৃত্তি হল কয়েকদিন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ইমাম সাহেবের মধ্যে ইলম ও প্রতিভা খুঁজে পেলেন। প্রস্তাব করলেন তিনি কুরআন বুঝতে চান। ইমাম সাহেব যেন তাঁর টিউটর হন। ইমাম সাহেব উচ্চ শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারকে ছাত্র হিসেবে পেয়ে মহা খুশি। তাঁর কোয়ার্টারে তিনি যেতে লাগলেন। দু'চার দিন পর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁর হাতে তুলে দিলেন মাওলানা মওদুদীর তাহফিমুল কুরআন এবং তাঁকে তাফসীর বুঝানোর অনুরোধ জানালেন। কয়েকদিন পর ইমাম সাহেবকে তিনি মাওলানা মওদুদীর উর্দু বই পড়তে দিলেন। আরম্ভ হল বইয়ের উপর আলোচনা। মাওলানা মওদুদীর তাফসীর ও কিতাব ইমাম সাহেবের পছন্দ হল না। কিন্তু তিনি নিযুক্ত টিউটর, অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রথম উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান এবং ফ্যাক্টরির বড় কর্মকর্তা। তিনি কুরআন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক বুঝতে চান সুতরাং ইমাম সাহেবকে টিউশনী চালাতে হল। কিছু দিন পর মাওলানা মওদুদীর 'মাসআলায়

www.pathagar.com

কওমিয়াত' বই পাঠ করে ইমাম সাহেবের নিজের খটকা দূরীভূত হল। তিনি প্রথমে জামায়াতের কর্মী এবং পরবর্তীতে রুকন হয়ে যান। তিনি জমিয়তে উলামা হিন্দের নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত সিলেটের আলেম সমাজের মধ্যে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। উলামাদের সংগঠন 'ইত্তেহাদুল উলামা'র তিনি সিলেটের সভাপতি নিযুক্ত হন।

এই ইমাম সাহেব আর কেউ নন, তিনি হলেন মাওলানা এখলাসুল মু'মিনিন। তিনি গোলাপগঞ্জের হেতিমগঞ্জের জমিয়তে উলামা হিন্দের খুবই প্রভাবশালী নেতা মাওলানা নুরুল মুত্তাকীন সাহেবের চাচাতো ভাই। মাওলানা এখলাসুল মুওমিনিন নিজে বড় আলেম ছিলেন এবং জমিয়তে উলামা হিন্দের আসাম প্রদেশের সেক্রেটারী ছিলেন। গণভোটের সময় তিনি সিলেটকে ভারতের সাথে যুক্ত করার জন্য যারপরনাই মেহনত করেছেন। ভোটে হারার পর রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে এবং অপমানে আসাম চলে যান। বেশ কিছু দিন পর বিশেষ সূত্র ধরে হিন্দু অফিসারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হয়ে এখানে আসেন।

মাওলানা আব্দুন নুর সাহেবের জামায়াতে যোগদান

দক্ষিণ সুরমার লাউয়াইর মাওলানা আব্দুন নূর সাহেব তখন রানাপিং কওমী মাদরাসার ছাত্র। ছাত্রদের মধ্যে নেতা সুলভ গুণের অধিকারী। তিনি কওমী মাদরাসার ছাত্র হওয়ায় মাওলানা মওদুদী ও জামায়াতের বিরোধি ছিলেন। সরকারি সনদের প্রয়োজনে তিনি কানাইঘাটের ঝিংগাবাড়ি আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। শুনলেন গাছবাড়ি মাদরাসায় অধ্যাপক গোলাম আযম বক্তব্য রাখবেন। তিনি ভাবলেন-একেতো গোমরাহ্ জামায়াতের লোক, তাঁরপর ইংরেজি শিক্ষিত আর গোমরাহ্ করতে আসবে সিলেটের সবচেয়ে উন্নতমানের দারুল উলুমের উস্তাদ ছাত্র এবং আলেম প্রধান এলাকার আলেম ও জনগণকে । অধ্যাপক সাহেবকে নাজেহাল করার নিয়তে প্রয়োজনে শহীদ হয়ে গোমরাহী থেকে এলাকাকে বাঁচানোর নেক খেয়াল নিয়েই তিনি বক্তব্য শুনতে আসলেন। এসে আরো এক হোঁচট খেলেন-মাদরাসায় এবং এলাকায় এত আলেম থাকতে মাহফিলে সভাপতিত্ব করছেন ইংরেজি শিক্ষিত সামসুল হক বি.এ। বক্তব্য আরম্ভ হয়ে গেছে-গোলাম আযম সাহেব কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা করছেন। তিনি ভাবলেন শুনতে ভাল লাগছে, আরো একটু শুনি তাঁরপর Action আরম্ভ হবে। 'নিশ্চয়ই আমার পক্ষে লোক পাবো।' বক্তব্য শুনে নিজেই তিনি মুগ্ধ হলেন। কালেমার ব্যাখ্যা তাঁর মনের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। তিনি ভাবলেন-'এক মাদরাসা শেষ করে আরো এক মাদরাসায় অধ্যয়ন করছি-কত কিতাব পড়লাম। কালেমার এত সুন্দর ব্যাখ্যা জীবনে 'শুনি নাই'। তাঁর উপর বক্তব্য তাছির করল। মাদরাসায় ফিরে এসে সহপাঠীদের কাছে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পেলেন। পড়ে ভাল লাগল। সামসুল হক সাহেবের সাথে পথিমধ্যে একদিন দেখা হল। তিনি জিন্দাবাজার জামায়াত অফিসের ঠিকানা দিলেন। মাওলানা আব্দুন নূর অফিস থেকে উর্দু বই নিয়ে পড়লেন। ইতোমধ্যে আইয়ূব খানের সামরিক শাসন চালু হয়ে গেল। সিলেটের শাহী ঈদগাহ ময়দানে ইসলামী সেমিনার হল। তিনি

www.pathagar.com

বক্তব্য মনযোগ দিয়ে শুনলেন-সামরিক আইন উঠার পর তিনি জামায়াতের সার্বক্ষণিক কর্মী, এবং রুকন হলেন। ১৯৬৪ এবং ১৯৬৯ সালে মৌলভীবাজারে সার্বক্ষণিক অবস্থান করে জামায়াতের কাজ অগ্রসর করলেন। বাংলাদেশ হবার পর তিনি জেল খাটলেন । জেল থেকে মুক্ত হবার পর তিনি সিলেট অঞ্চলের জামায়াত নেতা কর্মীদের খোঁজ-খবর নেন। তাদের পুনর্বাসিত করার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন । সামান্য মূলধন জোগাড় করে, এই মূলধন খাটিয়ে তিনি চট্টগ্রাম থেকে পণ্যদ্রব্য এনে সিলেটে বিক্রি করতেন এবং লভ্যাংশ জামায়াত কর্মীদের পুনর্বাসনের কাজে ব্যয় করতেন। তাঁর বাড়িতে খুবই সাধারণ মানের একটি ঘর নির্মাণ করা হয় যেখানে জামায়াতের কর্মকান্ড পরিচালিত হত। প্রোগ্রাম চলা অবস্থায় নাশতা ও খাবার-দাবারের ব্যবস্থা উনার বেগম ও ছেলে-মেয়েরা হাসিমুখে আয়োজন করে দিতেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি দাওয়াতুল ইসলাম ইউকের আহবানে গ্লাসকো বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের ইমাম হিসেবে বিলাত চলে যান। ২০০৬ সালের ৫ নভেম্বর তারিখে লন্ডনে তিনি ইন্তেকাল করেন। লন্ডনে মরহুম সামসুল হক সাহেবের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

জারী হল সামরিক আইন

আগে উল্লেখ করা হয়েছে শাসনতন্ত্র পাস করে তা জারী করা হল । পাকিস্তানের নাম হল Islamic Republic of Pakistan ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হল। জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা চলে যাক-বেসামরিক এবং সামরিক আমলারা তা মেনে নিতে পারলেন না। শুরু হল ষড়যন্ত্র। ১৯৫৮ সালের ৭অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্‌কান্দার মীর্জা তাঁর বাসভবনে রিপাবলিকান পার্টির নেতা প্রধানমন্ত্রী ফিরোজখান নূন ও তাঁর মন্ত্রীবর্গ এবং সাথে দপ্তর বন্টন নিয়ে ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ দলীয় কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীবর্গকে রাতের খাবারে দাওয়াত করলেন। খাওয়া দাওয়া শেষে তাদেরকে বিদায় দিয়ে মধ্য রাতে তিনি দেশে সামরিক আইন জারি করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করেন, রাজনৈতিক দল বে-আইনি ঘোষণা করেন। সদ্য প্রণীত শাসনতন্ত্র বাতিল করেন এবং সেনাপতি আইয়ুব খানকে মার্শাল-ল এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করেন। ২৪ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি লে: জেনারেল মুসাকে সেনাপতির দায়িত্বে উন্নীত করেন। ২৭ অক্টোবর আইয়ূব খান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ষড়যন্ত্রের কাউন্টার ষড়যন্ত্র হল। ঐ রাতেই জেনারেল আযম খান, জেনারেল এম.এম.শেখ ও জেনারেল বার্কি প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জার সাথে দেখা করে অস্ত্রের মুখে তাঁর ইস্তফাপত্র আদায় করেন এবং সস্ত্রীক লন্ডনের প্লেনে তুলে দেন। বহু অঘটন ঘটন পটিয়সী ষড়যন্ত্রের ২য় মহানায়ক ইসকান্দার মীর্জা জীবনের বাকি দিনগুলো অতিবাহিত করেন বিলাতের হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে।

আইয়ুব খান জনসমক্ষে ঘোষণা করলেন-রাজনৈতিক নেতাদের হাস্যকর লড়াই, দুর্নীতির ব্যাপকতা, সরকারি দলের লোকদের লুটপাট, জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে আইন সভায় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পিটিয়ে হত্যা ইত্যাদি কারণে উপায়ন্তর না দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এ কঠিন দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিতে তিনি একান্ত বাধ্য হয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি, রাজনৈতিকদল ও রাজনৈতিক নেতাদের চালচিত্র

সামরিক আইন জারির অন্যতম কারণ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভার ডেপুটি স্পীকারকে পার্লামেন্টের সদস্যগণ আইন সভার অধিবেশন চলা অবস্থায় পিটিয়ে হত্যা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কি এমন হয়েছিল যার কারণে ডেপুটি স্পীকার নিহত হলেন? তা জানার আগে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চালচিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে:

- ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সালের মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সরকার পরিচালনা করে মুসলিম লীগ। প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী হলেন জনাব নূরুল আমীন।
- ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল থেকে ২৯ মে পর্যন্ত সরকার পরিচালনা করে যুক্তফ্রন্ট। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।
- ৩০ মে ১৯৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এ পূর্বপাকিস্তান ৯২(ক) ধারা জারি করে মন্ত্রিসভা বাতিল করেন এবং গভর্নর জেনারেল শাসন জারি করে মেজর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জাকে গভর্নর নিযুক্ত করেন।
- বছর খানেক পর ৯২ক ধারা প্রত্যাহার করা হয়। ৩রা জুন ১৯৫৫ সাল থেকে কৃষক শ্রমিক পার্টি সরকার পরিচালনা করে। আবু হোসেন সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।
- ৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী হন জনাব আতাউর রহমান খান। সরকার পরিচালনা করে আওয়ামী লীগ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় তিনি আবু হোসেন সরকারের পতন ঘটিয়ে আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খানকে ক্ষমতায় বসানোর ব্যবস্থা করেন।
- ১৯৫৮ সালের ৩০ মার্চ কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার আবার প্রধানমন্ত্রী হন এর আগে ন্যাপ দলীয় আইনসভার সদস্যগণ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করলে আতাউর রহমান খানের সরকারের পতন ঘটে।
- ১দিন পর ১লা এপ্রিল আবার আতাউর রহমান খান প্রধানমন্ত্রী হন । সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী । তিনি প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জাকে ফুসলায়ে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর শেরে বাংলা একে ফজলুল হককে বরখাস্ত করান। নতুন গভর্নরের মাধ্যমে আতাউর রহমান খান আবার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

www.pathagar.com

- দেড়মাস পর আইনসভার অধিবেশনে আতাউর রহমান খানের সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসে। ন্যাপ এর অসহযোগিতাঁর কারণে সরকারের পতন হয়।
- ১৯ জুন আবু হোসেন সরকার আবার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিন দিনের মাথায় ন্যাপের অসহযোগিতাঁর কারণে অনাস্থা ভোটে তাঁর সরকারের পতন হয়।
- ৫৮ সালের ২৬ জুন প্রদেশে প্রেসিডেন্টের শাসন জারি হয়।
- দুই মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরকে ম্যানেজ করে ফেলে। ফলে প্রেসিডেন্টের শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং ২২ জুলাই আতাউর রহমান খান পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে।

এরপর কী হয়েছিল জনাব অলি আহাদের বই থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

'সেপ্টেম্বর মাসের ২০তারিখ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহুত হয়। সরকার দলীয় স্পীকার আব্দুল হাকিমের সহিত মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে পরিষদের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার মানসে স্পীকার আব্দুল হাকিমের বিরুদ্ধে দেওয়ান মাহবুব আলী (ন্যাপ সদস্য) অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং সরকারি অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া দাবি করেন। মজার ব্যাপার, পরক্ষণেই সরকারি দলভুক্ত পিটার পল গোমেজ স্পীকার আব্দুল হাকিমকে 'পাগল' ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উক্ত প্রস্তাব গৃহীতও হয়। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছিল যেন, পাগলামীর প্রতিযোগিতায় সবাই অবতীর্ণ; দেশ ও জাতি গৌণ। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল পরিষদ অভ্যন্তরে দাংগা। ২৩ সেপ্টেম্বর দেশবাসী অধিবেশন-নাটকের উপসংহার অবলোকন করে। ভারপ্রাপ্ত স্পীকার শাহেদ আলী পরিষদের অভ্যন্তরেই মারাত্মকভাবে আহত হন এবং ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৫৮) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ২৪ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয় এবং ইহার যবনিকাপাত ঘটে ৭ অক্টোবর দেশব্যাপী সামরিক শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫- অলি আহাদ, পৃষ্ঠা নং ২৯৪-২৯৫)

এক নজরে সামরিক আইনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ ও রাজনৈতিক দল

সাল	প্রধানমন্ত্রী (Cheaf Minister)	দল
১৯৪৭-'৪৮	খাজা নাযিম উদ্দীন	মুসলিম লীগ
১৯৪৮-'৫৪	নূরুল আমিন	মুসলিম লীগ
১৯৫৪ ৩এপ্রিল-২৯মে	এ.কে. ফজলুল হক	যুক্ত ফ্রন্ট

www.pathagar.com

গভর্নর জেনারেলের শাসন		
১৯৫৪ সালের ৩০ মে-২ জুন '৫৫	গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা	
১৯৫৫ সালের ৩ জুন থেকে ৫ সেপ্টেম্বর '৫৬	আবু হোসেন সরকার	কৃষক শ্রমিক পার্টি
১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ মার্চ '৫৮সাল	আতাউর রহমান খান	আওয়ামী লীগ
৩০ ও ৩১ মার্চ ১৯৫৮ সাল	আবু হোসেন সরকার	কৃষক শ্রমিক পার্টি
১৯৫৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৮ জুন	আতাউর রহমান খান	আওয়ামী লীগ
১৯৫৮ সালের ১৯ জুন থেকে ২৫ জুন	আবু হোসেন সরকার	কৃষক শ্রমিক পার্টি
প্রেসিডেন্টের শাসন		
১৯৫৮ সালের ২৬ জুন থেকে ২১ জুলাই	গভর্নর সুলতান উদ্দীন খান	
১৯৫৮ সালের ২২ জুলাই থেকে ৭ অক্টোবর	আতাউর রহমান খান	আওয়ামী লীগ
১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাতে সামরিক আইন প্রবর্তন		

রাজনৈতিক দল ও নেতাদের ব্যাপারে আরো কিছু তথ্য:

"মুসলিম লীগ ক্ষমতায় বসার পর যে উদারতা ও গণতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল তা তাঁরা দেয় নি। বরং শত্রুতামূলক আচরণে অবতীর্ণ হয়। দেশ বিভাগের পর অখন্ড বাংলার বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ভেঙে দেওয়া হয় এবং সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী সহ তাদের লোকদের বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এমনকি মুসলিম লীগের সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণের পথও সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। আতাউর রহমান খানের মত লোকও বারবার ধর্ণা দিয়েও মুসলিম লীগে প্রাথমিক সদস্যপদের রশিদ পান নাই।" (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর- আবুল মনসুর আহমদ)

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে শুধু প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বাদ দেওয়া হয় নি তাঁর পার্লামেন্টের সদস্যপদও বাতিল করে তড়িঘড়ি করে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অথচ জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ১৯৪৬ সালের দিল্লি লেজিসলেটার কনভেনশনের প্রস্তাব উত্থাপনকারীযে প্রস্তাবের মাধ্যমে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করা হয়। তখন তিনি ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গীয় মুসলিম লীগ পার্টির নেতা এবং অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী। মুসলিম লীগ প্রধান কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইংরেজ সরকারের কংগ্রেস তোষণনীতির প্রতিবাদে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট Direct Action Day ঘোষণা করেন। তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেবই বঙ্গে যথাযথ কর্মসূচি পালন করেন। কর্মসূচি পালনের প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ সরকার ভারত ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

টাঙ্গাইল উপনির্বাচন

আইন পরিষদের দক্ষিণ টাঙ্গাইল আসন খালি হলে করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নীকে পরাজিত করে এ উপনির্বাচনে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী নির্বাচিত হন। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে নির্বাচন বাতিল করা হয় এবং গভর্নরের এক আদেশবলে নির্বাচনী ক্রটির অপরাধে মাওলানা ভাসানী এবং খুররম খান পন্নীকে ১৯৫০সাল পর্যন্ত নির্বাচনে প্রার্থী হবার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। তাঁরপর এ আসনে ১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিল উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। ইতোমধ্যে কেবলমাত্র খুররম খান পন্নীর পূর্ব ঘোষিত প্রার্থী হবার অযোগ্যতা প্রত্যাহার করা হয় এবং মুসলিম লীগ প্রার্থী হিসেবে তাঁকে উপনির্বাচনে দাঁড় করায়। তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী হন তরুণ ও নিঃস্বার্থ ত্যাগী নেতা জনাব সামসুল হক (টাঙ্গাইল)। নির্বাচনে তিনি জয়ী হন। এরপর মুসলিম লীগ সরকার তাদের মেয়াদ ৫৪সাল পর্যন্ত ৩৫টি শূন্য আসনের একটিতেও উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করে নি। অন্যদিকে ষড়যন্ত্র করে জনাব সামসুল হককেও আইন পরিষদে বসতে দেওয়া হয় নি।

- ১৯৫৩ সালের ১৭এপ্রিল পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী; গণপরিষদের মুসলিম লীগ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত নেতা ও দলীয় সভাপতি খাজা নাযিমউদ্দীনকে বিনা কারণে বরখাস্ত করেন। অথচ না কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ, না পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কোন পর্যায়ে কোন প্রতিবাদ করা হয়। তবে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিবাদ করেছিলেন। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমান গোলাম মোহাম্মদের কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বরখাস্ত করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।
- ১৯৫৪ সালের ৩১শে মে গোলাম মোহাম্মদ পাকিস্তান গণপরিষদ ভেঙে দিলেন। মুসলিম লীগ একটি প্রতিবাদও করল না। মুসলিম লীগ দলীয় স্পীকার মৌলভী তমিজউদ্দীন খান নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে কোন সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি মাওলানা মওদুদীর কাছে গেলেন। তাঁর সহযোগিতা পেয়ে তিনি সিন্ধু হাইকোর্টে গোলাম মোহাম্মদের বিরুদ্ধে মামলা করলেন।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে হঠকারিতা

রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে সরকারের সাথে ছাত্র জনতাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয়। উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্র জনতা বিরোধিতা করে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এক পর্যায়ে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিম উদ্দীনের চুক্তিপত্র হয়। তিনি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান করেন। অথচ ঐ খাজা নাযিম উদ্দীন কেন্দ্রীয় সরকারের (পাকিস্তানের) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫২ সালে পল্টন ময়দানে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' বলে ঘোষণা দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন। শুরু হয় ছাত্র জনতাঁর রাজপথ কাঁপানো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। '৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন দমন করার জন্য ছাত্রজনতাঁর উপর গুলি চালানো হয়। যার ফলে বরকত, ছালাম ও জব্বার প্রমুখ শহীদ হন। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায় কিন্তু নুরুল আমীনের মুসলিম লীগ সরকার প্রত্যাখ্যাত হয়। অবস্থা এই পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যেখানে ২২৩টি আসন লাভ করে, সেখানে মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ দলীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমিন নির্বাচনে ছাত্র নেতা খালেক নেওয়াজ খানের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন

ভারতভাগ পূর্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের দুটি গ্রুপ ছিল। এক গ্রুপের নেতা সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম। অন্য গ্রুপের নেতৃত্বে মাওলানা আকরাম খান, খাজা নাযিম উদ্দীন ও নূরুল আমিন। ভারত ও বঙ্গ ভাগের পর 'বঙ্গীয় মুসলিম লীগ' ভেঙে দেওয়া হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। নবগঠিত মুসলিম লীগে সরকারি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু সোহরাওয়ার্দী প্রথম দিকে কলকাতায় থেকে যান তাই নবগঠিত মুসলিম লীগ সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপের কাউকে দলে রাখা হয় নি। এমন কি দলে তাঁদের প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণের পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর সহকর্মী ও সমর্থকবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানে আসেন। নবগঠিত মুসলিম লীগে তাঁদের প্রবেশাধিকারও রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। অভিযোগ ওঠে মুসলিম লীগ নবাব, খাজা, জমিদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে গেছে। অতএব জনগণের মুসলিম লীগ গঠন করা দরকার। মুসলিম লীগের বঞ্চিত ও বিদ্রোহী অংশ উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকারি ভ্রূকুটি ও বাধা উপেক্ষা করে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেন হলে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। 'আওয়ামুন' আরবী শব্দ, এর উর্দু রূপ হল আওয়াম। বাংলা অনুবাদ হল- জনগণ ''আওয়ামী মুসলিম লীগ'' অর্থ হল- জনগণের মুসলিম লীগ। ৪০ সদস্য বিশিষ্ট অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হয়।

www.pathagar.com

কমিটির কয়েক জনের নাম ও পদবী :

সভাপতি	-	মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
সহ-সভাপতি	-	আতাউর রহমান খান
সাধারণ সম্পাদক	-	সামসুল হক (টাঙ্গাইল)
যুগ্ম-সম্পাদক	-	শেখ মুজিবুর রহমান
সহ-সম্পাদক	-	খন্দকার মোশতাঁর আহমদ
কোষাধ্যক্ষ	-	ইয়ার মোহাম্মদ খান

ইত্তেফাকের জন্ম

সরকারি মুসলিম লীগের মুখপত্র 'দৈনিক আজাদ'। আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র দরকার, তাই মাওলানা ভাসানী উদ্যোগী হন। সরকারি অনুমতি নিয়ে তিনি প্রকাশ করেন 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক'। ইত্তেফাকের প্রকাশক ও মুদ্রাকর হন দলীয় কোষাধ্যক্ষ জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান। কিছু দিন পর তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন। তিনি কলকাতায় দৈনিক ইত্তেহাদের সাথে জড়িত ছিলেন। সাংবাদিকতায় অভিজ্ঞ ও আওয়ামী মুসলিম লীগের গোঁড়া সমর্থক- তাই তাঁকে ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করে সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। 'ইত্তেফাক' ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার গায়ে লেখা থাকত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী; প্রিন্টার ও পাবলিশার-ইয়ার মোহাম্মদ খান; সম্পাদক-তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা)। এই মানিক মিয়া গোটা ইত্তেফাক ও এর সকল সম্পত্তি কিভাবে কুক্ষিগত করে নিজে মালিক বনে যান-সে বর্ণনা পরে আসবে।

অলি আহাদের আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদের অন্যতম সদস্য ও সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের প্রধান নেতা অলি আহাদকে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে আহবান জানান জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব আব্দুল হামিদ চৌধুরী। তিনি তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে ১৯৫৩ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে দলের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনে জনাব অলি আহাদ দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। এবার এই অলি আহাদ সাহেবের লিখিত "জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫" বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হচ্ছে:

"১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও পাকিস্তান কৃষক

www.pathagar.com

শ্রমিক পার্টির প্রধান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সম্মিলিতভাবে পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রীদল, পাকিস্তান খেলাফতে রব্বানী পার্টির সহযোগিতায় "যুক্তফ্রন্ট" গঠন করেন। ঐক্যবদ্ধভাবে আসন্ন নির্বাচনের মোকাবেলা করাই ছিল এই ফ্রন্ট গঠনের উদ্দেশ্য।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ২০০)

"১৯৫৪ এর নির্বাচন স্বতন্ত্র নির্বাচনী প্রথায় অনুষ্ঠিত হওয়ায় যুক্তফ্রন্ট দুইশত সাঁইত্রিশটি মুসলিম-নির্বাচনী কেন্দ্র হইতে দুইশত তেইশটি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ পায় নয়টি আসন বাকি পাঁচটি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। বাহাত্তরটি সাধারণ নির্বাচনী কেন্দ্র অর্থাৎ অমুসলিম আসনের মধ্যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস পঁচিশটি, সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন সাতাশটি, সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট তেরটি, কমিউনিস্ট পার্টি চারটি ও গণতন্ত্রীদল তিনটি আসন লাভ করে।"

- 'যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত দুইশত আটাশ জন সদস্যের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট অংগদল যথা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি লীগ ১৪৩, পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি ৪৮, পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি ২২, পাকিস্তান গণতন্ত্রীদল ১৩, খেলাফতে রব্বানী পার্টি ২টি আসনে নির্বাচিত হয়।' (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ২০৫)

"ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে ২রা এপ্রিল (১৯৫৪) পূর্ববংগ আইন পরিষদে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের পার্লামেন্টারী সভায় শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে আনুষ্ঠানিকভাবে নেতা নির্বাচন করা হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সভায় সভাপতিত্ব করেন। ৩রা এপ্রিল শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শেরে বাংলার সহিত জনাব আবু হোসেন সরকার ও শেরে বাংলার ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) শপথ গ্রহণ করেন। স্বজন-প্রীতির বিরুদ্ধে নির্বাচন যুদ্ধে সোচ্চার থাকা সত্ত্বেও সরকার গঠনের প্রথম পদক্ষেপেই ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হককে মন্ত্রিসভার সদস্য করিয়া শেরে বাংলা ২১ দফার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত, সর্ববৃহৎ অংগদল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ হইতে কাহাকেও মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন নি। ফলে অনৈক্যের সৃষ্টি হইল। কেন্দ্রীয় শাসকচক্র ও কায়েমী স্বার্থবাদী মহল অতি সন্তর্পণে ইহারই অপেক্ষায় ওঁৎ পাতিয়া ছিল। মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলার উল্লেখিত কার্যক্রম দুইটি ছিল যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের প্রতি ভাগ্যাহত জনগণের উচ্চাশা ও অবিচল আস্থার উপর অপ্রত্যাশিত ও নির্মম কষাঘাত। নেতাঁর অদূরদর্শিতাপূর্ণ কার্যাবলি এইভাবেই দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্ত করে।"

শেরে বাংলার আচরণে বিক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শেরে বাংলার সরকারকে বেকায়দায় ফেলার সুযোগ অন্বেষণে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করে। মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক কলকাতা সফরকালে ৩০শে এপ্রিল এক সংবর্ধনা সভায় ভাষণ দান কালে আবেগ প্রসূত মুহূর্তে বলেন, "রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বাংগালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাংগালীত্বকে কোন শক্তিই

www.pathagar.com

কোনদিন ভাগ করিতে পারিবে না। দুই বাংলার বাংগালী চিরকাল বাংগালীই থাকিবে।" শেরে বাংলার উক্তিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে। আওয়ামী মুসলিম লীগ শেরে বাংলার উক্তির কদর্থ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে তাঁকে ঘায়েল করার জন্য সচেষ্ট হয়। এদিকে ২রা মে (১৯৫৪) বা ১লা রমজান অপরাহ্নে এক অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের গুলিতে ছয়-সাত বছরের এক কিশোর বালক প্রাণ হারায়। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ :

"চকবাজারের এক পানের দোকানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এক কারারক্ষী (Jail warden) মকবুল হোসেন 'বাকি' খরিদ বাবদ বার আনা বা পাঁচত্তর পয়সা ঋণী ছিল। মকবুল হোসেন পুনরায় বাকি খরিদ করিতে চাহিলে দোকানী বাকি বিক্রী করিতে অস্বীকৃতি জানায় ও পূর্বেকার বাকি পাঁচত্তর পয়সা পরিশোধ করিতে বলে। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে বচসার সূত্রপাত হয় ও ঘটনা ক্রমান্বয়ে হাতাহাতি ও মারামারির রূপ গ্রহণ করে। এই তুচ্ছ ঘটনাটিই অচিরে জনতা ও কারারক্ষীদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার মতলবে খবর পাওয়া মাত্র পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক ও পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদের সদ্য নির্বাচিত সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান এক উচ্ছৃঙ্খল জনতাঁর কাফেলাকে নেতৃত্ব দিয়া জেলগেট সন্নিকটবর্তী সশস্ত্র পুলিশদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অগ্রসর হইলে, আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার অপরিহার্য কারণেই জেল গেইটে প্রহরারত সশস্ত্র পুলিশ গুলীবর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। আইজিপি শামসুজ্জোহা সশরীরে উপস্থিত হন ও আক্রমণকারী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতাঁর করেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঘটনা অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ এবং অনুল্লেখযোগ্য অথচ ইহার ফলশ্রুতিতে একটি নির্দোষ নিষ্পাপ কিশোরকে পুলিশের গুলিতে আত্মাহুতি দিতে হইল। অকারণেই খালি হইল মায়ের বুক। সস্তা জনপ্রিয়তাঁরামী শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ঘটনার যথার্থতা বা গুণাগুণ বিচার অবান্তর।

উল্লেখ্য, আমাদের অনুরোধে নেহায়েত অনিচ্ছাকৃতভাবেই জনাব সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের জন্য শেরে বাংলাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেরে বাংলা শেখ সাহেবকে মন্ত্রিসভায় নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানান। ফলে গোটা আওয়ামী লীগের আর কাহাকেও মন্ত্রিসভায় নেওয়া হয় নি। ইহাই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণ। আর ইহারই পরিণাম ফল সদ্য গঠিত ফজলুল হক সরকারের বিরুদ্ধে তাঁহার এই অভিযান।' (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ২১২-২১৫)

"১৫ই মে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হইল। আওয়ামী লীগের তরফ হইতে আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আব্দুস সালাম খান, শেখ মুজিবুর রহমান ও হাশিমুদ্দিন আহমদ মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ২১৬)

"৩০শে মে গভর্নর জেনারেলের ভাষায় "কমিউনিস্ট বিশৃঙ্খলা দমনে" ব্যর্থ শেরে বাংলার মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা হয় অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে ৯২ক ধারা প্রবর্তন করিয়া জারি করা হয় কেন্দ্রীয় শাসন। গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামানের স্থলে দেশরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে গভর্নর পদে ও জনাব এম.এ.ইসহাকের স্থলে জনাব এন.এম. খানকে চীফ সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করা হয়।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ২১৭)

"শেরে বাংলা অন্তরীণ অবস্থায় ২৩ শে জুলাই (১৯৫৪) রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া প্রকাশ্যে বিবৃতি দিলেন। মাওলানা ভাসানী লন্ডনে দিন গুজরান করিতেছিলেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী পেটের ফোঁড়া অপারেশন কল্পে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ হাসপাতালে ভর্তি হইলেন। অথচ এই তিন প্রধান ঢাকার মাটিতে দাঁড়াইয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক জারিকৃত গভর্নরি শাসন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে ডাক দিলে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে পুনর্বহাল করা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কোন উপায় থাকিত না। নেতৃত্বের দুর্বলতা জনতার প্রতিরোধ চেতনা ও শক্তিকে যে কিভাবে স্তিমিত করিয়া ফেলে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ"।

"মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান নিজে গ্রেফতারের পূর্বে ৩০শে মে করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াই অপরাহ্নে তাঁহার সরকারি বাসভবনে আমাদের (অর্থাৎ আব্দুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালাল উদ্দীন, হাতেম আলী তালুকদার ও আমি) সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইয়া প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ার পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি তদুত্তরে তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, প্রতিরোধ আন্দোলন করার প্রয়োজনেই শেখ সাহেবকে আত্মগোপন করিতে হইবে এবং তাহার গ্রেফতাঁর বরণ করা সমীচীন হইবে না। কিন্তু আমাদের পরামর্শের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া শেখ সাহেব সরকারি বাসভবনেই রাত্রি যাপন করিলেন এবং তথা হইতেই গ্রেফতাঁর হইলেন ও নির্ঝঞ্ঝাটে কালযাপনের জন্য ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আশ্রয় লইলেন।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা নং-২১৯)

"জনাব শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হইতে গোলাম মোহাম্মদকে টেলিগ্রাম যোগে ফরমান বলে পাকিস্তান গণপরিষদের অন্যায় ও অবৈধ বিলুপ্তিকে স্বাগত জানান।"

"১৪ই নভেম্বর গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের ঢাকা আগমন উপলক্ষে পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী ও রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের সুস্পষ্ট ঘোষণাকারী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক পুনরায় কর্মচঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রিত্বের টোপের যাদুকরী প্রভাবেই শেরে বাংলা ও আতাউর রহমান খান ঢাকা বিমান বন্দরে স্বৈরাচারী গভর্নর জেনারেলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেন। বিমান বন্দরে কে তাঁহাকে প্রথমে মাল্যভূষিত করিবেন এই সমস্যায় জর্জরিত দুই নেতাকে উদ্ধার করিলেন গভর্নর জেনারেল স্বয়ং। অর্থাৎ তিনি শেরে বাংলা ও আতাউর রহমান খানের দুই হাত একত্রিত

www.pathagar.com

করিয়া যুগপৎ মাল্যদানের সুযোগ করিয়া দিয়া উভয়েরই ধন্যবাদাই হইলেন। জন প্রতিনিধিদের এই কর্মকান্ডে অবাক গোলাম মোহাম্মদ নিশ্চয়ই তাঁহাদের অলক্ষ্যে ক্রুর হাসি হাসিলেন এবং মনে মনে বোধ হয় আওড়াইলেন "আসিলাম, দেখিলাম এবং জয় করিলাম।" ৯২ক ধারার গভর্নরি শাসনের যাঁতাঁরলে পূর্ববঙ্গবাসীর যখন নাভিশ্বাস উঠিতেছিল, তখনই তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই ন্যাক্কারজনক কুৎসিত চেহারা ও ক্ষমতাঁর উচ্ছিষ্ট ভোগের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা দেশবাসীকে স্তম্ভিত না করিয়া পারে নি।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা নং-২২১-২২২)

"১৮ই ডিসেম্বর কারামুক্তির অব্যবহিত পরই শেখ মুজিবুর রহমান বিভেদের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং যুক্তফ্রন্ট নেতা শেরে বাংলার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহবান করেন। ওয়ার্কিং কমিটি শেরে বাংলার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থনের জন্য আওয়ামী লীগ পরিষদ সদস্যদের উপর নির্দেশ জারি করেন।"

"মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানীর লন্ডন হইতে যুক্তফ্রন্ট ভঙ্গের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ও আতাউর রহমান খান ১৭ই ফেব্রুয়ারি (১৯৫৫) শেরে বাংলাকে নেতৃত্ব হইতে অপসারণ করে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন ও নতুন নেতা নির্বাচনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। অনাস্থা প্রস্তাব সভায় শেরে বাংলা ১১৯ ও আতাউর রহমান খান ১০৫ সদস্যের সমর্থন পান।"

"উপরোল্লিখিত ঘটনাবলির ধারায় জনগণের অলক্ষ্যে ও নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই ব্যক্তিসর্বস্ব, ব্যক্তি প্রাধান্য ও ব্যক্তিপূজা আশ্রয়ী রাজনীতির অভিশাপ দেশবাসীর ঘাড়ে চাপিয়া বসে। যাহা হউক এভাবেই যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া গেল।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা নং-২২৫-২২৭)

"অসুস্থ গভর্নর জেনারেল চিকিৎসার কারণে সুইজারল্যান্ড অবস্থানকালে আইনমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কতিপয় সাংবিধানিক বিষয় আলোচনার প্রয়োজনে তাঁহার নিকট গমন করেন। তাঁহাদের উভয়ের অনুপস্থিতির সুযোগে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী শেরে বাংলার সহিত আঁতাত করেন ও শেরে বাংলার পরামর্শে ৩রা জুন পূর্ববঙ্গে আরোপিত ৯২-ক ধারা প্রত্যাহার করেন এবং ৬ জুন (১৯৫৫) যুক্তফ্রন্ট সদস্য ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব বঙ্গ মন্ত্রিসভার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা নং-২৩২-২৩৩)

"মজলুম নেতাঁর উপযুক্ত পার্শ্বচর ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক তরুণ নেতা সামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটকাবস্থায় জনাব সামসুল হক মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলেন ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ অবস্থায় কারামুক্তি লাভ করেন। জনাব সামসুল হক ১৯৫২ সালে কারান্তরাল থাকা বিধায় যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। কারামুক্তির পরও মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়া না

www.pathagar.com

আসায় ১৯৫৩ সালে ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ অধিবেশনে সভাপতি মাওলানা ভাসানীর অনুরোধ ক্রমে জনাব সামসুল হকের স্থলে শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা নং-২৫২)

উল্লেখ্য, জনাব সামসুল হকের স্ত্রী ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা আধুনিক মহিলা। তাঁর নাম অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুন। জনাব সামসুল হক যখন ১৯৫২ সালে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর কয়েকজন সাথী ষড়যন্ত্র করে পরিকল্পিতভাবে অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুন ও জনাব সামসুল হকের মধ্যে পারিবারিক কলহ ও বিভেদ সৃষ্টি করেন। যার ফলে জেলে আটক জনাব সামসুল হক মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। কিছুদিন পর তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং কঠিন মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এই সুযোগে আওয়ামী মুসলিমলীগের যুগ্মসম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান কৌশলে দলের সাধারণ সম্পাদকের পদ দখল করেন।

"পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর সর্বজনাব আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ ও খয়রাত হোসেন সংগঠনের সহ-সভাপতির পদ হইতে পদত্যাগ করিলেও মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদকের পদ হইতে ইস্তফা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।"

"যেহেতু অন্যায়ের মানসিকতা লইয়াই মন্ত্রিত্বের গদীতে আসীন হইয়াছিলেন সেহেতু শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কর্মীদিগকে অন্যায় প্রশ্রয় দিতে সামান্যতম বিবেক দংশনবোধ করিতেন না। নেতা কর্তৃক অন্যায়ের আশ্রয় দানে সচ্চরিত্র আদর্শবাদী একনিষ্ঠ কর্মীকুল কালের বির্বতনে হতাশা ও নিরাশার শিকারে পরিণত হন। শুধু তাই নয়-পরিশেষে তাহারা ঘুণে ধরা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্কার ও ব্যবস্থা প্রবর্তনের দৃঢ় সংকল্প পরিহার করিতেও বাধ্য হন। এভাবেই নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক শক্তি হারাইয়া সরল প্রাণ কর্মীদের সামগ্রিক অবস্থার বিপাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে হয় এবং অনেক কর্মী লোভ লালসার বশবর্তী হইয়া সরকারি আনুকূল্যে সহজ পথে অর্থোপার্জনে আত্মনিয়োগ করেন। দুর্নীতির বিষ ফণার ছোবলে সমগ্র সমাজদেহ বিষে জর্জরিত হইয়া উঠে। অথচ দুর্নীতি দমনমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই হুঙ্কার ছাড়িতেন যে, তিন পয়সার পোস্টকার্ডে লিখিয়া জানাইলেই তিনি দুর্নীতিবাজদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। হুঙ্কারের তুবড়িতে দুর্নীতি কতটুকু মূলোৎপাটিত হইয়াছে, দেশবাসী উত্তমভাবেই তাহা অবগত আছেন। ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় তাঁহার তেতালা বাড়িটি দুর্নীতি দমন প্রচেষ্টার এক দুর্বোধ্য ও বিচিত্র নজীর।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা নং-২৫৬)

"১৯৫৫ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত গঠনতন্ত্রের ৬৬ধারা মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রী পদ গ্রহণ করায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করা তাহার জন্য অবশ্য পালনীয় ছিল। উক্ত ধারায় সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, অন্যথায় একমাস পরে উক্ত কর্মকর্তার পদ শূন্য বলিয়া

www.pathagar.com

অবশ্য গণ্য হইবে। উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয়ই প্রধানত, সংগঠনের নিষ্ঠাবান কর্মীদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে গদীতে আসীন হইবার পর হইতেই ক্ষমতাঁর উচ্ছিষ্ট ভোগের দুর্দমনীয় লালসায় মন্ত্রিবর্গ স্বল্প সময়ের মধ্যে সংগঠনের গঠনতন্ত্র, সিদ্ধান্ত, নীতি ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়া আওয়ামী লীগকে স্বেচ্ছাচারী মন্ত্রিচক্রের লেজুড়ে পরিণত করিবার যে কুটিল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে কর্মীসমাজ উদ্বিগ্ন না হইয়া পারে নি।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা নং-২৬৫)

'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত প্রশ্নেও শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ সম্পাদক পদত্যাগে অনীহা সমগ্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সক্রিয় করিয়া তুলে। জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল ও আদর্শনিষ্ঠ কর্মীর বিপুলাংশ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সদস্য। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির খুঁটার ভূমিকায় অবতীর্ণ শেখ মুজিবুর রহমানের ক্রোধ স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের উপরে নিপতিত হয়। তাই তিনি প্রস্তাব আনয়ন করিলেন যে, কোন সদস্য আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের যুগপৎ সদস্য থাকিতে পারিবে না। মাওলানা ভাসানী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় কয়েক ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন বটে; তবে প্রস্তাব গ্রহণ হইতে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী সমর্থকদের বিরত করিতে পারেন নাই।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ২৬৭)

"১৮ই মার্চ আমি কাগমারীতে (সন্তোষ) সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করি। মাওলানা ভাসানী সংগঠনের সভাপতি পদ হইতে ইস্তফা দানের সিদ্ধান্ত আমাকে জানান। তিনি কোন যুক্তিই শ্রবণ করিতে রাজি হন নি। বরং তাঁহার পদত্যাগ পত্রটি "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার সম্পাদক জনাব জহুর হোসেন চৌধুরীর নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দেন। পদত্যাগ পত্রটি নিম্নরূপ :

জনাব পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী সাহেব, ঢাকা

আরজ এই যে, আমার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতেছে এবং কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবার খুলিতে হইবে, তদুপরি আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার লীডার সদস্যদের নিকট আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ২১ দফা ওয়াদা অনুযায়ী জুয়া, ঘোড়দৌড়,বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি হারামি কাজ বন্ধ করিতে সামাজিক ও ধর্মীয় বিবাহ বন্ধনের উপর ট্যাক্স ধার্য করা জনমত অনুযায়ী বাতিল করিতে আবেদন জানাইয়া ব্যর্থ হইয়াছি। ভয়াবহ খাদ্য সংকটেরও কোন প্রতিকার দেখিতেছি না। ২১ দফা দাবির অন্যান্য দফা যাহাতে অর্থব্যয় খুবই কম হইবে তাহাও কার্যকরি করিবার নমুনা না দেখিয়া আমি আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ হইতে পদত্যাগ করিলাম। আমার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি

স্বাঃ মো. আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

কাগমারী ১৮/৩/৫৭ "

(জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫,অলি আহাদ, পৃষ্টা নং-২৭৩-৭৪)

www.pathagar.com

"পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ক্রমশ মন্ত্রী মহলের কুক্ষিগত হয়। মাওলানা ভাসানী উপায়ন্তর না দেখিয়া ১৮ ও ১৯শে মে বগুড়ায় কৃষক সম্মেলন আহবান করেন এবং খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১লা জুন হইতে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ২৭৮)

'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ কাউন্সিলের কাগমারী (সন্তোষ) অধিবেশনে পররাষ্ট্র নীতিকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতি আদব, আত্মগোপনকারী ও নিষিদ্ধ কম্যুনিস্ট পার্টির গোপন (আন্ডার গ্রাউন্ড) নেতৃত্ব কমরেড মনিসিংহ , কমরেড খোকা রায়, কমরেড আব্দুস সালাম ও অন্যান্যকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলে। দীর্ঘকালের সংগ্রামী রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রসূত প্রজ্ঞা ও ব্যাপক থিওরিটিক্যাল জ্ঞান বলে তাঁহারা সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিণতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁহারা তখনকার তড়িৎ গতিতে প্রবাহিত ঘটনা স্রোতের উপর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। বোধহয় দিব্য চক্ষে অবলোকন করিতেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে দ্বিখন্ডিত করিয়া সংগ্রামী, সমাজ সচেতন, দেশপ্রেমিক সৎ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি অংশকে সংগঠন হইতে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে এবং সেমতে সামন্তবাদ, উঠতি পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অনুচর শ্রেণীর সুপরিকল্পিত সংকল্প ও চক্রান্ত বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে সুচারুভাবে সমাধা হইতে যাইতেছে। অর্থাৎ গণমুখী আওয়ামী লীগ গণ বিরোধি ক্যাম্পে পরিণত হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই কমিউনিস্ট পার্টির আন্ডার গ্রাউন্ড নেতৃত্ব পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিধাবিভক্তি রোধ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। কমিউনিস্ট পার্টির (ওভার গ্রাউন্ড) সহযোগী নেতা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত কোন্দল ও প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টা, ঘৃণ্যও পরোক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নানা সন্দেহজনক উচ্চমহল হইতে আনুকূল্য লাভের লোভে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। পররাষ্ট্র নীতিকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমশ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে মতভেদ চরম আকার ধারণ করে এবং সর্বশেষ মতভেদ পথভেদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ পার্টির এই মতভেদও পথভেদরই ফসল।"

"দৈনিক ইত্তেফাক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আবির্ভাবকে বিষ নজরে দেখিতে লাগিল। গায়ের জ্বালা মিটাইবার প্রয়াসে মালিক সম্পাদক জনগণের ভারত বিরোধি মনোভাবের সুযোগ নিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ইংরেজি সংক্ষিপ্ত নাম এন.এ.পি. কে বিকৃত করিয়া Nehru Aided Party অর্থাৎ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সাহায্য প্রাপ্ত পার্টি সংক্ষেপে ন্যাপ আখ্যা দিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে জনগণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ২৮৪-৮৫)

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির আত্মপ্রকাশের পর ১৯৫৭ সালের ২৫জুলাই ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর

www.pathagar.com

সভাপতিত্বে উক্ত জনসভায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। সভা চলাকালীন অবস্থায় হঠাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গুন্ডাবাহিনী আক্রমণ চালায় , ফলে জনসভা বানচাল হয়ে যায়।

"সীমান্তে অস্বাভাবিক পাচারের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনেই সীমান্তে পাচার বন্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োজিত করা হয়। এই ব্যবস্থা "ক্লোজ ডোর অপারেশন " (Operation Close Door) নামে পরিচিত লাভ করে। পাচার বন্ধ করার মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই সরকার কতিপয় আওয়ামী লীগ কর্মীকে সীমান্ত কর্মকর্তা পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু ফল হয় উল্টা। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ বর্ডার অফিসার স্বীয় দায়িত্বজ্ঞান হারাইয়া লোভ লালসার শিকারে পরিণত হয়। ভূত তাড়াইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত সরিষাই ভূতের আস্তানায় পরিণত হওয়ার বহুল প্রচলিত গ্রাম্য প্রবচনটিই আওয়ামী লীগ কর্মীদের ব্যাপারে নির্মম সত্যের রূপ নেয়।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ২৯০)

"পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগে নেতৃত্বের প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে বাড়ি-গাড়ি সহ মোটা ভাতা নির্দিষ্ট করিয়া পাকিস্তান টি (Tea) বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন; এমনকি তিনি শেখ সাহেবকে দামী "লিমুজিন" গাড়িও উপহার দেন। শুধু তাই নয়, তাঁহাকে শান্ত করিবার মানসে বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবেও প্রেরণ করেন। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া শেখ সাহেবকে উক্ত মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানাইলে শেখ সাহেব জাতীয় পরিষদ সদস্যরূপে রাশিয়া মুখে রওয়ানা হন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হইতে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের পদত্যাগের পর পরই পাকিস্তান সরকার শেখ সাহেবকে জেনেভা হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান করেন।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ২৯১)

"মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-মেম্বার-নেতা-উপনেতাঁরা দেশসেবার বদৌলতে ঢাকায় স্ব স্ব বাড়িঘর নির্মাণে অপূর্ব দক্ষতাঁর পরিচয় দেন। ধানমন্ডি এলাকায় আওয়ামী লীগ সদস্যদের নির্মিত ঘরবাড়িসমূহ "আওয়ামী লীগ কলোনী" আখ্যাপায়। ইহা আওয়ামী লীগ সরকারের অকৃত্রিম জনসেবার অতুলনীয় স্বাক্ষর বটে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নির্লজ্জ আচরণ সেক্রেটারীয়েটের মহাজন আমলাদিগকে তাঁহাদের অবাঞ্ছিত পদাংক অনুসরণ করিতে উৎসাহিত করে এবং আমলা গোষ্ঠী সংখ্যাধিক্য বিধায় লুটপাটের সিংহভাগ তাহারাই পায়।" জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা নং-৩০০)

"সাবেক দুর্নীতি দমন মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৮ সালের East Pakistan Act L XX II/58 HI VA J Act II/47-এর ৫(২) ইত্যাদি দুর্নীতি দমন ধারা বলে ১২ অক্টোবর (১৯৫৮) গ্রেপ্তার হন এবং ২০ অক্টোবর কারান্তরালে অবস্থানকালেই বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্সের বলে তাঁহাকে নিরাপত্তা বন্দী করা হয়।"

www.pathagar.com

"ঢাকা জেলা ও সেসন জজ (পদাধিকার বলে সিনিয়র স্পেশাল জজ) এ, মওদুদ সাহেব ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৬০) তাঁহার দেয় রায়ে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দুই বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০০টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস অতিরিক্ত কারাদন্ড প্রদান করেন।" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা ৩০৩-৩০৪)

সোহরাওয়ার্দী কত সম্পদের মালিক ছিলেন?

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতাঁর এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি কলকাতাঁর মেয়র এবং অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে তাঁর উপর ৬৭ লক্ষ টাকার আয়কর (Income tax) ধার্য করেছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় সোহরাওয়ার্দী সাহেব কত সম্পদের মালিক ছিলেন।

ইত্তেফাকের মালিকানা কিভাবে মানিক মিয়ার কুক্ষিগত হল?

১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকার রোজ গার্ডেন হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। দলীয় মুখপত্রের প্রয়োজনে আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সরকারি অনুমতি নিয়ে 'সাপ্তাহিক ইত্তেফাক' প্রকাশ করেন। পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলেন দলীয় কোষাধ্যক্ষ জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান। পত্রিকা প্রকাশের কিছু দিন পর কলকাতা থেকে আসেন দৈনিক ইত্তেহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ সাংবাদিক জনাব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। তিনি আওয়ামী লীগের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। তাঁকে ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট ইত্তেফাকের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। সম্পাদনার ব্যাপারে তাকে সর্বময় ক্ষমতা লিখিতভাবে প্রদান করা হয়। ১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর সাপ্তাহিক ইত্তেফাক দৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার পৃষ্ঠায় লেখা থাকত :

প্রতিষ্ঠাতা : মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

প্রিন্টার ও পাবলিশার : ইয়ার মোহাম্মদ খান।

সম্পাদক : তফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞা।

১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে দৈনিক ইত্তেফাক যুক্তফ্রন্টের পক্ষে বিরাট ভূমিকা পালন করে। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে Landslide victory অর্জন করে। নির্বাচনের পর ইত্তেফাকের মালিকানা কিভাবে মানিক মিয়ার কুক্ষিগত হল এ ব্যাপারে কিছু তথ্য জনাব অলি আহাদের বই থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

"নির্বাচনের অব্যবহিত পরই বোধ হয় কোন কোন অবাঞ্ছিত মহলের প্ররোচনায় দৈনিক ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু হয়। জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান এই অপতৎপরতাঁর প্রতি সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাওলানা ভাসানীর সংগ্রামী বিবৃতি ও বক্তৃতা যুক্তফ্রন্টের অনেকেরই চক্ষুশূল ছিল। তাই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্ররোচনায় পূর্ব পাকিস্তানের তদানীন্তন উজিরে

www.pathagar.com

আলা (এপ্রিল-মে ১৯৫৪) শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নির্দেশে ঢাকা জেলার তদানীন্তন প্রশাসক সিলেট নিবাসী ইয়াহিয়া চৌধুরী ১৯৫৪ সালের ১ মে গভীর রাত্রে অন্যায়ভাবে ইয়ার মোহাম্মদ খানের অজ্ঞাতসারেই সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেনকে ইত্তেফাকের প্রিন্টার ও পাবলিশার করার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতেই 'দৈনিক ইত্তেফাকের' শিরোনামায় মাওলানা ভাসানী আর 'প্রতিষ্ঠাতা' রূপে নয় বরং 'পৃষ্ঠপোষক' হিসেবে স্থান পাইতে থাকেন। উল্লেখ্য যে বৃহত্তর স্বার্থেই মাওলানা ভাসানী ও জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান ইত্তেফাকের উপর নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। এদিকে কালের করালগ্রাসে দৈনিক ইত্তেফাকের শিরোনাম হইতে পৃষ্ঠপোষক মাওলানা ভাসানীর নাম চিরতরে উধাও বা তিরোহিত হইয়া গেল। মাওলানা ভাসানীর মত জনপ্রিয় দেশবরেণ্য নেতাকেই যখন নোংরা রাজনীতির চোরাগোপ্তা মারের নিকট হার মানিতে হয় তখন দেশের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যারা ইত্তেফাকের 'লুব্ধকের ভাষায়' আকালু শেখ তাঁরা কোন ছার!" (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫, অলি আহাদ, পৃষ্ঠা নং-১১২-১১৩)

আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া এবং 'ধর্মনিরপেক্ষবাদ' আমদানী করার রহস্য

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মুসলিম লীগ নবাব, খাজা, জমিদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে গেছে, অতএব জনগণের মুসলিম লীগ দরকার-এই ইস্যু উত্থাপন করে ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকার রোজ গার্ডেন হলে আওয়ামী মুসলীগ লীগ অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী হলেন নব গঠিত দলের সভাপতি। মুসলিম লীগ দুই জাতি তত্ত্বের সমর্থক ছিল। এ দলের আন্দোলনের ফলে ভারত দ্বিখন্ডিত হয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলিম লীগের দাবি ছিল যেহেতু মুসলিম জনগোষ্ঠী একটি আলাদা জাতি, সুতরাং মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্র হবে আলাদা। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাও হবে আলাদা। জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তানের অর্থ -"লা ইলাহা ইল্লালাহ"। "আল কুরআনই হবে পাকিস্তানের সংবিধান।" ইসলামের সোনালি অতীত অনুসরণ করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে- এটাই ছিল সবার কামনা।

জনগণের মুসলিম লীগ অর্থাৎ আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হল। মুসলিম লীগের আদর্শের পরিবর্তনের কথা মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান কিংবা শেখ মুজিবুর রহমান কেউই বললেন না। ফলে মুসলিম লীগ সমর্থক সাধারণ জনগণ নবগঠিত জনগণের মুসলিম লীগকে সমর্থন দিল। দল যুক্তফ্রন্টের সাথে শরিক হয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে জয়লাভ করল। এ নির্বাচনে শেরে বাংলা এ কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৮, আর আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্য সংখ্য ছিল ১৪৩. স্বার্থের দ্বন্দ্বে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে আলাদা হয়ে যায়। আলাদা হয়ে যাবার পর সরকার গঠন করে শেরে বাংলা নিয়ন্ত্রিত যুক্তফ্রন্ট। তাদেরকে সমর্থন করে

www.pathagar.com

৭২জন অমুসলিম নির্বাচিত সদস্য। উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে। অমুসলিম সদস্যগণ সরকার গঠনে আওয়ামী মুসলিম লীগকে সমর্থন না দিয়ে শেরে বাংলা ও তাঁর দলকে সমর্থন দিল, তাঁর কারণ-শেরে বাংলা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ছিলেন। যদিও তিনি ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপনকারী ছিলেন এবং তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ দলীয় প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য জিন্নাহ তাকে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। ভারতের বড়লাট ২য় মহাযুদ্ধের সময় WAR COUNCIL গঠন করেন । এ WAR COUNCIL এ মুসলিম লীগের কাউকে যোগদান করতে জিন্নাহ সাহেব নিষেধ করেন। শেরে বাংলা ছিলেন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী । তিনি নিষেধ অমান্য করে WAR COUNCIL এ যোগদান করেন। ফলে মুসলিম লীগ তাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য বহিষ্কার করে। বহিষ্কৃত শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির সাথে কোয়ালিশন করে শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ ব্যাক গ্রাউন্ডের কারণে হিন্দুরা তাঁকে তাদের স্বার্থের সহায়ক মনে করে ।

আওয়ামী মুসলিম লীগ অমুসলিম সদস্যদের সমর্থন না পাওয়ায় ক্ষমতায় যেতে পারল না। তাঁরা উপলব্ধি করল অমুসলিমদের সমর্থন পেতে হলে তাদের আদর্শ পরিবর্তন করতে হবে। আদর্শ এখন তাদের কাছে গৌণ হয়ে গেল। মুখ্য হল ক্ষমতাঁর সিঁড়ি আরোহণ। তাই তাঁরা ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে কাউন্সিল ডেকে দলীয় নাম "আওয়ামী মুসলিম লীগ" থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দিয়ে "আওয়ামী লীগ" হল। তাঁরা নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক ভাবল এবং অমুসলমানদের সমর্থন পাওয়ার উপযুক্ত মনে করল। আফসোসের বিষয় এরপরও আইনসভার অমুসলিম সদস্যরা আওয়ামী লীগকে সমর্থন করল না। তাঁরা দাবি করল আওয়ামী লীগের দলীয় আদর্শ হতে দুই জাতিতত্ত্ব বাদ দিতে হবে, তাঁর স্থলে ভারতীয় সংবিধান ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ 'ধর্ম নিরপেক্ষবাদ'কে দলীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। গরজ বড় বালাই, ক্ষমতাঁর মোহ যাদেরকে পেয়ে বসেছে তাঁরা আদর্শ পরিবর্তন করতে বিচলিত হল না। অমুসলিমদের সমর্থন লাভই তাদের কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা চার মাসের মধ্যে ১৯৫৬ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি টাংগাইল জেলার কাগমারীতে (বর্তমান সন্তোষ) সম্মেলন ডেকে দলের আদর্শ পরিবর্তন করে 'ধর্ম নিরপেক্ষবাদকে' আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করল। সম্মেলনের পরদিন একই স্থানে আফ্রো-এশিয়ো সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহবান করা হল। সম্মেলনে আসলেন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী প্রফেসার হুমায়ুন কবীর, শ্রী তাঁরাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, শ্রী প্রবোধচন্দ্র স্যান্যাল, শ্রীমতি রাধারানী দেবী, কাজী আব্দুল ওয়াদুদ, মিসেস সুফিয়া ওয়াদিয়া প্রমুখ। সম্মেলন উপলক্ষে কায়েদে আযম, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাস বসু, হাকিম আজমল খান, আব্রাহাম লিংকন, স্যার সৈয়দ আহমদ, সেক্সপিয়র, লেনিন, মাওসেতুং প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিদের নামে ঢাকা থেকে কাগমারী পর্যন্ত তোঁরণ নির্মান

www.pathagar.com

করা হল। ভারত থেকে প্রচুর নর্তকী ও গায়িকা আনা হল। এভাবে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে আগতদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হল।

এভাবেই আওয়ামী মুসলিম লীগ তাদের নাম থেকে প্রথমে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিল। তাঁর পর 'ধর্ম নিরপেক্ষবাদ'কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করল। অতঃপর তাঁরা অমুসলিম সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে সরকার গঠন করতে সক্ষম হল। আসলে আওয়ামী লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া এবং মূল আদর্শ থেকে ইউটার্ন (Uturn) করে ধর্ম নিরপেক্ষবাদ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা সবই ছিল বৃহৎ প্রতিবেশীর গবেষণা ও বিশ্লেষণ (Research and Analysis সংক্ষেপে RA) এর ফসল। বাংলাদেশের স্বাধীনতাঁর পর ঐ শক্তিই আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে জাসদ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল) সৃষ্টি করে।

মাওলানা মওদুদীর দ্বিতীয় সিলেট সফর

মাওলানা মওদুদীর ২য় সিলেট সফর অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। এ সফরে তিনি জনসভায় বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন বইতে নিজ হাতে মন্তব্য লিখেন। তিনি তাঁর লিখিত এক সেট বই সংসদে উপহার দেবার জন্য মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবকে নির্দেশ প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে পরিদর্শন বইতে মাওলানা মওদুদীর লিখিত মন্তব্যের ফটো কপি নিচে প্রদান করা হল:

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী'র মন্তব্য

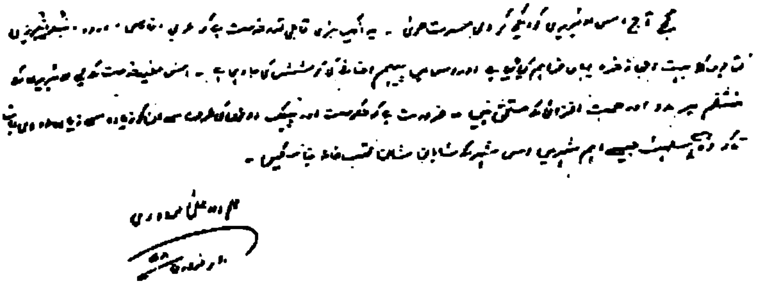

আমি আজ এই লাইব্রেরী দেখে আনন্দিত হলাম, যেখানে বাংলা, আরবী, উর্দু, ইংরেজী, ফার্সী বই-এর সমাহার, যা জাতির জন্য একটি বিরাট উপকার। এতে সর্বদাই উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই মহান দায়িত্ব পালনার্থে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য। সরকার ও জনগন তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত, যাতে এটা সিলেট শহরের উল্লেখযোগ্য লাইব্রেরী হতে পারে।

আবুল আ'লা মওদূদী
১০-০২-১৯৫৮ইং

মাওলানা ২য় বার পূর্ব পাকিস্তানে সফরে আসেন ১৯৫৮ সালের ৩০ জানুয়ারি। এবার তিনি সারা প্রদেশ একটানা ৪৫দিন সফর করেন। এ সফরে জনসভা ও সুধী সমাবেশের মাধ্যমে তিনি পৃথক নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন দেশের ৮০ থেকে ৯০ ভাগ লোক পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে। আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টি বলে বেড়াচ্ছে যে, দেশের বেশির ভাগ লোক যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির পক্ষে। তিনি

www.pathagar.com

প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাদের দাবি যদি সত্যি হয় তবে তাঁরা নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নে গণভোট (রেফারেন্ডাম) দিতে ভয় পাচ্ছে কেন? তিনি নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নে গণভোট দাবি করেন। নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্নে কি সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং কিভাবে হয়েছিল সে কথা পরে বলা হবে। তাঁর আগে এ সংক্রান্ত কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে:

অখণ্ড ভারতের প্রায় সর্বত্র মুসলমানদের শাসন চলছিল। ইংরেজরা এ উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্কালে মুসলমানদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। তাঁরা মুসলমানদের সাথে শত্রুসুলভ আচরণ করে। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে মুসলমানদের যে করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর বর্ণনা ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার লিখিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' বইতে সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

হান্টার উল্লেখ করেন "১৭৫৭ সালে ইংরেজদের হাতে মুসলমানরা শুধু তাদের রাজ্যই হারাল না, হারাল তাদের সর্বস্ব। একদিন যাদের দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিল, সেই মুসলমানরা কাঠুরিয়া ও ভিস্তিওয়ালায় পরিণত হল।"

মুসলমানদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সর্বপ্রথম সামষ্টিক প্রচেষ্টা হয় ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল। ঐদিন নওয়াব আব্দুল লতিফ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন-'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি'। তাঁরপর ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠা করেন মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'। উক্ত সংগঠন বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ইংরেজ সরকারের সাথে দেন-দরবার করে। ফলে ১৮৮২ সালে প্রথম বারের মত মুসলমানরা পৃথক পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে মিউনিসিপাল কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বের অধিকার পায়। এটাই ছিল মুসলিম জাতিস্বতন্ত্রের প্রথম রাজনৈতিক স্বীকৃতি। ১৮৮৫ সালে গঠিত হয় হিন্দুদের রাজনৈতিক সংগঠন 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। কংগ্রেস মিউনিসিপাল কাউন্সিল নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন বিরোধিতা করে এবং যুক্ত নির্বাচন দাবি করে। ইংরেজ সরকার হিন্দুদের মন রক্ষার্থে ১৮৯২ সালে 'ইন্ডিয়া কাউন্সিল এক্ট' পাস করে এবং পৃথক নির্বাচন বাতিল করে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই আইন পাস করার ফলে মুসলমানরা হোঁচট খায়। কিছুদিন পর অনুষ্ঠিত হয় আরো একটি ঘটনা। ইংরেজ বড়লাট লর্ড কার্জন খালেছ প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৯০৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বিরাট আকারের বঙ্গ প্রদেশ ভঙ্গ করে 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম' নামে দুটি নতুন প্রদেশ গঠন করেন। ঢাকা হয় পূর্ব বঙ্গের রাজধানী এবং নতুন প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। যেহেতু পূর্ব বঙ্গে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই বঙ্গভঙ্গকে পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজ স্বাগত জানায়। অন্যদিকে 'বঙ্গমাতাঁর অঙ্গচ্ছেদের' অজুহাতে শুধু বাংলার নয় সমগ্র ভারতে হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে আরম্ভ করে রাজনৈতিক আন্দোলন। বঙ্গ পুনঃ একত্রিত করণের উদ্দেশ্যে বাংলায় গড়ে উঠে সন্ত্রাসী সংগঠন।

www.pathagar.com

মুসলমানরা হিন্দুদের কার্যকলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতিনিধি সম্মেলন আহবান করেন। ২৭ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে সম্মেলন আরম্ভ হয়। সম্মেলনে ভারতের প্রায় সব এলাকা থেকে হাজার খানেক প্রতিনিধি আসেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: নবাব ভিখারুল মুলক, পাতিয়ানার খলিফা মোহাম্মদ হোসেন, হাকিম আজমল খান, লক্ষ্ণৌর রাজা নওশাত আলী খান, খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, মাওলানা শওকত আলী, ভূপালের মৌলভী নিযাম উদ্দীন, নবাব মহসিনুল মুলক, ডা.জিয়া উদ্দীন আহমদ, অমৃতসরের রাজা মুহাম্মদ ইউসুফ শাহ। ২৭ থেকে ৩০ ডসেম্বর সকাল পর্যন্ত শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, উপস্থিত প্রতিনিধিগণ মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে অধিবেশন শেষে এক বিশেষ সম্মেলনে মিলিত হবেন। শাহবাগের নবাব সলিমুল্লাহর এ বাগানেই বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও র্থ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হয়। বছর আগা খান ও নবাব মুহসিনুল মুলকের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বড়লাট মিন্টো াথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে তাঁরা অন্যান্য দাবি দাওয়ার মধ্যে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করেন।

- ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টোর ইনের আওতায় প্রাদেশিক পরিষদে মুসলমান দের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। কংগ্রেস সাথে সাথে ১৯০৯ সালে পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাব পাস করে। প্রস্তাবে মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাটের ভারতীয় প্রজাদের মুসলিম অমুসলিম সংজ্ঞায় বিভক্ত করাকে অন্যায়, বিদ্বেষ প্রসূত ও অপমানকর বলে অভিহিত করা হয়।
- ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আইনে ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়।
- ১৯২৮ সালে ভারতের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বেসরকারি কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন মতিলাল নেহরু। কমিশনের পক্ষ থেকে এক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এটি 'নেহরু রিপোর্ট' নামে পরিচিত। এ রিপোর্টে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিলের সুপারিশ করা হয়।
- ১৯৩২ সালের ১৬ই আগস্ট ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়। এ রোয়েদাদে মুসলমান শিখ ও অস্পৃশ্য হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে গান্ধী খুবই ক্ষেপে যান। প্রতিবাদে তিনি আমরণ অনশন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত সরকার অস্পৃশ্য হিন্দুদের গান্ধীর ভাষায় 'হরিজনদের' জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করে। গান্ধী অনশন ভঙ্গ করেন।
- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়।
- ১৯৪৫ ৪৬ সালে সমগ্র ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

- ভারত বিভাগের পর ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র পাস হয়। তবে নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়টি অমীমাংসিত রাখা হয়। কারণ পশ্চিম পাকিস্তারে গণপরিষদের সদস্যগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে রায় দেন। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ সদস্য যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ফলে শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ বিষয়টি মুলতবী রাখতে বাধ্য হন। গণ পরিষদের দায়িত্ব শেষে এর সদস্যগণ কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য হিসেবে এ বিষয়ে ফায়সালা করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়।

এরপর এ বিষয়ে কি হল অধ্যাপক গোলাম আযমের কলম থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"গভর্নর জেনারেল মির্জা, পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নওয়াব গুরমানী ও কংগ্রেস নেতা প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ডা.খান সাহেব মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি শাসনতন্ত্রের অর্ন্তভুক্ত করতে হলে সোহরাওয়ার্দীর মতো লোকের প্রধানমন্ত্রী হওয়া প্রয়োজন। ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি কেন্দ্রীয় আইনসভায় (ন্যাশনাল এসেম্বলী) পাস করিয়ে নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান ত্বরান্বিত করার টার্গেট নিয়ে কর্মতৎপর হন।

ন্যাশনাল এসেম্বলীর অধিবেশন পশ্চিম পাকিস্তানে বসলে ওখানকার পরিবেশে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা পাস করানো অসম্ভব বিবেচনা করেই গভর্নর জেনারেল অনুমতি নিয়ে তিনি ঢাকায় অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন।"

"জাতীয় সংসদের ঐ অধিবেশনের কথা স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। যে সব দল যুক্ত নির্বাচন বিরোধি, তাঁরা পল্টন ময়দানে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে বিরাট জনসভার আয়োজন করে। জাতীয় সংসদের বেশ কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় পৃথক নির্বাচনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের মধ্যে নেযামে ইসলামী পার্টি ছাড়া আর কোন দল পৃথক নির্বাচনের পক্ষে সোচ্চার ছিল বলে মনে পড়ে না । জনসভা শেষে পল্টন ময়দান থেকে বিরাট মিছিল সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করার জন্য বের হয়। মিছিল পল্টন ময়দান এলাকায় থাকাকালেই যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে প্রাদেশিক সরকারের লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডারা মিছিলের উপর দূর থেকে বৃষ্টির মতো ভাঙা ইট ও পাথরের ঢিল ছুঁড়তে লাগল। পুলিশ সঙ্গত কারণেই তামাশা দেখার ভূমিকা পালন করল। আমার মাথায়ও ঢিল পড়ল। রক্তে জামা ভিজে গেল। খালি হাতে মিছিলকারীরা কিছুক্ষণ ঢিল খেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। মুসলিম লীগ নেতা আবুল কাসেম ও শাহ আজিজুর রহমানকে আওয়ামী লীগ গুন্ডারা ধরে নিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করল, আর পুলিশ তাদেরকে হাসপাতালে পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করল। পুলিশ তাঁর উপর নৃশংস হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সামান্য কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করল না।

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদে গভীর রাত পর্যন্ত প্রচন্ড বিতর্ক চললো। পূর্ব-পাকিস্তানি সদস্যদের কয়েকজন ছাড়া সবাই এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের একাংশ মিলে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন যোগাড় করে প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী গভর্নর জেনারেলের দেওয়া পবিত্র দায়িত্ব যোগ্যতাঁর সাথে পালন করলেন।" (জীবনে যা দেখলাম-দ্বিতীয় খণ্ড, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠা নং-১৬৩-১৬৪)

"১৯৪৫ সালে অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন ও ১৯৪৬ সালে সারা ভারতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচন হয়। কেন্দ্রে মুসলমানদের ৩০টি আসনের সব কয়টিই মুসলিম লীগ দলীয় প্রার্থীরা দখল করে। কংগ্রেস হিন্দু মুসলিম এক জাতি দাবি করে ঐ নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করায়। কিন্তু মুসলিম ভোটাররা পাকিস্তান দাবির পক্ষে মুসলিম লীগ প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী করে। প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ শতকরা ৮০ ভাগ মুসলিম আসন দখল করে। নির্বাচনের এ ফলাফল ব্রিটিশ সরকার ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে পাকিস্তান দাবি মেনে নিতে বাধ্য করে।

কংগ্রেস ও হিন্দু দলগুলো কেন যুক্ত নির্বাচন দাবি করল ?

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সংখ্যালঘুরাই পৃথক নির্বাচন দাবি করে থাকে, যাতে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। এ কারণেই অবিভক্ত ভারতে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে পৃথক নির্বাচন দাবি করে তা আদায় করেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যুক্ত নির্বাচন কেন দাবি করলো? তাঁরাই আওয়ামী লীগকে যুক্ত নির্বাচন দাবি মেনে নিতে বাধ্য করলো।

১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস ২৫টি, তফসিলী ফেডারেশন ২৭টি এবং সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট ১৩টি আসন পেয়ে আইনসভার বিরাট ক্ষমতাঁর অধিকারী হয়ে গেল। যুক্তফ্রন্ট বিযুক্ত হয়ে যখন ক্ষমতাঁর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো, তখন 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' হিন্দু সদস্যদের হাতে চলে গেলো। তাঁরা যাদেরকে ক্ষমতায় বসাতে চায় তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ ক্ষমতায় যেতে পারে না। ১৯৫৪ সালে তাঁরা শেরে বাংলার নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসাল।

আওয়ামী লীগ যখন 'মুসলিম' পরিচিতি বর্জন করে এবং যুক্ত নির্বাচন ও ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ গ্রহণ করে হিন্দুদের আস্থা অর্জন করল, তখন ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বহাল থাকলে এখনো আইনসভায় সংখ্যালঘুদের হাতে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' স্থায়ীভাবেই থাকত। তা সত্ত্বেও তাঁরা যুক্ত নির্বাচন দাবি করল কেন?

বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থাই রয়েছে। যদি পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকত তাহলে সংখ্যানুপাতে হিন্দুরা শতকরা ১২টি আসন পেত। ৩০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ৩৬টি আসন হিন্দুদের হাতে থাকত। ২০০১ সালের নির্বাচনে নগণ্য সংখ্যক হিন্দু সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। যুক্ত নির্বাচনের কারণেই তাদের এ দশা হয়েছে।

www.pathagar.com

পৃথক নির্বাচন না থাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যানুপাতে বর্তমান আইনসভায় নেই এর জন্য কারা দায়ী? হিন্দুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথক নির্বাচন প্রথা বাতিল করা হয় নি। বরং হিন্দু নেতৃত্বের দাবিতে যুক্ত নির্বাচন চালু হয়েছে। যে হিন্দু নেতাঁরা ১৯৫৫ সালে যুক্ত নির্বাচন দাবি করলেন, তাঁরা কি এর পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন? তাদের হাতে সংসদে ক্ষমতাঁর চাবিকাঠি ছিল। তাঁরা এতো বড় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন? কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার দত্ত ও ধীরেন্দ্র নাথ মুখার্জির মতো নেতাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাই। তাঁরা যে আদর্শে বিশ্বাস করতেন, সে আদর্শের স্বার্থে তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিসর্জন দিলেন। কংগ্রেসের আদর্শ ছিল ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও হিন্দু-মুসলিম অভিন্ন জাতীয়তাবাদ এবং অখণ্ড ভারত। যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ তাদের ভারতমাতাকে বিভক্ত করেছে সে পৃথক জাতীয়তা বোধে মুসলমানদের মন থেকে উৎখাত করতে পারলে আবার এই ভারতের মহাসাগর তীরে হিন্দু-মুসলিম এক জাতিতে পরিণত হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ যদি বাঙালি মুসলমানদের আদর্শ বলে গণ্য হয়, তাহলে ইসলামী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরাই রুখে দাঁড়াবে।

কংগ্রেস নেতাঁরা অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। তাঁরা আইনসভায় যে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' ভোগ করছিলেন তা মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার কোন সুযোগ সৃষ্টি করে নি। মুসলমান সদস্যরা দলাদলি করলে ঐ ক্ষমতাটুকু ব্যবহার করে এক দলের বদলে অন্য দলকে ক্ষমতায় আনা যায় বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হাতেই থেকে যায়। তাই তাঁরা ঐ 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার' টুকু আইনসভা থেকে সরিয়ে ইলেকটোরেটে (ভোটের ময়দানে) নিতে চেয়েছেন। তাঁরা নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যালেন্স অব পাওয়ার ব্যবহার করে মুসলমান নামধারী এমন লোকদেরকে নির্বাচিত করার পরিকল্পনা নিলেন, যারা যোগ্যতাঁর সাথে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। হিন্দুদের মুখে ইসলামী শাসন ও ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে কিছুই বলা সম্ভব নয়। এ জাতীয় কথা বলার জন্য উপযোগী মুসলমান সদস্যদেরকে আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত করতে পারলে তাদের সব মহান উদ্দেশ্য সহজেই পূরণ হবে। ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠ আইনসভায় প্রয়োজন। এ বিরাট প্রয়োজন হিন্দুদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কিছুতেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই পরোক্ষভাবে মুসলমান নামধারী ইসলাম বিরোধি লোক নির্বাচিত করতে হবে। এর জন্য যুক্ত নির্বাচন অত্যাবশ্যক। মুসলমানদের ভোট মুসলমান প্রার্থীদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। হিন্দুরা যে 'মুসলমান'-কে সদস্য বানাতে চান তাকে হিন্দুদের সব ভোট একচেটিয়া দিলে মুসলমানদের একাংশের ভোটেই তাদের লোক পাস করতে সক্ষম হবে, এটাই ছিলো আসল উদ্দেশ্য।

কংগ্রেস নেতাঁরা যে মহৎ উদ্দেশ্যে যুক্ত নির্বাচন চেয়েছিলেন তাতে তাঁরা সফল হয়েছেন। তাদের আদর্শ বিজয়ী হয়েছে। এর জন্য তাঁরা বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

যুক্ত নিবাচন পদ্ধতি রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে

যুক্ত নির্বাচন চালু হওয়ার ফলে দেশের রাজনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্বাচনে হিন্দু ও মুসলিম ভোটারদেরকে একই সাথে ভোট দিতে হচ্ছে। তাই

www.pathagar.com

যে দলের প্রার্থীই হোক হিন্দুদের ভোট সবারই প্রয়োজন। মুসলমান প্রার্থীদেরকেও বাধ্য হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সমর্থন করতে হয়। মুসলিম জাতীয়তা, ইসলামী শাসন, আল্লাহর আইন ইত্যাদি কথা মুসলিম প্রার্থীরাও নির্বাচনের সময় বলতে সাহস করে না। বললে অবশ্যই হিন্দু ভোট হারাবে।

পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা থাকাকালে মুসলিম প্রার্থীরা নির্বাচনের সময় পাঞ্জাবী পায়জামা টুপি পরে মুসলিম ভোটারদের কাছে যেতে বাধ্য হত। নামাযের অভ্যাস না থাকলেও ময়দানে থাকাকালে নামায পড়তে বাধ্য হত। এমনকি কেউ ওযু ছাড়াই নামাযে দাঁড়িয়ে যেত বলে শুনেছি। মুসলমানদের ভোট পাওয়ার প্রয়োজনে ইসলামের জন্য জান দেবার ওয়াদাও করত। যুক্ত নির্বাচন এ পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।

যেসব রাজনৈতিক দল হিন্দু ভোট পাওয়ার আশা করে না তাঁরাও যুক্ত নির্বাচনের কারণে ইসলামের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখে না। ইসলামী মূল্যবোধ পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট মনে করে।'' (জীবনে যা দেখলাম-দ্বিতীয় খণ্ড, অধ্যাপক গোলাম আযম,পৃষ্ঠা নং:-১৬০-১৬২)

১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রের ইসলামী বৈশিষ্ট্য

মাওলানা মওদুদীর নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার নিমিত্তে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার দাবি উত্থাপন করে। এজন্য জনমত গঠনের সকল মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানের আমলা শাসকচক্র জামায়াত এবং মাওলানা মওদুদীর আন্দোলন সুনজরে দেখে নাই। ফলে জামায়াত নেতৃবৃন্দকে বার বার কারাবরণ করতে হয়। এমনকি মাওলানা মওদুদীর প্রতি ফাঁসির দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। যদিও সরকার তা কার্যকর করতে সক্ষম হয় নি। জামায়াতের দাবির প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত উলামাবৃন্দ। সকল মত ও পথের উলামাবৃন্দ এক হয়ে সরকারের নিকট ২২ দফা দাবি উত্থাপন করেন।

এছাড়া ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে গণস্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করা হয়। গণ পরিষদে নেজামে ইসলাম দলীয় সদস্যবৃন্দ খুবই আন্তরিকতাঁর সাথে ইসলামের পক্ষে কাজ করেন। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে কিছু ইসলামী বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত হয়। এগুলো সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হল :

- পাকিস্তানের নাম Islamic Republic of Pakistan অর্থাৎ ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান। কোন দেশের নামের আগে ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংযোজন ইতিহাসে এটাই প্রথম নজীর।
- শাসনতন্ত্রের প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখা হয়।
- শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় 'সমগ্র বিশ্বের উপর একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সার্বভৌম ক্ষমতাঁর মালিক' একথা স্বীকার করা হয়।
- আরো স্বীকার করা হয়, জনগণকে একটি পবিত্র আমানত মনে করে আল্লাহ প্রদত্ত সীমার মধ্যে ক্ষমতা পরিচালনা করতে হবে।
- স্মরণ করা হয় যে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন ''পাকিস্তান হবে ইসলামের সামাজিক সুবিচারের উপর ভিত্তি করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।''

www.pathagar.com

আরো বলা হয় :

- ইসলামের নীতি অনুসরণ করে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য ও সামাজিক সুবিচারের মূলনীতি প্রয়োগ করা হবে।
- জনগণের মৌলিক অধিকার তথা সমঅধিকার, সমসুযোগ, আইনের সম্মুখে সমতা, চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মপালনের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিচার পাওয়ার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা হবে।
- বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে স্বাধীন রাখা হবে।

  শাসনতন্ত্রের ৩য় অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল:
- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির দিক নির্দেশনা (Directive Principles of State Policy)-এ অধ্যায়ের
- ২৪নং ধারায় বলা হয় :

  মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালানো হবে।
- ২৫ নং ধারায় বলা হয়:
  - মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলার প্রয়াস চালাতে হবে।
  - কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে জীবনের সংজ্ঞা অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।
  - মুসলমানদের মধ্যে কুরআনের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।
  - মুসলমানদের ঐক্য সুদৃঢ় করা হবে এবং নৈতিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে।
  - যাকাত, ওয়াকফ ও মসজিদ ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে পরিচালনা করা হবে।
- ২৮ নং ধারায় বলা হয়:
  - বেশ্যাবৃত্তি, জুয়াখেলা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং মদ্যপান প্রতিহত করা হবে।
- ২৯নং ধারায় বলা হয়:
  - জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হবে।
  - স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রিবা (সুদ) উঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
- ৩২ নং ধারায় বলা হয়:
  - পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবেন কমপক্ষে ৪০ বছর বয়স্ক একজন মুসলমান।
- ১৯৭ নং ধারায় বলা হয়:
  - প্রেসিডেন্ট এমন একটি সংস্থা গঠন করবেন, যে সংস্থায় ইসলামের উপর গবেষণা এবং উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এ সংস্থা মুসলিম সমাজকে সত্যিকার ইসলামের ভিত্তিতে পুনর্গঠনে সহযোগিতা দান করবে।
- ১৯৮ নং ধারায় বলা হয়:
  - এমন কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না যা কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। প্রচলিত আইনকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে সামঞ্জস্যশীল করতে হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৫৮ সালের সামরিক আইন ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

পাকিস্তানের তিন কুচক্রীর প্রথম জন গোলাম মোহাম্মদ দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যান। বাকি দুই কুচক্রী ইস্কান্দার মির্জা ও আইয়ুব খান ষড়যন্ত্র করে শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন বানচাল করার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র বাতিল করেন এবং ৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১২টায় সামরিক আইন জারি করেন। আইয়ুব খান ক্ষমতাঁর একচ্ছত্র মালিক হবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে অস্ত্রের মুখে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে লন্ডনের বিমানে তুলে দিয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

সামরিক আইন জারি করার পর রেডিওতে ঘন ঘন ঘোষণা আসতে থাকে এবং কড়া শাস্তি, জরিমানা ও বেত্রাঘাতের কথা জনগণকে বার বার শুনানো হয়-ফলে সবাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। বাঙালির জাতিগত স্বভাব হল, কয়েকজন একত্রিত হলেই গল্প গুজব করা। বিশেষ করে চলতি (Current) বিষয় নিয়ে । কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জাতিগত স্বভাব ভুলে সবাই সামরিক আইনের ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়। যেহেতু সামরিক আইনের ব্যাপারে দেশবাসীর পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই সবাই সামনে কি হয় তা দেখার অপেক্ষায় থাকে।

সামরিক আইন জারির সাথে সাথে জনাব সামসুল হক সাহেব জিন্দাবাজার জামায়াত অফিস-মালিককে সমঝায়ে দেন। অফিস ও পাঠাগারের জিনিসপত্র যা আনা সম্ভব তা নিয়ে এসে ইঞ্জিনিয়ার আসলাম সাহেবের বাসায় গোপনে রেখে দেন। আসলাম সাহেব এ সময় তাঁর পরিবার-পরিজনকে পাঞ্জাবে নিজের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। আসলাম সাহেবের বাসা ছিল নাইওরপুল মসজিদের ঠিক পশ্চিমে প্রায় ৩০০ হাত দূরে। সামরিক আইন উঠার পরও আসলাম সাহেব তাঁর পরিবার আনেন নাই। তিনি বাসার একাংশে থাকতেন, অন্য অংশে ১৯৭১সাল পর্যন্ত জামায়াতের জেলা ও শহর অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জেলা জামায়াতের আমীর জনাব সামসুল হক এবং পরবর্তীকালে জেলা সেক্রেটারী হাফিজ মাওলানা লুৎফর রহমান সাহেব অফিসের একাংশ বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করেন। অন্য অংশ অফিস ও পাঠাগার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সামরিক আইন জারির পর সামসুল হক সাহেব গ্রামের বাড়ি কানাইঘাটের ঝিঙ্গাবাড়ি চলে যান। ডাঃ কুদরত উল্লাহ সাহেবের বাসায় জামায়াত পরিচালিত ইসলামী স্কুল চালু রাখা সম্ভব হয় নি। ছাত্রদেরকে মুসলিম সাহিত্য সংসদের দক্ষিণে অবস্থিত " আনজুমানে তরক্কীয়ে উর্দু" পরিচালিত স্কুলে স্থানান্তর করা হয়। সামসুল হক সাহেব গ্রামের বাড়িতে অবস্থানকালে সবার সাথে খোলামেলা মেলামেশা শুরু করেন। তৎকালীন সময়ে গ্রামে এমন কি থানা পর্যায়ে বি.এ পাশ ব্যক্তি পাওয়া খুবই দুষ্কর ছিল। ফলে তিনি আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। লোকজন তাঁর সাথে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসত।

www.pathagar.com

তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে সামাজিক ও সমাজ-সেবামূলক কাজ আরম্ভ করেন। এ সময় তিনি ঝিঙ্গাবাড়ি হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন। এ ছাড়া তিনি ঝিঙ্গাবাড়ি মাদরাসা, গাছবাড়ি মাদরাসা, জুনিয়র হাইস্কুল, প্রাইমারী স্কুল, রাস্তাঘাট ও সুরমা ডাইক ইত্যাদি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মধুর ব্যবহার, জনসেবা এবং উন্নয়নমূলক কাজে মুগ্ধ হয়ে এলাকাবাসী তাকে ১৯৬০ সালে ঝিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। জনাব সামসুল হকই জামায়াতের প্রথম রুকন যিনি সমগ্র সিলেট বিভাগের মধ্যে সর্বাগ্রে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৬০সাল থেকে ৬৫সাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দক্ষতাঁর সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি সদর মহকুমা উন্নয়ন কমিটি ও থানা উন্নয়ন কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিশেষ অবদান রাখেন।

তিন দফা কর্মসূচির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা

সামরিক শাসনের প্রথম পর্যায় অতিবাহিত হল। দেখা গেল ক্ষমতাঁর সাথে জড়িত ছিলেন এমন সব রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু জামায়াত নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাঁর সাথে জড়িত ছিলেন না, তাই তাঁরা সামরিক শাসকের টার্গেটে পরিণত হন নাই। যদিও জামায়াত অন্যান্য দলের মত বেআইনী তবুও রাজনৈতিক কর্মসূচি বাদ দিয়ে অন্যান্য কার্যক্রম নামবিহীন অবস্থায় করা যায় কিনা তা বিবেচনা করার জন্য জামায়াতের পূর্ব পাক সেক্রেটারী অধ্যাপক গোলাম আযম, বিভাগীয় আমীর জনাব আব্বাস আলী খান, জনাব আব্দুল খালিক ও জনাব হাফিজুর রহমানের সাথে পরামর্শ করেন। পরামর্শ বৈঠকটি ১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তিনটি কাজ করার ব্যাপারে সবাই একমত হন। অতঃপর প্রাদেশিক আমীর মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের অনুমোদন নিয়ে নিম্নোক্ত তিনটি কাজ চালু করার সিদ্ধান্ত হয়। কর্মসূচিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. যে মসজিদে সম্ভব, সেখানে যোগ্য লোক পাওয়া গেলে তাকে দিয়ে জুমআর পূর্বে ধারাবাহিক আলোচনার ব্যবস্থা করা। আলোচনার বিষয়বস্তু হবে "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান"। দশ জুমআয় আলোচনা সমাপ্ত করে অন্য মসজিদে-এভাবে আলোচনার ব্যবস্থা করা।

২. আগে যে সব জায়গায় নিয়মিত সাপ্তাহিক বৈঠক হত, সে সব জায়গায় নিয়মিত দারসে কুরআন চালু করা।

৩. আরো কয়েক মাস পর্যবেক্ষণের পর ঢাকায় সুবিধামত স্থানে সারা প্রদেশের বাছাই করা লোক নিয়ে একটি তাঁরবিয়াত শিবিরের আয়োজন করা।

যেহেতু সার্কুলারের মাধ্যমে জানানো সম্ভব নয়, তাই বিভাগীয় আমীরগণকে সফরের মাধ্যমে প্রোগ্রাম জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। ১৯৫৯ এর শেষ অথবা ৬০ এর প্রথম দিকে রমজান মাসে ঢাকার মতিঝিলে বর্তমান ওয়াপদা বিল্ডিং-এর

www.pathagar.com

পাশে এক টিনশেড মসজিদে দশ দিন ব্যাপী তাঁরবিয়াত শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ:

১. সকাল ৯টা থেকে ১২.৩০মিনিট পর্যন্ত দারসে কুরআন, নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা, গ্রুপভিত্তিক আলোচনা এবং ডেলিগেটদের অনুশীলনী বক্তৃতা।

২. অপরাহ্ন ২টা থেকে আসর পর্যন্ত সুধী সমাবেশ ।

৩. তাঁরাবীহ্ - এরপর আধ ঘন্টা দারসে হাদীস।

৪. সেহ্‌রীর পর ফজর পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের জীবনী আলোচনা।

এ তাঁরবিয়াত শিবিরে সিলেট অঞ্চল থেকে যোগদান করেন জনাব সামসুল হক, জনাব মাওলানা এখলাসুল মু'মিনিন, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ) ও হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান। এছাড়া দাওয়াতুল ইসলাম ইউকের নেতা জনাব আব্দুস সালাম- তখন তিনি ঢাকায় অধ্যয়নরত ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থী হিসেবে তাঁরবিয়াত শিবিরে যোগদান করেন। তবে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তাঁকে বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতে হয়। নির্বিঘ্নে তাঁরবিয়াত শিবির সমাপ্ত হয়। সবাই নব প্রেরণা নিয়ে এলাকায় আসেন। ইক্বামতে দ্বীনের কাজে নিজেকে আরো বেশি সম্পৃক্ত করার জজ্‌বা নিয়ে সবাই কাজে নেমে পড়েন।।

হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান (জন্ম ১৯৪০ - মৃত্যু ১৯৯৮)

তাঁরবিয়াত শিবিরে যোগদানকারী হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেব ব্যতিত অন্যান্যদের ব্যাপারে কিছু কথা আগে এসেছে; তাই হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল :

তাঁর গ্রামের বাড়ি কানাইঘাট থানার বানীগ্রামে। তিনি ঝিংগাবাড়ি ও গাছবাড়ি মাদরাসায় পড়াশুনা করার পর সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা থেকে আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৯৬১ সালে কামিল পাসের পর তিনি গোলাপগঞ্জের সুপ্রাচীন ফুলবাড়ি আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সম্ভবত ৬৩ সালে শিক্ষকতা থেকে ইস্তফা দিয়ে জামায়াতের সার্বক্ষণিক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৭৪ সালে জেল থেকে নির্দোষ হিসেবে খালাস পেয়ে সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর থানার সৈয়দপুর আলিয়া মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট পদে যোগদান করেন।১৯৭৮ সালে তিনি সিলেট চলে আসেন এবং আম্বরখানা জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে দায়িত্বপালন অবস্থায় দাওয়াতুল ইসলামের আহবানে বিলাত চলে যান। তিনি দাওয়াতুল ইসলামের মজলিশে শুরার সদস্য ও নায়েবে আমীর ছিলেন। তিনি বার্মিংহাম ব্রজলী গ্রীন মসজিদ ও ইসলামী সেন্টারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ১৯৯৮ সালে ইন্তেকাল করেন ।

১৯৫৭ সালে হাফিজ লুৎফুর রহমান সাহেব সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসায় আলিম ক্লাসে ভর্তি হন । ইসলামী ছাত্র সংঘের সিলেটের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক ছিলেন সাইয়্যেদ

www.pathagar.com

একরামুল হক। তখন তিনিও আলিয়া মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। তাঁর সাথে হাফেজ লুৎফুর রহমান সাহেবের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। হাফেজ সাহেব ছাত্র সংঘের কাজে জড়িত হন। কিছুদিন পর তাকেই (হাফিজ লুৎফুর রহমান) সভাপতির দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে হয়। তিনি ছাত্রাবস্থায় জামায়াতের ঢাকায় অনুষ্ঠিত তাঁরবিয়াত শিবিরে অংশ গ্রহণ এবং ছাত্রজীবন শেষে জামায়াতে যোগদান করেন। সামরিক আইন উঠার পর জামায়াতের চট্টগ্রাম বিভাগীয় শিক্ষা শিবিরে যোগদানের সময় সেখানে তিনি বিভাগীয় আমীর জনাব আব্দুল খালেকের নজরে পড়েন। তিনি হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেবের মধ্যে লুক্কায়িত প্রতিভা অবলোকন করেন। বিভাগীয় আমীর হাফিজ সাহেবকে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ও মেধা আল্লাহর দ্বীনের কাজে নিয়োজিত করার প্রস্তাব করেন। হাফিজ লুৎফুর রহমান সাহেব চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শ করার জন্য সময় নেন। অবশেষে চাকরি ইস্তফা দিয়ে দ্বীনের কাজে সার্বক্ষণিক সময় দিবার সিদ্ধান্ত নেন। বিভাগীয় আমীর আব্দুল খালেক সাহেব কুমিল্লা জেলায় যোগ্য সংগঠকের অভাব অনুভব করেন। তিনি হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেবকে কুমিল্লার জামায়াতের সংগঠক নিযুক্ত করেন। তিনি কুমিল্লায় কিছুদিন কাজ করেন। অতঃপর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালে জামায়াতকে বে-আইনী ঘোষণা করায় লুৎফুর রহমান সাহেব কুমিল্লা থেকে সিলেটে চলে আসেন। আইনী যুদ্ধে জামায়াত জয়লাভ করার পর তিনি সিলেট জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৬৭ সালে সামসুল হক সাহবেকে প্রাদেশিক সাংগঠনিক সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। তিনি ঢাকা চলে গেলে হাফিজ লুৎফুর রহমান সাহেব জেলা আমীর হন। ১৯৬৯ সালে সামসুল হক সাহেব আবার সিলেটে ফেরত আসেন এবং জেলা আমীর নিযুক্ত হন। তখন হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান সাহেব আবার জেলা সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। হাফিজ লুৎফুর রহমান সাহেব খুব উঁচুমানের বক্তা ছিলেন। তিনি যখন জনসভায় বক্তৃতা করতেন তখন তাঁকে যোগ্য রাজনৈতিক নেতা মনে হত। আবার যখন তিনি সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখতেন তখন তাঁকে দার্শনিক মনে হত। তাঁর বক্তব্যে একদিকে থাকত কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি অন্যদিকে থাকত পাশ্চাত্যের পন্ডিতদের ইংলিশ কোটেশান। ব্রিটিশ টেলিভিশন 'চ্যানেল ফোর' হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান, হাফিজ আবু সাঈদ ও চৌধুরী মঈন উদ্দীন সাহেবকে জড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে একটি বানোয়াট প্রোগ্রাম টেলিকাস্ট করে। প্রোগ্রামকারীর নিয়ত যদিও ভাল ছিল না কিন্তু তিনি এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করেন।

দেশব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠান

ঢাকায় ১০দিন ব্যাপী শিক্ষা শিবির সফলভাবে অনুষ্ঠানের পর দেশব্যাপী ইসলামী সেমিনার করার চিন্তাভাবনা করা হয়। এ ব্যাপারে কিছু বক্তব্য অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের কলম থেকে:

"১৯৬০ সালের প্রথম দিকে চার বিভাগীয় আমীর ও ঢাকার দায়িত্বশীলদের এক বৈঠক মাওলানা আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সামরিক শাসন সত্ত্বেও ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে সুধী-সমাবেশ ও জনগণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে উক্ত বৈঠকে আলোচনা হয়। মতিঝিল এলাকায় মসজিদে ক্ষুদ্র আকারে সুধী -সমাবেশ সফল হওয়ার পর কার্জন হলে বিরাট আকারে সিরাতুন্নবী (সা) সম্মেলন জাঁকজমকের সাথে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হওয়ায় পরিবেশ অনুকূল বলেই ধারণা হয়।

আমরা সবাই একমত হলাম যে, সরাসরি রাজনৈতিক তৎপরতাঁর সুযোগ না থাকলেও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম সুধী সম্মেলন, সীরাত মাহফিল ইত্যাদির ব্যানারে ইসলামী চিন্তাধারা চর্চা করায় সরকারের পক্ষ থেকে কোন বাধার আশঙ্কা নেই। তাই দেশব্যাপী এ জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

জামায়াতে ইসলামী দীন ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে যেভাবে পরিবেশন করে এসেছে, জামায়াতের ব্যানার ছাড়াই দীনের ঐ ব্যাপক ধারণা সর্বত্র পরিবেশন করার দায়িত্ব পালন করাই এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। মাওলানা মওদুদী (র) এর ভাষায়, " বহমান স্রোতকে বাধা দিয়ে আটকানো যায় না। সে সব বাধা এড়িয়ে এদিক ওদিক দিয়ে পথ করে নিয়ে যায়। ইসলামী আন্দোলনকেও অবস্থা ও পরিবেশ বুঝে চলার পথ নির্মাণ করতে হয়। আন্দোলন স্থবির থাকে না। গতিহীন হয়ে গেলে আন্দোলন মরে যেতে বাধ্য।"

"আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়ায় আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। আমাদের ঈমানী দায়িত্ব পালনের পথ পেয়ে গেলাম।"

"ঢাকাস্থ সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল ময়দানে ১০দিন ব্যাপী এক ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালের শীতকালে রমাদান মাসে অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এর আয়োজন করা হয়। ঢাকা শহরের সর্বত্র বিরাট পোস্টারের মাধ্যমে এর প্রচারণার ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকার ইসলামপ্রিয় শিক্ষিত মহলে বেশ সাড়া পড়ে। প্রতিদিনই শ্রোতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সামরিক শাসনামলের পরিবেশে এতবড় একটা অনুষ্ঠান সবার মধ্যেই প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ঐ সময় এ বিরাট অনুষ্ঠানটিকে এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলে আমি মনে করি। ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এমন গবেষণালব্ধ জ্ঞান সেখানে পরিবেশন করা হয়েছে, যা শ্রোতাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দান করেছে।" (জীবনে যা দেখলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৪১-২৪২)

সেমিনারে বক্তৃতাঁর বিষয়াবলি ও বক্তাদের তালিকা ছিল নিম্নরূপ:

১. বিশ্ব সমস্যা ও ইসলাম - মাওলানা আব্দুর রহীম।

২. সুন্নাতে রাসূল (স) - মাওলানা আব্দুল আলী।

৩. শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামী রূপ - অধ্যাপক গোলাম আযম।

৪. কুরআনে বিজ্ঞান - ডাঃ গোলাম মোয়াযযাম।

৫. বর্তমান বিশ্বে ইসলামী আন্দোলন - মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ।

৬. বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি - অধ্যাপক গোলাম আযম।

www.pathagar.com

৭. ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য - জনাব আব্দুল খালেক।
৮. মার্কসীয় দর্শন - মাওলানা আব্দুর রহীম।
৯. ইসলামী সমাজে নারীর স্থান - জনাব আব্বাস আলী খান।
১০. ইজতিহাদ ও ইসলামী আইন - মাওলানা আব্দুল আলী।
১১. ইসলামী সমাজে ব্যাংক - জনাব নূর মোহাম্মদ আকন্দ।
১২. পাকিস্তানের আদর্শ - মাওলানা আব্দুর রহীম।
১৩. ইতিহাস দর্শন ও ইসলাম - শাহ্ আব্দুল হান্নান।

এ সেমিনারে যারা সভাপতিত্ব করেন তাঁরা হলেন: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলানা সামসুল হক ফরিদপুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ ইসহাক, নেযামে ইসলাম পার্টির নেতা এডভোকেট ফরীদ আহমদ, মাওলানা আব্দুর রহীম, সিদ্ধেশরী হাইস্কুলের হেডমাস্টার জনাব আমিরুল হক, রহমতুল্লাহ হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাইয়্যেদ হাফিজুর রহমান ও কায়েদে আযম কলেজের প্রিন্সিপাল এ.এম.আর ফাতেমী।

মজলিশে তামিরে মিল্লাতের ব্যানারে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের তামাদ্দুনিক সম্পাদক ছিলেন জনাব মুহাম্মদ নূরুযযামান। সেমিনার শেষে 'চিন্তাধারা' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়।

সিলেটে ইসলামী সেমিনার

ঢাকায় আশাতীত কামিয়াব ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠানের পর মফস্বল শহরে ইসলামী সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়। সিলেটে ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে শাহী ঈদগাহ ময়দানে। ৫দিন ব্যাপী এ ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার ইসলামী সেমিনারের বিষয়গুলো সামনে রেখে আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করা হয়। সেমিনার সফল করার জন্য সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধি নিয়ে ইন্তেজামিয়া কমিটি গঠন করা হয়। জনাব সামসুল হক হন কমিটির সেক্রেটারী । কমিটি করার সময় আলেম, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, গণপ্রতিনিধিদেরকেও শরীক করা হয়। আসলাম সাহেবের ভাই আকরাম খান কয়েকদিনের জন্য ড্রাইভার সহ একটি জীপ প্রদান করেন । বিভিন্ন জায়গা থেকে সামিয়ানা, সতরঞ্জী ইত্যাদি আনার ব্যবস্থা করা হয়। মাঠ ডেকোরেশন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন বর্তমান সিলেট মহা-নগরীর মহিলা রুকন মোহতাঁরামা খায়রুন্নেসা খাতুনের শ্রদ্ধেয় পিতা মুসলিম লীগ নেতা ও সিলেট মিউনিসিপালিটির তৎকালীন কমিশনার জনাব বশির উদ্দীন আহমদ (বসু মিয়া)। ঢাকা থেকে মেহমান হিসেবে আসেন মাওলানা আব্দুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, জনাব আব্দুল খালেক ও জনাব শাহ্ আব্দুল হান্নান। শাহ্ আব্দুল হান্নান তখনও ছাত্র ছিলেন। স্থানীয় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জনাব সামসুল হক, হাফেজ মাওলানা লুৎফুর রহমান ও সিলেট বন্দর বাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা কাজী ইবরাহিম। সেমিনারের অধিবেশনসমূহে যারা সভাপতিত্ব করেন তাদের কয়েকজন হলেন শায়েখে

www.pathagar.com

কৌড়িয়া হাফিজ মাওলানা আব্দুল করিম, মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী, মাওলানা মুশাহিদ বাইয়মপুরী, শায়েখে ফুলবাড়ি মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী, শায়েখে বরুনা মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্ণভী, মাওলানা কাজী ইবরাহীম। সভাপতি সাহেবানরা সিলেট জেলার সর্বজনমান্য, সর্বশ্রদ্ধেয় আলেম হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে যেত। এছাড়া জামায়াতের ব্যাপারে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। মাওলানা কাজী ইবরাহীম সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যার অত্যন্ত সুষ্ঠু সমাধান করে সেমিনার কামিয়াব করতে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

সেমিনারের কয়েকটি দিক এবং এর সুফল

- সিলেটে এই প্রথম ৫দিন ব্যাপী একটি ইসলামী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
- ইসলামী সেমিনার বলতে কি বুঝায় তা এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা হয়।

অতীতে বহু ওয়াজ মাহফিল হয়েছে কিন্তু বিষয়ভিত্তিক ও ধারাবাহিক আলোচনা অতীতে কখনো হয় নি।

- একটি বিষয় আলোচনার পর ঐ বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন করার এবং আলোচকের মাধ্যমে জবাব দানের ব্যবস্থা রাখা হয়। প্রোগ্রাম সূচিতে প্রশ্ন উত্তরের সময় আগে থেকে নির্ধারণ করে রাখা হয়।
- ইসলামের ধর্মীয় (আধ্যাত্মিক) দিক নিয়ে অতীতে বহু আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ইসলামের পারিবারিক দিক, সামাজিক দিক, সাংস্কৃতিক দিক, অর্থনৈতিক দিক, রাজনৈতিক দিক ও আন্তর্জাতিক দিক নিয়ে আলোচনা অতীতে এভাবে শ্রুত হয় নি। ফলে ইসলাম কেবলমাত্র অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়-একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (Complete code of life) এ বিষয়টি শ্রোতাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়।
- সমাজ দর্শন, ইতিহাস দর্শন, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ইত্যাদি মানব রচিত মতবাদের সাথে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের তুলনামূলক আলোচনা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে।

ইংরেজি শিক্ষিত আলোচকবৃন্দ, মাদরাসায় না পড়েও দারসে কুরআন ও দারসে হাদীস দিতে পারেন, কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে সুন্দর আলোচনা করতে পারেন- অন্যদিকে মাদরাসা শিক্ষিত আলোচকবৃন্দ কলেজ ভার্সিটিতে না পড়েও পাশ্চাত্য মতবাদ সম্পর্কে এত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রাখতে পারেন, উপস্থিত শ্রোতাঁরা তা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

সিলেটের ভিন্নমত ও পথের শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মাহফিলে ঐক্য বিনষ্টকারী ওয়াজ করতেন। কিন্তু এ সেমিনারে সভাপতির আসনে বসে কিংবা বক্তব্য প্রদানকালে যে উদারতা ও ঐক্যের মনোভাব প্রদর্শন করেছেন তা সবাই খুব আগ্রহ ও প্রশংসার দৃষ্টিতে অবলোকন করে।

সেমিনারে আলোচনা শুনার জন্য মহিলাদের আলাদা প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সামরিক আইনের অধীনে সর্বপ্রকার মিটিং মিছিল বন্ধ ছিল। ফলে লোকেরা অনেক দিন

www.pathagar.com

থেকে কোন সমাবেশে উপস্থিত হতে পারে নি। সামরিক আইন চলাকালীন অবস্থায় ৫দিন ব্যাপী ইসলামী সেমিনার হচ্ছে- ঢাকা থেকে মেহমান আসছেন, সাথে সিলেটের সর্বজনমান্য উলামায়ে কেরাম উপস্থিত থাকবেন- ফলে সবার মধ্যে আগ্রহ উদ্দীপনা দেখা দেয়। বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, কওমী মাদরাসার, আলীয়া মাদরাসার, স্কুল কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মচারী পর্যন্ত সেমিনারে তাদের সুবিধামত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। প্রোগ্রাম সূচি পূর্বেই ছাপিয়ে বন্টন করা হয়। সেমিনার সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কি রকম আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর একটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল :

ইসরাব আলী হাইস্কুল এন্ড কলেজ এবং ফুলবাড়ি আলীয়া মাদরাসার ইংরেজী ভাষার সাবেক প্রভাষক জামায়াতে ইসলামী সিলেট শাখার মজলিশে শুরার সদস্য অধ্যাপক আব্দুল মোসাওয়ীর ঐ সময়ে ঢাকা দক্ষিণ স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাড়ি গোলাপগঞ্জের ঢাকা দক্ষিণ বারকোট এলাকায়। সেমিনারের কথা তিনি এক আত্মীয়ের মাধ্যমে শুনতে পান । সেমিনারে যোগদান করার জন্য তিনি সঙ্গীসহ বাড়ি থেকে রওয়ানা হন। রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার কারণে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। কিন্তু তিনি দমবার পাত্র নন। ১৩/১৪ মাইল পায়ে হেঁটে শাহী ঈদগাহ ময়দানে সেমিনার স্থলে শরীক হন।

জনগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় উৎসাহ ব্যঞ্জক আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যায়। ফলে সেমিনারে তহবিলের ঘাটতি হয় নি। সামরিক আইন উঠার পর সেমিনারের সুফল বুঝা যায় । শ্রোতাদের একটা অংশকে জামায়াতের কর্মী, সহযোগী, সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পাওয়া যায়। সংগঠন সম্প্রসারণে এ সেমিনার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। সবচেয়ে উপকৃত হয় ছাত্র সমাজ। আলোচনা তাদের মনে সবচেয়ে বেশি রেখাপাত করে। ফলে ছাত্র ইসলামী সংগঠন ও লাভবান হয়।

আইয়ুব খানের বুনিয়াদী গণতন্ত্র ও হ্যাঁ না ভোট

আইয়ুব খান ক্ষমতা হাতে নিয়ে দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতা, সরকারি অফিসার এবং কালোবাজারী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে দেশের উভয় অংশে সরকারি উদ্যোগে বড় বড় শহরে জনসভা করে জনগণকে লম্বা লম্বা আশার বাণী শুনান। জনগণ আশ্বস্ত হয়। এবার তিনি তাঁর আসল চেহারা দেখাতে আরম্ভ করেন। সশস্ত্র বাহিনীর উপর যাতে তিনি আজীবন কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে আইয়ুব খান কোন দেশ জয় না করেই নিজে নিজেই 'ফিল্ড মার্শাল' উপাধি গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের রাজধানী করাচী, আর সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার রাওয়ালপিন্ডি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাকে থাকতে হবে করাচীতে। সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করা যায়না। তাঁরা ষড়যন্ত্র করে তাকে বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে। তাই তিনি রাজধানী স্থানান্তর করতে মনস্থির করেন। তিনি সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের পার্শে বিরাট বিরাট পাথুরে পাহাড় কেটে রাস্তাঘাট তৈরি করে এবং রাজধানীর চাহিদা মোতাবেক অট্টালিকা, অফিস আদালত নির্মাণ করে মারীতে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

www.pathagar.com

নতুন এ রাজধানী শহরের নাম দেন 'ইসলামাবাদ'।রাজধানী স্থানান্তরের কারণে জনগণের পকেট থেকে বের করা টেক্সের কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। সমস্ত টাকা খরচ হয় অনুৎপাদনশীল (Unproductive) খাতে। রাজধানী স্থানান্তর করে তিনি সেনাবাহিনী ও সেক্রেটারিয়ে টের সরকারি কর্মকর্তাদের উপর পুরো কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তাঁরপর তিনি দেশবাসীকে উপহার দেন মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy)। পাকিস্তানের তিন কুচক্রীর প্রথম কুচক্রী গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৫ সালে প্রথম গণপরিষদ ভেঙে দিয়ে অর্ডিনেন্স জারি করে নিজের পরিকল্পনা মাফিক শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সর্ব্বোচ্চ আদালতের রায়ের কারণে তিনি তা করতে পারলেন না। দ্বিতীয় কুচক্রী ইস্কান্দর মির্জা জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রণীত ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল করে (Controlled Democracy) 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র জাতিকে উপহার দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর উদ্ভাবিত গণতন্ত্রের রূপরেখা প্রকাশের আগেই তাকে অস্ত্রের মুখে ইস্তফা দিয়ে লন্ডনের হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে হল। তৃতীয় কুচক্রী আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy) এর নামে জনগণের মৌলিক অধিকার ভোটাধিকার হরণ করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বারদের হাতে ভোটাধিকার তুলে দিলেন। মেম্বারগণ ভোট দিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। এ লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার মোট ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হল। অতঃপর ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হল। তখনও দেশে সামরিক আইন চলছে। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ, দেশে নাই শাসনতন্ত্র, আইয়ুবখান যা হুকুম দেন তাই আইন। এ অবস্থায় তিনিই একমাত্র প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। ইউনিয়ন কাউন্সিল মেম্বারদেরকে 'হ্যাঁ', ' না' ভোট দিতে হবে। ভোটের এই প্রহসনে যা হবার তাই হল। তিনি সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। তাঁর উদ্ভাবিত এ তরীকা (System) ভবিষ্যতের সকল সামরিক প্রশাসকের অনুসরনিয় হল। এ অঞ্চলের পরবর্তী সকল সামরিক প্রশাসক 'হ্যাঁ', 'না' ভোটের ব্যবস্থা করে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার তরীকা অনুসরণ করতে থাকলেন। আর আইয়ূব খান হলেন সকল সামরিক প্রশাসকের দীক্ষা গুরু।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ ইচ্ছা মাফিক শাসনতন্ত্র জারি করেন। নতুন শাসনতন্ত্রে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারের ব্যবস্থা করা হয়। তাও আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকারের মত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়। শাসনতন্ত্রের বদৌলতে প্রেসিডেন্টকে ডিকটেটার বানিয়ে দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্টের হাতে সরকারের তিন বিভাগ-আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের Ultimate ক্ষমতা প্রদান করা হয়।আইয়ূব খানের জারি করা শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকার (Fundamental rights)-এর কোন অধ্যায়ই ছিল না। ফলে জনগণ অধিকার বঞ্চিত প্রজায় পরিণত হয়। '৬২ সালের শাসনতন্ত্রে '৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের ইসলামী বৈশিষ্ট্যসমূহ সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

www.pathagar.com

ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বারদের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬২ সালের ২৮ মার্চ জাতীয় পরিষদের এবং ৬ মে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন নির্ধারিত হয়। যেহেতু তখনও সামরিক আইন বহাল ছিল, ছিল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ। তাই নির্বাচনে প্রার্থীগণ স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করেন। জনাব সামসুল হক জাতীয় পরিষদে তাঁর এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ আসন থেকে নির্বাচনে জয়ী হন মাওলানা মুশাহিদ বাইয়মপুরী। এ নির্বাচনে অন্যান্য এলাকা থেকে জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান, জনাব সামসুর রহমান, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ ও ব্যারিস্টার আখতাঁর উদ্দীন জাতীয় পরিষদে এবং মাওলানা আব্দুল আলী ও মাওলানা আব্দুস সোবহান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন।

সামরিক আইন প্রত্যাহার

জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হবার পর আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। স্বাভাবিকভাবে ১ জুন থেকে রাজনৈতিক দল পূনর্বহালের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমীরে জামায়াত সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী ১৯৬২ সালের ১লা জুন এক ঐতিহাসিক বিবৃতির মাধ্যমে সংগঠনকে জাতীয় পর্যায়ে পর্ণর্বহাল করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, “সামরিক সরকার জামায়াতকে বেআইনী করায় আমরা জামায়াতের তৎপরতা মুলতবি করেছি মাত্র। আমরা সংগঠনকে ভেঙে দিইনি। আজ থেকেই আবার চালু হল।” চলন্ত রেলগাড়ির সাথে তিনি তুলনা করে বিবৃতিতে বললেন, ‘ইসলামী আন্দোলনের গাড়ি ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর চলন্ত অবস্থায় বাধ্য হয়ে থেমে গেলো। গাড়ি লাইনচ্যুত হয়নি। গাড়ির ড্রাইভার ও গার্ড গাড়ি ফেলে চলে যায়নি। গাড়ির আরোহীরাও গাড়ি থেকে নেমে যায়নি। তাই গাড়ি চলার পথ উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই গার্ড সিগন্যাল দিলে ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করে দিলো। এটাই জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য।”

এতে স্পষ্ট বুঝা গেলো, জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো পৌনে চার বছর একই অবস্থায় ছিল। জামায়াতের সাইনবোর্ড ও অফিস ছিলো না; কিন্তু সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ জনশক্তির সাথে সাংগঠনিক যোগাযোগ নিয়মিতই রাখতেন। এ সময় সংগঠনের কোন পর্যায়েই আমীর ও মজলিসে শুরার কোন নির্বাচন হয়নি। যারা যে পদে ছিলেন তাঁরা এ সময় দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্যক্তি পর্যায়ে দীনের দাওয়াতী দায়িত্ব পালনের কারণে ইসলামী আন্দোলনের সমর্থক সংখ্যা বেড়েছে। জামায়াত বহাল হবার পর তাঁরা সংগঠনের কর্মী হিসেবে সক্রিয় হয়েছে। ঐ সময় জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের দাওয়াত দেওয়া মুলতবি ছিল বটে, কিন্তু দীনের দাওয়াত চালু ছিল। (জীবনে যা দেখলাম- দ্বিতীয় খণ্ড: অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠা নং: ২৬৩-২৬৪)

জনাব সিরাজুল ইসলামের জামায়াতে যোগদান

সামরিক আইন উঠে যাবার পর জামায়াত নেতা জাতীয় পরিষদ সদস্য মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ MNA (Member of National Assembly) সিলেটে

www.pathagar.com

সাংগঠনিক সফরে আসেন। তাঁর আগমন উপলক্ষে জিন্নাহ হলে এক সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশে উপস্থিত হন জনাব সিরাজুল ইসলাম। মাওলানা ইউসুফ সাহেবের বক্তব্য তাঁর মর্ম স্পর্শ করে। তন্ময় হয়ে তিনি মাওলানার বক্তব্য শ্রবণ করেন। তিনি অনুভব করেন তাঁর চিন্তা মাওলানার বক্তব্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। ছাত্রজীবন থেকে তাঁর লালিত স্বপ্ন পাকিস্তান শাসকদের কার্যকলাপে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন মাওলানা ইউসুফ সাহেবের বক্তব্যে তিনি আশার আলো দেখতে পেলেন। এদেশে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হবে, ইসলামের সোনালি অতীতের অনুসরণে রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনর্গঠনের দীপ্ত শপথ নিয়ে একটি সুসংগঠিত দল সামনে অগ্রসর হচ্ছে-সব ধরনের লোক এ দলে শরীক হচ্ছে। তিনি এ রকম একটি দলের অনুসন্ধানে ছিলেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি এ দলের খোঁজ-খবর নিবেন এবং দলীয় কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হলে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে এ দলে কাজ করবেন। সুধী সমাবেশের পর তিনি নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন। পরদিন জামায়াতের নাইওর পুল অফিসে এসে জনাব সামসুল হক, হাফিজ মাওলানা লুৎফর রহমান, মাওলানা মুকাররম আলী, মাওলানা আব্দুন নুর ও জনাব আজির উদ্দীন আহমদের সাথে দীর্ঘ আলাপ করেন। আলাপে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে সংগে সংগে ফরম পূরণ করে প্রথমে জামায়াতের একনিষ্ঠ কর্মী এবং পরে রুকন হন। এ পর্যায়ে সিরাজুল ইসলাম সাহেবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হচ্ছে :

সিরাজুল ইসলাম সাহেবের জন্ম ১৯২৬ সালে জগন্নাথপুর উপজেলার ছিরামিশি গ্রামে। তিনি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ছাত্রজীবনে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি আসাম প্রদেশ মুসলিম স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সেক্রেটারী ছিলেন। ঐ সময় এ ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আযাদ। জনাব সিরাজুল ইসলাম আসাম প্রদেশের মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের সিপাহসালারও ছিলেন। দেশ (পাকিস্তান) স্বাধীন হবার পর তিনি মুসলিম লীগের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হতে পারেন নাই। অন্যদিকে তাঁর ফুফাত ভাই আওয়ামী লীগের এম.পি এডভোকেট আব্দুর রইসের আহবানে সাড়া দিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ পরে আওয়ামী লীগে যোগদান করা তাঁর পক্ষে আদর্শিক কারণে সম্ভব হয় নি। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি প্রথমে একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে, পরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরিতে যোগদান করেন। নীতি নৈতিকতাঁর প্রশ্নে তিনি চাকরিতে মানিয়ে উঠতে পারছিলেন না। অবশেষে সামরিক আইন চলাকালীন অবস্থায় চাকরি ইস্তফা দিয়ে নিজ এলাকায় ছিরামিশি হাইস্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন । এ সময় তিনি এলাকায় বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেন। অতঃপর তিনি সিলেটে চলে আসেন। সিলেট শহরে তিনি রেশন দোকান খুলেন, রাইসমিল স্থাপন করেন এবং চা-পাতাঁর পাইকারী ব্যবসা চালু করেন। জীবনের এ পিরিয়ডে তিনি জামায়াতের সুধী সমাবেশের দাওয়াত পান এবং সমাবেশে উপস্থিত হন। বক্তব্য শুনে তিনি জামায়াতের প্রতি আকৃষ্ট

www.pathagar.com

হন। জামায়াতে যোগদানের পর তিনি আগের ব্যবসা বাদ দিয়ে স্ট্যাম্প ভেন্ডার হন এবং 'সাপ্তাহিক জাহানে নও' ও 'দৈনিক সংগ্রামের' সিলেটের এজেন্ট হন। এ ছাড়া তিনি সিলেট ইসলামী পাবলিকেশন্সের বই বিক্রির জন্য একটা সেন্টার খুলেন।

জনাব সিরাজুল ইসলাম জামায়াতের সিলেট জেলা সংগঠনের সমাজকল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি COP (Combined Opposition Parties) ও PDM (Pakistan Democratic Movement) এর সিলেট জেলার কমিটিতে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি IDL (Islamic Democratic League) এর সিলেট জেলার সেক্রেটারী ছিলেন। এ ছাড়া তিনি আঞ্জুমানে খেদমতে কুরআন এর কোষাধ্যক্ষ, সিলেট ইসলামী সোসাইটির আজীবন সদস্য, শাহজালাল জামেয়া ইসলামীয়ার সহ সভাপতি ও যতরপুর মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ছিলেন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম আব্দুর রাজ্জাক লস্কর ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি ইসলামী ব্যাংকের ৩য় শাখা সিলেটে খোলার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা আব্দুর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম ও জনাব আব্দুল খালেক সিলেটে সাংগঠনিক সফরে আসলে অধিকাংশ সময় তাঁর মেহমান হতেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে মুক্তি বাহিনীর ছত্রী সেনা তাঁর যতরপুরের বাসার পুকুর সংলগ্ন মাঠে অবতরণ করে এবং তাঁর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি এ সময় বাধ্য হয়ে সপরিবারে অন্যত্র এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় নেন। পাকআর্মী পরে এসে ছত্রী সেনাদের তাড়া করে এবং সিরাজ সাহেবের বাসা গান পাউডার ছিটিয়ে জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে।ফলে তিনি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হন। জনাব সিরাজুল ইসলাম ১৯৯৪ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর সহধর্মীণী হাসনে আরা খানম এবং বড় ছেলে হাবিব উল্লাহ মাহমুদ সিলেট মহানগরী জামায়াতের রুকন। তাঁর জামাতা জনাব আব্দুল মান্নান মৌলভীবাজার জেলা জামায়াতের আমীর।

সিলেট শহরের বাইরে প্রথম স্থানীয় সংগঠন (মাকামী জামায়াত)

যেখানে জামায়াতের কমপক্ষে তিনজন রুকন অবস্থান করবেন এবং স্থানীয় রুকনদের মতামতের ভিত্তিতে আমীরে জামায়াত একজনকে আমীর নিযুক্ত করেন-সেখানে মাকামী জামায়াত বা স্থানীয় সংগঠন কায়েম হয়। সিলেট শহরের পর প্রথম মাকামী জামায়াত কায়েম হয় সিলেট সদর থানার হাটখলা ইউনিয়নের উমাইর গাঁও এলাকায়। জনাব নূরুল হক সাহেবের শ্বশুর মাওলানা ছিদ্দিক আলী, জনাব কামিল খানের দাওয়াতে জামায়াতের কর্মী হন- একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি উমাইর গাঁও-এ। তিনি শহর থেকে বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁর ছোট ভাই জনাব হরমুজ আলী পাঠশালা পাশ করে দক্ষ কাঠ মিস্ত্রি হলেন। বড় ভাইয়ের অনুপ্রেরণায় তিনি জামায়াতের সাহিত্য ও পত্রপত্রিকা পড়তে আরম্ভ করেন। ক্রমে তিনি সংগঠনের কর্মী হন। জনাব হরমুজ আলী গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের হেডমাস্টার জনাব মইনউদ্দীনকে টার্গেট করে বই-পুস্তক পড়ান। বড় ভাই মাওলানা ছিদ্দিক আলী বাড়িতে আসলে মইনউদ্দীন সাহেবকে বাড়িতে নিয়ে আসেন ।

www.pathagar.com

দুই ভাইয়ের আলোচনায় সন্তুষ্ট হয়ে মাস্টার মইনউদ্দীন জামায়াতের দাওয়াত কবুল করেন এবং সাংগঠনিক কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এবার জনাব হরমুজ আলী ও মাস্টার মইনউদ্দীন সম্মিলিতভাবে টার্গেট করেন অত্র এলাকার অল্প শিক্ষিত হলেও প্রভাবশালী ও ন্যায়পরায়ণ, গ্রাম্য বিচারক জনাব ছমির উদ্দীন সাহেবকে। তিনি তখন আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা। যেহেতু জনাব ছমির উদ্দীন বিচার ফায়সালায় সব সময় ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করতেন, তাই তাঁরা তাঁর ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য পড়তে দিতেন এবং মাঝেমধ্যে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তাদের প্রচেষ্টা সফল হলো। ছমির উদ্দীন সাহেব আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে জামায়াতে যোগ দিলেন । এ সময় সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা থেকে টাইটেল পাশ করে আসেন পার্শ্ববর্তী দলইর গাঁও নিবাসী মাও: আব্দুল হাই। তিনি মাদরাসায় অধ্যয়নকালীন সময়ে জামায়াতের কর্মী হন। মাওলানা আব্দুল হাইর নেতৃত্বে এলাকায় সংগঠনের অবস্থা মজবুত হয়। অল্প দিনের ব্যবধানে মাওলানা আব্দুল হাই, জনাব হরমুজ আলী, মাস্টার মইনউদ্দীন ও জনাব ছমির উদ্দীন রুকন হয়ে যান। মাওলানা আব্দুল হাই হন স্থানীয় সংগঠনের আমীর। বৃহত্তর সিলেটে, সিলেট শহরের বাইরে সর্ব প্রথম মাকামী জামায়াত বা স্থানীয় সংগঠন কায়েম হয় সালুটিকর বিমানবন্দরের অদূরে হাটখলা ইউনিয়নে, উমাইর গাঁও এলাকায়। এ এলাকা পরিদর্শনে আসেন প্রাদেশিক সেক্রেটারী অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি এখানে একটি জনসভায়ও ভাষণ দেন। সমসাময়িক সময়ে তৎকালীন মহকুমা শহর মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ এবং পরবর্তীকালে হবিগঞ্জে মাকামী জামায়াত কায়েম হয়। এ বর্ণনা অত্র পুস্তকের পরবর্তী অধ্যায়ে গুলোতে আসবে।।

জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করা হল

আইয়ূব খান E.B.D.O (Elcetive Bodies Disqualification Ordinance), P.O.D.O (Public Office Disqualification Ordinance), দুর্নীতি দমন আইনে মামলা, বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উপর শাস্তির ব্যবস্থা করলেন, যারা ক্ষমতাঁর রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। জামায়াত যেহেতু ক্ষমতাঁর সাথে জড়িত ছিল না, তাই সংগঠনের সাথে জড়িত কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হলনা। সামরিক আইন উঠার সাথে সাথে জামায়াত পূর্ণোদ্যমে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। জামায়াতের কার্যক্রম আইয়ূব খানের পছন্দ হল না। তিনি জামায়াতকে প্রতিদ্বন্দ্বি মনে করে সংগঠনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অজুহাত খুঁজতে থাকলেন। ইতোমধ্যে কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হল। যেমন :

১. আইয়ূব খান ১৯৬১ সালের ২মার্চ একটি অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে মুসলিম পারিবারিক আইন জারি করেন। এই আইনের কয়েকটি ধারা ছিল কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। জামায়াত এই আইনের প্রতিবাদ জানায়। সামরিক আইন বহাল থাকায় জনসভা, বিক্ষোভ প্রর্দশন ইত্যাদির আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই জামায়াত পাকিস্তানের উভয় অংশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ জামে মসজিদে একই দিনে জুম-আর নামাজের পর এই আইনের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিলি করে। প্রচারপত্র বিলির সংবাদ শুনে আইয়ুব খান তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন।

www.pathagar.com

২. আইয়ুব খানের উদ্যোগে গঠিত রাজনৈতিক দল কনভেনশন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সংগত কারণে একটি বিবৃতি প্রদান করায়, আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদুদীকে হুমকি প্রদান করা হয় এবং ভুল স্বীকার করে বিবৃতি প্রত্যাহার না করলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুঁশিয়ার করা হয়। মাওলানার বিবৃতি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর "দৈনিক নাওয়ায়ে ওয়াক্ত" পত্রিকায়। মাওলানা বিবৃতি প্রত্যাহার করেন নি।

৩. ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে অনুষ্ঠিত দুটো উপনির্বাচনে (রাওয়ালপিন্ডি ও হায়দরাবাদ) সরকারি দল কনভেনশন মুসলিম লীগ পরাজয় বরণ করে। জামায়াতের ভূমিকার কারণে সরকারি দল পরাজিত হয়।

৪. ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াত ইসলামীর সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রথমত, কোন স্থানের অনুমতি প্রদান করতে অস্বীকার করা হয়। পরে একটি নিকৃষ্ট স্থানের অনুমতি দিলেও মাইক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হল না। এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করলে সরকার অর্ডিনেন্স জারি করে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিল। বাধ্য হয়ে বিনা মাইকে ১০/১২ হাজার লোকের উপস্থিতিতে সম্মেলনের কাজ শুরু হল। তখন সরকারি উদ্যোগে ভাড়াটিয়া গুন্ডাদের দ্বারা গোলযোগ সৃষ্টি করা হয়। প্যান্ডেল ও তাঁবুর রশি কেটে ফেলা হয়, আল্লাহ বখস নামে এক রুকনকে পুলিশের সামনে গুলি করে শহীদ করা হয়। এত সব কান্ডকারখানার পরও নেতৃত্বের নির্দেশনায় কর্মীদের চরম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের কারণে সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

৫. ১৯৬৩ সালের ৬ নভেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন (ছাত্রসংসদ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঠিক দুই দিন আগে ইউনিয়নের সভাপতি পদপ্রার্থী ইসলামী জমিয়তে তালাবার নেতা জনাব বারাকাল্লাহ খানকে সরকারি ইঙ্গিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর প্রতিবাদে ইউনিয়নের সকল নির্বাচন পদপ্রার্থী সর্বমোট ৬৫জন প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নির্বাচন বয়কট করে। ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ হয় এবং মিছিল করে। পুলিশ ছাত্রদেরকে বেধড়ক পিটায়।

৬. সরকার ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ৬মাসের জন্য মাওলানা মওদুদী সম্পাদিত মাসিক 'তরজমানুল কুরআন' এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। মাওলানা মওদুদীর অপরাধ তিনি তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় ইসলামী আন্দোলনের নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ও তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইরানের শাহানশাহের অত্যাচার, নির্যাতন ও নির্বাসনের কাহিনী ছাপিয়ে পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্র ইরান ও বন্ধু শাহান শাহের ক্ষতিসাধন করেছেন।

আইয়ুব খান জামায়াতের উপর দারুন নাখোশ ছিলেন । তিনি জামায়াতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অজুহাত খুঁজছিলেন। উপরিউক্ত ঘটনাগুলো সামনে রেখে তিনি ১৯৬৪ সালের ৬ ই জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করেন এবং মাওলানা

www.pathagar.com

মওদুদী সহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মজলিশে শূরার ৬০জন সদস্যকে গ্রেফতাঁর করেন। গ্রেফতাঁরকৃত নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিলেটের জনাব সামসুল হক। সরকার যে সকল অভিযোগ এনে জামায়াতকে বেআইনী করে সে অভিযোগ সমূহ ছিল নিম্নরূপ:

ক. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধি ছিল এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান ও সরকারের বিরুদ্ধে অনবরত প্রকাশ্যে শত্রুতামূলক মনোভাব প্রকাশ করেছে।

খ. জামায়াতে ইসলামী সরকারি কর্মচারীদের বিশ্বস্ততাঁর ভীত নড়িয়ে দিয়ে এবং গোলযোগ সৃষ্টি করে কর্তৃত্ব দখল করার নিয়তে সরকারি কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠান-গুলোর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে।

গ. জামায়াতে ইসলামীর সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতায় জমিয়তে তোলাবার (ইসলামী ছাত্র সংঘ) ও শ্রমিক সংগঠনের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে বেআইনী হরতাল করার এবং পাবলিক স্থানসমূহে অশান্তি ও হাঙ্গামা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়েছে।

ঘ. জামায়াতে ইসলামী তাঁর নেতৃবৃন্দের আপত্তিকর বক্তৃতাঁর মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে।

ঙ. মাওলানা মওদুদী কাশ্মীর জিহাদকে নাজায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন ইত্যাদি।

জামায়াতে ইসলামী সরকারি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট ও পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে রীট পিটিশন দাখিল করা হয়।

জনাব একে ব্রোহী জামায়াতের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন । পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট সরকারের পক্ষে রায় প্রদান করে। এ সময় পূর্ব-পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ। তিনি লৌহ মানব খ্যাত আইয়ুব খানের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সরকারের বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন। এ রায়ের পর পূর্ব পাকিস্তানে আটক জামায়াত নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করেন। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট আইয়ুব খানের বশ্যতা স্বীকার করে পক্ষপাতমূলক রায় প্রদান করায় পশ্চিম পাকিস্তানের জামায়াত নেতৃবৃন্দ কারাগারে দিনাতিপাত করতে থাকেন। জামায়াতের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয়। তখন পাকিস্তান সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এ.আর. কর্নেলিয়াস। সুপ্রীম কোর্ট জামায়াতের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করে এবং "জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করা বেআইনী ছিল" বলে চূড়ান্ত রায় প্রদান করে। রায়ের প্রেক্ষিতে জামায়াতের সকল নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করেন। সংগঠন যথারীতি কাজ আরম্ভ করে।

আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত রাজনৈতিক আন্দোলন

আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ শাসনতন্ত্র জারি করে ১জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন। ২৪ জুন পূর্ব পাকিস্তানের ৯ জন নেতা আইয়ুব খান প্রদত্ত শাসনতন্ত্র

www.pathagar.com

জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তাঁরা দাবি করেন অনতিবিলম্বে জনগণের সরাসরি ভোটে গণপরিষদ নির্বাচিত করতে হবে। ঐ গণপরিষদ নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। ঐ নেতাঁরা হলেন: জনাব নূরুল আমিন, জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব আবু হোসেন সরকার, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), পীর মোহসেন উদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া), জনাব মাহমুদ আলী ও শেখ মুজিবুর রহমান।

ঐ নয় নেতা ৬২ সালের ৮ জুলাই ঢাকার পল্টন ময়দানে বিরাট জনসভার মাধ্যমে উপরিউক্ত দাবির পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। জনসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মুক্তির দাবি করেন। উল্লেখ্য যে, ঐ দুই নেতা তখনও আইয়ূব খানের জেলে আটক ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী ১৯ আগস্ট কারামুক্ত হন। তিনি ৮ সেপ্টেম্বর করাচী থেকে বিমান যোগে ঢাকা আসেন। তাঁকে বিমানবন্দরে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। নয় নেতাঁর সাথে সোহরাওয়ার্দী একাত্নতা ঘোষণা করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক নেতাদের এ আন্দোলনে শরীক করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কয়েক দিনের মধ্যে তিনি নয় নেতাঁর প্রতিনিধিসহ পশ্চিম পাকিস্তানে আসেন এবং এখানকার রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলাপ শুরু করেন। মাওলানা মওদুদীর সাথে তাদের যে আলাপ হয় তা অধ্যাপক গোলাম আযমের বই থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

"শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বপ্রথম মাওলানা মওদুদীর বাড়িতে হাজির হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎ সম্পর্কে মাওলানা মওদুদীর নিকট থেকে সরাসরি আমি যা অবগত হয়েছি, তা উল্লেখ করছি:

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৯ নেতাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাজির হলেন। জনগণের ভোটে নতুন গণ পরিষদ গঠনের দাবি সম্পর্কে মাওলানা অবহিত ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ৯ নেতাঁর পক্ষ থেকে উথাপিত দাবি সম্পর্কে মাওলানার মতামত জানতে চাইলেন। মাওলানা বললেন :

" জনগণের নির্বাচিত গণপরিষদের প্রণীত ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র আইয়ুব খান বাতিল করে দিলেন। আমরা রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ করতে পারলাম না। দেশ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাপ্রধান অন্যায়ভাবে দেশ শাসনের ক্ষমতা দখল করলেন। আমরা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলাম না E.B.D.O (Elcetive Bodies Disqualification Ordinance) জারি করে ট্রাইবুনালের মাধ্যমে আপনিসহ সকল রাজনৈতিক নেতাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করলেন। এরও কোন প্রতিকার করা সম্ভব হলো না। তথাকথিত বুনিয়াদী গণতন্ত্র চালু করে আইয়ুবখান নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মর্যাদা হাসিল করলেন। মনগড়া শাসনতন্ত্র কমিশন গঠন নতুন শাসনতন্ত্র চালু করে সে অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনপরিষদে নির্বাচনও করিয়ে নিলেন। আমরা নির্বাচন প্রতিরোধ করার চেষ্টাও করলাম না। কেন্দ্রে ও প্রদেশে নির্বাচিত

www.pathagar.com

প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকারও গঠন করে ফেললেন। আমরা কোথাও এ স্বৈরশাসকের গতিরোধ করতে কিছুই করতে পারলাম না। আমাদের ব্যর্থতাঁর এ বিরাট তালিকা নিয়ে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন গণপরিষদ গঠন ও নতুন শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করা কি বাস্তব সম্মত?

১লা জুন থেকে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করার পর আমরা বিবৃতি দিতে সক্ষম হলাম। আমরা সরকারের সমালোচনা করার সুযোগটুকু পেলাম। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা ও গণ-আন্দোলনের সূচনা করার পরিকল্পনা নেবার সময় এসেছে। এখন আমরা যদি রাজনৈতিক আন্দোলন করতে চাই, তাহলে আইয়ুব খানের জারি করা শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করার দাবি জানাতে পারি।"

মাওলানার এ দীর্ঘ বক্তব্যের পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাওলানার যুক্তির সাথে একমত হলেন। ৯ নেতাঁর দাবি যে অবাস্তব সে কথা তিনি উপলব্ধি করলেন। তিনি ৯ নেতাঁর মধ্যে উপস্থিত নেতাদের সাথে মতবিনিময়ের জন্য একদিন সময় চাইলেন। পরদিন আবার বৈঠক করার সময় নির্ধারণ করে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বিদায় নিলেন।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৯ নেতাঁর প্রতিনিধিসহ আসলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব জানালেন যে, পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ ৯ নেতাঁর দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে সম্মত না হলে তাঁরা ঐ দাবি মুলতবি রাখতে রাজি আছেন। আর শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্রসম্মত (Democratization of the constitution) করে সংশোধনের দাবিতে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সাথে মিলে আন্দোলন করতে প্রস্তুত আছেন।মাওলানা মওদুদী তাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুবারকবাদ জানালেন।শহীদ সাহেব ও মাওলানা মওদুদীর প্রচেষ্টায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দেশে গণতন্ত্র পুনর্বহালের উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করার জন্য সম্মত হলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অবিরাম প্রচেষ্টায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মোট ৫১জন নেতাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। (জীবনে যা দেখলাম, ২য় খণ্ড: অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃষ্ঠা নং: ২৬১-২৬২)

৫১জন নেতাঁর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের যাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় তাঁরা হলেন:

আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, আব্দুস সালাম খান, খাজা খয়ের উদ্দীন, মুহাম্মদ সুলায়মান, সৈয়দ আযিযুল হক নান্না মিয়া, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), ফজলুর রহমান ও আবুল কাসেম।

আর পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে যারা ছিলেন, তাঁরা হলেন:

সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ, মাহমুদ আলী কাসুরী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, মোশতাঁর আহমদ গোরমানী, চৌধুরী ফজল এলাহী, মাহমুদুল হক উসমানী, হায়দর বখস জাতোই, শেখ আব্দুল মজিদ সিন্ধী, আলী বখস খান তালপুর, ইউসুফ খাটক, সরদার বাহাদুর খান, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, জেড

এইচ লারী, হাজী মওলা বখস সমরু, রসুল বকস তালপুর, গোলাম মুহাম্মদ খান লুন্দখোর, মোহাম্মদ হানিফ সিদ্দিকী, আইয়ুব খুরো, মোহাম্মদ হোসেন চাট্টা ও সি.আর. আসলাম প্রমুখ।

এসময় জাতীয় পরিষদের সদ্য নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধি দলীয় সদস্যগণ জনাব মশিউর রহমানকে আহবায়ক করে ইউনাইটেড অপজিশন পার্টি। (United Opposition Party) গঠন করে। ইউনাইটেড অপজিশন পার্টি ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের জাতীয় পরিষদ দের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যগণ একযোগে কাজ করার নিমিত্ত সম্মিলিত বিরোধি দল (Combined Opposition Parties) গঠন করে।সর্দার বাহাদুর খান হন দলনেতা এবং মশিউর রহমান হন ডেপুটি লিডার।

ফলে জাতীয় পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলতে থাকে। আন্দোলনের ফলে প্রবল জনমতের চাপে আইয়ুব খান জনাব সোহরাওয়ার্দীর সাথে আলোচনা করার জন্য তাঁর উপদেষ্টা লে:জে: ডাবলিউ এ, বার্কিকে প্রেরণ করেন। পরিতাপের বিষয় ১৯৬২ সালের ৫ডিসেম্বর জনাব সোহারাওয়ার্দী বৈরুতের এক হোটেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন একটু হোঁচট খায়। তাঁরপরও আন্দোলন জাতীয় পরিষদের ভিতরে বাহিরে চলতে থাকে।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা

কিছু দিন পর আইয়ুব খান (Basic Democracy) মৌলিক গণতন্ত্র সিসটেমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দেন। আইয়ুব খান যাতে খালি মাঠে গোল না দিতে পারেন-এ ব্যাপারে বিরোধি দলীয় নেতৃবৃন্দ মত বিনিময় করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালের ২০ জুলাই কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান খাজা নাযিম উদ্দিনের ঢাকার বাসভবনে কাউন্সিল মুসলিমলীগ, আওয়ামীলীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয়। এ সময় জামায়াত নেতৃবৃন্দ প্রায় সবাই জেলে ছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ এম.এন.এ (Member of National Assembly) জাতীয় পরিষদের সদস্য হবার কারণে জেলের বাইরে ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে জামায়াত প্রতিনিধিগণ বৈঠকে যোগদান করেন।ঐ বৈঠকে সম্মিলিত বিরোধিদল COP (Combined Opposition Party) গঠন করা হয়। COP-এর পক্ষ থেকে ৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর COP-এর পরবর্তী বৈঠক করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আইয়ুব খানের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করার জন্য কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন মোহতাঁরামা ফাতেমা জিন্নাকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মনোনীত করা হয়। এ মনোনয়নের ফলে সারাদেশে জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ফাতেমা জিন্নাহর প্রতিটি নির্বাচনী সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। জন সমর্থনে আইয়ুব খান পিছিয়ে থাকলেও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিডি মেম্বারদেরকে হাত করে তিনি পার হয়ে যান। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোহতাঁরামা ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে ১৮,৪২৮

www.pathagar.com

এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১০,২৪৪ ভোট পান। অন্যদিকে আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে ২১,০১২ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৮,৯২১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ

কাশ্মীর নিয়ে আযাদ কাশ্মীরের মুজাহিদদের সাথে ভারত সীমান্তে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে পাকিস্তান ইন্ধন যোগাচ্ছে এ উছিলায় ভারত ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান আক্রমণ করে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে লাহোর দখল করে শালিমার বাগে বিজয় উৎসব পালন করার প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়। ভারতীয় সৈন্য বাহিনী বিরাট ট্যাংক বহর নিয়ে লাহোরের দিকে অগ্রসর হয়। পাকিস্তানের সেনা বাহিনীর ৫০ জন যোদ্ধার এক সুইসাইড স্কোয়াড কোমরে ডিনামাইট বেঁধে রাস্তার দুপাশে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে।ট্যাংক বহর আসার সাথে সাথে তাঁরা ট্যাংকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেয় । ফলে ভারতের অগ্রসরমান সমস্ত ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের লাহোর বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। "ভারতের সৈন্য ছিলো পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যার ছয়গুণ বেশি। কিন্তু যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানের যেই পরিমাণ ভূমি দখল করেছিল তাঁর চারগুণ বেশি ভারত ভূমি দখল করেছিলো পাকিস্তানী সৈন্যরা। পাকিস্তানী সৈন্যরা চার শত ভারতীয় ট্যাংক ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। তাঁরা ভারতের একশত দশটি জঙ্গীবিমান ভূপাতিত করে। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের মাত্র ষোলটি জঙ্গী বিমান ধ্বংস হয়। পাকিস্তান নৌ-বাহিনী ভারতীয় নৌ-ঘাঁটি "দ্বারকা" আক্রমণ চালিয়ে একটি যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস করে। পক্ষান্তরে ভারতীয় নৌ-বাহিনী পাকিস্তানের কোন নৌ-ঘাঁটির কাছে ঘেঁষতে পারে নি।

"যুদ্ধকালে পাকিস্তানের এক নীরব সামাজিক বিপ্লব ঘটে যায়, 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে পাকিস্তানের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। একটি ইসলামী প্রেরণা গোটা জাতিকে আলোড়িত করে। মসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। চুরি ডাকাতি অবিশ্বাস্য হারে হ্রাস পায়। খুন-খারাবী বন্ধ হয়ে যায়। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৈন্যদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। সরকারি কর্মচারীরা ছুটির দিনেও অফিসে কাজ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সন্দেহ নেই, এই নীরব সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টির পেছনে সাইয়্যেদ আবুল আ'লার অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।" (সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী-এ.কে.এম.নাজির আহমদ, পৃ: নং: ৮০)

উল্লেখ্য যে, আইয়ুব খান মাওলানা মওদূদীর চরম বিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রথম দিকে তিনি মাওলানা মওদূদীকে দাওয়াত দিয়ে রাজধানীতে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর সহযোগিতা কামনা করেন। মাওলানা দেশের নাজুক পরিস্থিতিতে দেশের স্বার্থে পূর্ণ সহযোগিতাঁর আশ্বাস প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট মাওলানাকে পাকিস্তানের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করে বেতারে ভাষণ দানের আহবান জানান। মাওলানা মওদূদী রেডিও পাকিস্তান থেকে ১৪, ১৬ ও ১৮ সেপ্টেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন।

www.pathagar.com

১৭ দিন যুদ্ধ চলার পর জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল 'উথান্ট' (মিয়ানমারের অধিবাসী), ভারতের তৎকালীন প্রধান অভিভাবক পরাশক্তি রাশিয়া ও সিকিউরিটি কাউন্সিলের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধ হয়।

তাসখন্দ চুক্তি এবং অতঃপর

যুদ্ধ বন্ধ হবার পর রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলেক্সী কোসিগিনের আহবানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দে এক বৈঠকে মিলিত হন। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় উভয় নেতা ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি এক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যা তাসখন্দ চুক্তি নামে খ্যাত। চুক্তিতে অনেক কিছু ছিল, কিন্তু যে কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ সংগঠিত হয় সে কাশ্মীরের ব্যাপারে একটি অক্ষরও ছিল না। ফলে পাকিস্তান যুদ্ধে ভাল করেও কূটনীতির মারপ্যাচে হেরে যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী কূটনীতিতে জয়লাভ করে খুশিতে আত্মহারা হয়ে তাসখন্দেই হার্টফেইল করে মারা যান।

তাসখন্দ চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশিত হবার পর মওলানা মওদুদী এক বিবৃতি প্রদান করেন যা সর্বস্তরের জনগণের কাছে বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে খুবই প্রশংসিত হয়। মাওলানা তাঁর বিবৃতিতে বলেন "ডিকটেটাররা নিজের দেশে যতই বাহাদুরী দেখাক, আন্তর্জাতিক অংগনে তাঁরা দুর্বল ভূমিকাই পালন করে। কারণ তাদের পিছনে জনগণের শক্তি কার্যকর থাকে না এবং তাঁরা যখন সিদ্ধান্ত নেয় তখন তাঁরা জনগণের নিকট জবাবদিহিতাঁর পরওয়া করে না। জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রধান দেশে সমর্থনের কাঙ্গাল বলে দাপট দেখায় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ময়দানে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। আইয়ুব খান ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে এটাই বিরাট পার্থক্য।"

আইয়ুব খানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো তাসখন্দ চুক্তির ব্যাপারে প্রকাশ্যে দ্বিমত প্রকাশ করেন। ফলে আইয়ুব খান তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এ দিকে ভুট্টোকে কনভেনশন মুসলিম লীগের সেক্রেটারী জেনারেলের পদ থেকেও অপসারণ করা হয়। ভুট্টো কিছু দিন পর 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

তাসখন্দ চুক্তির মাস খানেকের মধ্যে স্বৈরাচার বিরোধি গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ব্যাপারে কি করা হয়েছিল, অধ্যাপক গোলাম আযমের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

"১৯৬৪ সালে যে কয়টি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য COP (সম্মিলিত বিরোধিদল) গঠন করেছিল, সেসব দলের নেতৃবৃন্দ ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সম্মেলনে মিলিত হন। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ও পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টির

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে তাসখন্দ ইস্যুকে কেন্দ্র করে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আবার জোরেশোরে আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরের দিন ৬ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো ও গণদাবির তালিকা তৈরি এবং দেশব্যাপী অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে বৈঠক মুলতবি করা হয়। COP-এর কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান ও পাকিস্তান আওয়ামীলীগ সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

৫ তারিখ সন্ধ্যায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠক বসে। মাওলানা মওদুদী সভাপতিত্ব করছিলেন। তিনি টাইপ করা একটি কাগজ আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে এ কাগজটি বিলি করা হয়।

মাওলানার নির্দেশে ইংরেজিতে টাইপ করা কাগজটির বক্তব্য কর্মপরিষদের সদস্যদেরকে পড়ে শুনালাম। এতে ৬দফা দাবি পেশ করা হয় এবং সম্মেলনে যোগদানকারী সকল দলনেতাদের সমর্থন করার জন্য আহবান জানানো হয়। মাওলানা পরিষদকে জানালেন যে, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ফোনে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে মাওলানার নিকট দুঃখ প্রকাশ করলেন। দলের প্রাদেশিক সভাপতি কেন্দ্রীয় সভাপতিকে উপেক্ষা করে এ সব দাবি পেশ করায় সর্বদলীয় সম্মেলন ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়ে গেলো।

পরদিন সকাল দশটায় ৪দলীয় সম্মেলনের বৈঠকে আন্দোলনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার কথা। কিন্তু সকালে দেখা গেলো, সরকার সমর্থক সকল ইংরেজি ও উর্দু পত্রিকায় শেখ মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলনে পেশ করা ৬দফা দাবি সবচেয়ে গুরুত্ব সহকারে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। এতে বুঝা গেলো যে, বিরোধি দলসমূহের সম্মিলিত আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্য ৬ দফা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে মনে করেই সরকার এভাবে ফলাও করা জরুরি মনে করেছে। এভাবে শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্মেলনকে বানচাল করে দিল। পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানেই শক্তিশালী ছিল। ৬ দফা প্রস্তাব নওয়াবজাদাও সমর্থন না করায় এবং অন্য কোন দলের সমর্থনের কোন সম্ভাবনা না থাকায় নওয়াবজাদা সম্মেলন বাতিল ঘোষণা করেন। ফলে আইয়ুব বিরোধি আন্দোলন সম্মিলিতভাবে শুরু করা সম্ভব হলো না। আইয়ুব খান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।" (জীবনে যা দেখলাম, ৩য় খণ্ড: অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃ:নং: ৫৭-৫৮)

একটি প্রশ্ন?

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত বিরোধি দলের বৈঠকে ৬দফা দাবি পেশ করলেন। অথচ তিনি পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানকে ৬দফা দেখান নাই। এমনকি আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতেও পেশ করেন নি। তিনি

www.pathagar.com

পূর্বপাক আওয়ামী লীগের সভাপতি। অথচ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কোন পর্যায়ের কোন বৈঠকে ৬দফা কর্মসূচি ইতোপূর্বে পেশ করেন নি। কোন জনসভায় অথবা সাংবাদিক সম্মেলনেও ৬দফা প্রকাশ করেন নি। ইতোপূর্বে কোন সাংবাদিকের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেন নি, কোন বিবৃতিও দেন নাই। এমনকি লাহোরে আগত তাঁর সফর সঙ্গীদের সাথেও আলাপ করেন নি। তিনি তাঁর দলের একটি প্রদেশের প্রাদেশিক সভাপতি। তিনি কোন পর্যায়ে প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কোন বডিতে আলোচনা না করে, তাঁর দলের কেন্দ্রীয় সভাপতির সাথে কোন পরামর্শ না করে, স্বউদ্যোগে সম্মিলিত বিরোধিদলের বৈঠকে ৬দফা দাবি পেশ করে বসলেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠে ৬দফা তাঁর দলের পক্ষ থেকে পেশ ও পাশ করার দাবি নয়। কোন বিশেষ মহল শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করে তাকে দিয়ে ৬দফা দাবি সম্মিলিত বিরোধি দলের বৈঠকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে উত্থাপন করিয়েছে।

পিডিএম (Pakistan Democratic Movement) গঠন

এবার আইয়ুব খান নিজেকে জনপ্রিয় করার মানসে জনগণের কোটি কোটি টাকা খরচ করে উন্নয়নের দশক নামে আত্ম-প্রচারণামূলক উৎসব পালন শুরু করেন। স্বৈরাচার স্থায়ী আসন গেড়ে বসতেছে দেখে বিরোধি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হুশিয়ার হন। তাঁরা ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকায় জনাব আতাউর রহমান খান সাহেবের বাসভবনে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন:

১. এন.ডি.এফ. (National Democratic Front) এর পক্ষে জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব নূরুল আমিন ও জনাব হামিদুল হক চৌধুরী।
২. কাউন্সিল মুসলিম লীগের পক্ষে জনাব মিয়া মমতাজখান দৌলতানা, জনাব তফাজ্জুল আলী ও জনাব খাজা খয়ের উদ্দিন।
৩. জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে জনাব মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ, মাওলানা আব্দুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম।
৪. আওয়ামী লীগের পক্ষে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান, এডভোকেট আব্দুস সালাম খান ও গোলাম মুহাম্মদ লুন্দখোর।
৫. নেযামে ইসলাম পার্টির পক্ষে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, মৌলভী ফরীদ আহমদ ও এম. আর.খান। বৈঠকে আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করার জন্য পিডিএম (Pakistan Democratic Movement) গঠন এবং কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

পিডিএম-এর কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান হন আওয়ামী লীগের নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং সেক্রেটারী হন এনডিএফ নেতা সিলেটের জনাব মাহমুদ আলী। পিডিএম এর পূর্ব-পাকিস্তান শাখার চেয়ারম্যান হন আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট আব্দুস সালাম খান। সেক্রেটারী হন জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম।আর কোষাধ্যক্ষ হন তৎকালীন এন.ডি.এফ. নেতা পরবর্তীকালে আওয়ামীলীগ নেতা বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিলেটের আব্দুস সামাদ আযাদ।

www.pathagar.com

পিডিএম গঠন প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিস ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমান পরিচালিত অংশ পিডিএম এর অন্তর্ভুক্ত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ও রাজশাহীর কামরুজ্জামান পরিচালিত আওয়ামী লীগ আলাদাভাবে ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলন চালাতে থাকে। আইয়ুব খান বিরোধি আন্দোলনে ভীত হয়ে জুলুম নির্যাতন আরম্ভ করেন। ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান সহ পঁয়ত্রিশ জনকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৩ নভেম্বর পিপুলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে গ্রেফতাঁর করা হয়। ন্যাপ নেতা সীমান্ত প্রদেশের আব্দুল ওয়ালী খানকেও গ্রেফতাঁর করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বহু ছাত্র ও শ্রমিক নেতা গ্রেফতাঁর হন। ইত্তেফাক সহ কয়েকটি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এদিকে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানে জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন আরম্ভ করেন।

ডি.এ.সি. (Democratic Action Committee) ডাক

একদিকে আইয়ুব বিরোধি আন্দোলন জোরে-শোরে শুরু করা হয়েছে, অন্যদিকে সরকারের জুলুম নির্যাতন চরমে ওঠেছে এ রকম এক পরিস্থিতিতে পিডিএম-এর ৫ দলের বাইরে আরো তিনটি দল বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ঐক্য আন্দোলনে শরীক হবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। দল তিনটি হল -৬দফা পন্থী আওয়ামী লীগ, ওয়ালী খানের ন্যাপ এবং মাওলানা মুফতী মাহমুদের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। ১৯৬৯ সালের ৭ ও ৮ জানুয়ারি ঢাকায় জনাব নূরুল আমিনের বাসভবনে ৮দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে ডি.এ.সি. (Democratic Action Committee) ডাক গঠন করা হয়। এতে যারা স্বাক্ষর করেন তাঁরা হলেন:

১. জামায়াতে ইসলামীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ,
২. এন.ডি.এফ. এর জনাব নূরুল আমিন,
৩. আওয়ামী লীগের নবাবজাদা নসরুল্লাহ্ খান,
৪. কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মমতাজ মুহাম্মদ খান দৌলতানা,
৫. নেযামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মুহাম্মদ আলী,
৬. (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির) ন্যাপের নেতা আমীর হোসেন শাহ,
৭. জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মাওলানা মুফতি মাহমুদ,
৮. ৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগের সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

ডি.এ.সি. (Democratic Action Committee) ডাক এর ৮ দফা

আটদলীয় জোট গণতন্ত্র বহালের আন্দোলন শুরু করার উদ্দেশ্যে ঐ বৈঠকেই নিম্নরূপ ৮দফা দাবিতে সবাই ঐক্যমত্য পোষণ করেন:

১. কেন্দ্রে ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার।

www.pathagar.com

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন।
৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার।
৪. নাগরিক অধিকার পুনর্বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল। বিশেষত বিনা বিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল।
৫. শেখ মুজিবুর রহমান, খান আব্দুল ওয়ালী খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি এবং কোর্ট ও ট্রাইব্যুনাল সমীপে দায়েরকৃত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।
৬. ১৪৪ ধারার আওতায় দেওয়া সর্বপ্রকার আদেশ প্রত্যাহার।
৭. শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল।
৮. সংবাদপত্রের উপর আরোপিত যাবতীয় বিধি-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রেস ও পত্রিকা পুনর্বহাল।

দেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হতে থাকে। ৯ জানুয়ারি লাহোরে ছাত্ররা গণমিছিল করে। মুলতানের ছাত্রদের উপর পুলিশ হামলা চালায়। ১০ জানুয়ারি মুলতানে মহিলা কলেজের ছাত্রীরা মিছিলে যোগ দেয়। ১১ জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে মহিলাদের মিছিল বের হয়। ১২ জানুয়ারি ডি.এ.সি. এর ডাকে সারাদেশে হরতাল পালিত হয় । একই দিন এয়ার মার্শাল (অব:) মুহাম্মদ আজগর খান শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়নের জন্য বিবৃতি প্রদান করেন। ১৩ জানুয়ারি এয়ার মার্শাল (অব:) আসগর খান এক বিবৃতিতে দাবি করেন-'আইয়ূব সরকারের দেশ চালানোর আর কোন অধিকার নাই।' ১৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি হামলা হয়। ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি ঢাকা মহানগরী ছাত্রদের মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে আইন বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হন । ২১ জানুয়ারি ঢাকার রাজপথে ছাত্র জনতাঁর উপর পুলিশ গুলি চালায়, ফলে ২৯ জন গুলিবিদ্ধ হয়। ২২ জানুয়ারি রাওয়ালপিন্ডি ও হায়দরাবাদে জনতাঁর উপর পুলিশ বর্বরোচিত হামলা করে। ২৪ জানুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ২৭ জানুয়ারি করাচী ও লাহোরে সেনাবাহিনী নামিয়ে কারফিউ জারী করা হয়। ২৮ জানুয়ারি পেশাওয়ার সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। ৩১ জানুয়ারি ডি.এ.সি এর আহবানে পাকিস্তানের উভয় অংশে শোক দিবস পালিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হককে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ড. সামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয় গেইটে নিহত হন। আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরকার দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

আইয়ুব খানের আত্মসমর্পণ

তাঁরপর কি হয়েছিল অধ্যাপক গোলাম আযমের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

"গোটা পাকিস্তানে আইয়ূবের স্বৈরশাসন-বিরোধি আন্দোলন দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দেখে আইয়ুব খান ৫ ফেব্রুয়ারি DAC-এর কেন্দ্রীয় আহবায়ক নওয়াবযাদা

www.pathagar.com

নসরুল্লাহ খানকে এক চিঠিতে প্রস্তাব দেন যে, 'ডাক'-এর প্রতিনিধিদের সাথে ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে আলোচনা করতে চান। 'ডাক'- এর আহ্বায়ক বৈঠকে শরীক হবার সম্মতি জানিয়ে তারিখ পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন। ইতোমধ্যে পরিস্থিতি এতোটা মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, ১৪৪ধারা কোথাও কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। এমনকি সেনাবাহিনী নিয়োগ করেও আইন-শৃঙ্খলার তেমন কোন উন্নতি করা যাচ্ছিলো না। দেশে কোন সরকার আছে বলে মনে হচ্ছিলো না। এদিকে মাওলানা ভাসানী ওদিকে মি.ভুট্টো জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন করে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে দিলেন।

আইয়ূব খান উপলব্ধি করলেন যে, তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করার ঘোষণা না দিলে বিদ্রোহের এ আগুনের লেলিহান শিখা দেশে চরম অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করবে। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) জাতিকে জানিয়ে দিলেন যে, আগামী নির্বাচনে তিনি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হবেন না। স্বৈরশাসক এভাবেই আন্দোলনের নিকট আত্মসমর্পণ করে আগুনে পানি ঢেলে দিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের জন্য এটুকু ঘোষণা যথেষ্ট বিবেচিত হবে না বলেই ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশাল গণসংবর্ধনা দেওয়া হয় সেখানেই কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রথম বৈঠক হবার কথা ছিলো। আওয়ামী লীগ দাবি করলো যে, বৈঠকে শেখ মুজিবকে শরীক করতে হবে। আইয়ূব খান পেরোলে (সাময়িক মুক্তি) সুযোগ দিতে রাজি হলেন। কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেবার দাবিতে তীব্র আক্রমণাত্মক আন্দোলন চালায়। যে আদালতে মামলা চলে সেখানেও আক্রমণ করা হয়। এ পরিস্থিতিতেই আইয়ুব খান ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঐ ঘোষণা দেন। শেখ মুজিবের মুক্তির পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে আরও কিছু আগেই ভুট্টোকে মুক্তি দেওয়া হয়।

গোল টেবিল বৈঠকের জন্য পরিবেশ অনুকূল হয়। আইয়ূব খান ঐ বৈঠকের মাধ্যমে সম্মানজনকভাবে ক্ষমতা থেকে সরে যাবার ব্যবস্থা করলেন। DAC এবং আইয়ুব খানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ডাকের ৮দফা মেনে নিয়ে দেশকে নির্বাচনমুখী করতে চেয়েছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক সফল হলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন '৬৯ সালেই বিজয়ী হয়ে যেতো। কিন্তু তা হয় নি।

রাউন্ডটেবিল কনফারেন্স

রাউন্ডটেবল কনফারেন্স-এর তারিখ দু'দফা পরিবর্তন হয়ে শেষ পর্যন্ত ২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ূব খানের ক্ষমতা ত্যাগের ঘোষণা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি গোলটেবিলে বৈঠকের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

DAC-এর অন্তর্ভুক্ত ৮ দলের নেতৃবৃন্দ '৬২ থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিশ্চিত সাফল্যের আনন্দে উদ্বেলিত। 'ডাক'-এর ঘোষিত ৮দফা দাবি গোলটেবিল বৈঠক সরকারিভাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মেনে নেবার ঘোষণা দেওয়ার ফরমালিটি শুধু বাকি রয়েছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বৈরশাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্যই এ ব্যবস্থা। 'ফিল্ড মার্শাল' আইয়ুব খান দশ বছর দাপটের সাথে স্বৈরশাসন চালিয়ে গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ত্যাগের সময় সর্বনিম্ন সম্মানটুকু নিয়ে বিদায় হবার পদ্ধতি হিসেবেই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। DAC-এর নেতৃবৃন্দ এটুকু সম্মান প্রদর্শন করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিতদের তালিকা

DAC-এর অন্তর্ভুক্ত ৮টি দলের সম্মিলিত সংগ্রামের ফলেই স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে বিদায় নিতে হয়। তাই তিনি DAC-এর কেন্দ্রীয় আহবায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খানকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার জন্য ফরমালি (আনুষ্ঠানিক) চিঠি দেন। সে চিঠিতে তিনি 'ডাক' এর আহবায়ককে বৈঠকে আমন্ত্রিতদের তালিকা পাঠাতে অনুরোধ করলেন এবং ডাক এর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তির নামও তালিকায় দেবার ইখতিয়ার দিলেন। যেহেতু ডাকের সাথেই বৈঠক হবে, সেহেতু ডাকের বাইরে কোন ব্যক্তিকে ডাকের সম্মতি ব্যতীত দাওয়াত দেওয়া সমীচীন নয়।

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারীদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য ডাকের বৈঠক বসে। ৮ দলের প্রত্যেক দল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের একজন করে আট দল থেকে মোট ১৬ জনের নিম্নরূপ তালিকা প্রস্তুত করা হলো :

১. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান : মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ও অধ্যাপক গোলাম আযম।
২. পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি : চৌধুরী মুহাম্মদ আলী ও মৌলভী ফরীদ আহমদ।
৩. পাকিস্তান মুসলিম লীগ : মিয়া মুমতায মুহাম্মদ খান দৌলতানা ও সাইয়েদ খাজা খায়রুদ্দীন।
৪. পাকিস্তান আওয়ামী লীগ : নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান ও আব্দুস সালাম খান এডভোকেট।
৫. পাকিস্তান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট : জনাব নূরুল আমীন ও হামিদুল হক চৌধুরী এডভোকেট।
৬. আওয়ামী লীগ: শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
৭. পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম : মাওলানা মুফতী মাহমুদ ও পীর মুহসিনুদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া)।
৮. পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি : খান আব্দুল ওয়ালী খান ও অধ্যাপক মোযাফফর আহমদ।

www.pathagar.com

ডাক এর বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ডাক-এর বাইরে যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তাদেরকেও গোলটেবিল বৈঠকে দাওয়াত দেবার জন্য ডাকের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়:

১. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ)
২. জুলফিকার আলী ভুট্টো (পিপসল পার্টি)
৩. এয়ার মার্শাল আসগর খান।
৪. লে.জেনারেল মুহাম্মদ আযম খান।
৫. সৈয়দ মাহবুব মুরশিদ (সাবেক প্রধান বিচারপতি)।

গোল টেবিলি বৈঠক শুরু

রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট গেস্ট হাউজে ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক বসে। বৈঠকে ডাক-এর ১৬জন, আইয়ুব খানের সরকারি মুসলিম লীগের আইয়ুব খান ব্যতীত ১৫জন, নির্দলীয় এয়ার মার্শাল আসগর খান ও বিচারপতি সাইয়েদ মাহবুব মুরশিদ বৈঠকে যোগদান করেন। মাওলানা ভাসানী, মি.ভুট্টো ও আযম খান আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও বৈঠকে যোগদান করেন নি। এ বৈঠক সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে শুরু হয়ে মাত্র ৪০মিনিট পর ঈদুল আযহা উপলক্ষে ১০মার্চ সকাল ১০টা পর্যন্ত মুলতবি হয়। বৈঠকে DAC-এর পক্ষ থেকে আহবায়ক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্টের নিকট ৮ দফা দাবি সংবলিত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য লিখিত আকারে হস্তান্তর করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দুর্বল কণ্ঠে সবাইকে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে বৈঠকে হাজির হওয়ার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানান। বৈঠকের এ প্রথম দিনে আনুষ্ঠানিক আর কোন আলোচনা হয়নি। তবে বৈঠক শুরু হবার আগে এবং বৈঠক মুলতবি হবার পর সবাই পরস্পর পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে হাত মিলান ও অনেকে কোলাকুলি করেন।

একসাথে ঢাকা প্রত্যাবর্তন

পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত নেতৃবৃন্দ ঢাকা ফিরে যাবার সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে পিআইএ-এর এক বিশেষ বিমানকে রাওয়ালপিন্ডি থেকে সরাসরি ঢাকা পৌছার নির্দেশ দেওয়া হয়। গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে ৮ দলের অনেক নেতা রাওয়ালপিন্ডি এসেছিলেন। বৈঠকে আমন্ত্রিতদের কয়েকগুণ বেশি সংখ্যায় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন, যাতে কোন বিষয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে ত্বরিত ব্যবস্থা করা যায়।

বিমানের আরোহণ করে আমার আসন তালাশ করছি। এমন সময় শেখ মুজিব "এই আযম সাহেব এদিকে আসেন, শেখ মুজিব হাসিমুখে কথা বলতে অভ্যস্থ এবং হালকা রসিকতা করতে পছন্দ করতেন।" বলে আওয়াজ দিলেন। কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলাম

www.pathagar.com

যে, আশেপাশে কয়েকদলের নেতাঁরা বসে আছেন। শেখ মুজিব হাত বাড়িয়ে আমাকে এক আসনে বসিয়ে দিয়ে রসিকতা করে অন্যদেরকে শুনিয়ে বললেন "আযম সাহেবের মত ভাল মানুষ জামায়াতে ইসলামীতে গেলেন।" আমি জওয়াবে হেসে বললাম, "শেখ সাহেব ঠিকই বলেছেন। সব ভাললোকগুলো জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি খারাপ দলে শামিল হয়েছে এবং মন্দ লোকগুলো আওয়ামী লীগের মত একটি ভাল দলে শরীক হয়েছে।" আশেপাশে সবাই হাসলেন। শেখ সাহেব বললেন "দেখুন দেখি আমাকে কেমন মারটা দিলো।" আমি পরিবেশ হালকা করার জন্য বললাম, "আমরা এখানে সবাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহযোদ্ধা, আর আপনি সেনাপতি।" শুনে আমার সাথে মজবুত আলিঙ্গন করলেন। আমার আসন একটু দূরে ছিলো। নিকটবর্তী সবার সাথে হাত মিলিয়ে আমার আসনে গিয়ে বসলাম।

৮মার্চ লাহোরে ডাকের বৈঠক :

১৯৬৯ সালের ১০মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে মুলতবি গোলটেবিল বৈঠক শুরু হবার কথা। ৮মার্চ সকাল ১০টায় পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লাহোরে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর বাড়িতে DAC-এর নেতৃবৃন্দের বৈঠক বসে। সবাই নিশ্চিত যে, গোলটেবিল বৈঠকে আইয়ুব খান ডাক এর ৮দফা দাবি মেনে নিবেন।

এরপরের করণীয় সম্পর্কে গোলটেবিল বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হতে হবে। ৮ দফার ভিত্তিতে যথাসম্ভব শিগগির নির্বাচন হতে হবে। নির্বাচন পরিচালনার সময় কেন্দ্রে ও প্রদেশে সরকারি ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে, কখন নির্বাচন হবে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন কমিশন গঠনের নীতি কি হবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রেসিডেন্ট সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই প্রস্তাব পেশ করবেন। তাই এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গোলটেবিল বৈঠকে বসার পূর্বেই DAC-এর ঐকমত্যে পৌঁছা প্রয়োজন। সেখানে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত পেশ করার সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। বৈঠকের একপক্ষ আইয়ুব সরকারের আর অপরপক্ষ DAC, তাই DAC-এর অন্তর্ভুক্ত ৮ দলকে উপরিউক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হওয়া অত্যাবশ্যক।

DAC-এর কেন্দ্রীয় আহবায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান সভাপতি হিসেবে বৈঠকের শুরুতে কিছু বলবার আগেই শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম দাঁড়িয়ে বললেন, "ডাক-এর নেতৃবৃন্দের নিকট আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবি পেশ করা হোক। এ কথা বলার সাথে সাথে উপস্থিত সবাই হতভম্ব হয়ে একে অপরের দিকে তাঁরাচ্ছেন। সেখানে চরম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। সবাই সভাপতির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সভাপতি হাতে মাথা ঠেকিয়ে নিচের দিকে চেয়ে রইলেন। বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতাঁরা একত্র বসা আছেন। কেউ কিছু বলছেন না। যেন বৈঠকখানায় বজ্রপাত হয়েছে। DAC-এর ৮টি দলের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮দফা রচিত হয়েছে। এ ৮দফা দাবির

www.pathagar.com

ভিত্তিতেই আন্দোলন হয়েছে। এ দাবি মেনে নিতে রাজি হয়েই প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছেন। এ ৮দফা প্রণয়নে শেখ মুজিবের দলও শরিক ছিলো। একদিন পরই গোলটেবিল বৈঠক বসার কথা। ৮দফা দাবি মেনে নেবার পর যেসব ইস্যু আলোচনা হতে পারে সে সম্পর্কে DAC-এর মতামত চূড়ান্ত করার জন্য ৮দলের নেতৃবৃন্দ এখানে সমবেত হয়েছেন।

এ পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পশ্চিম পাকিস্তানে যার কোন প্রতিনিধি নেই)এর দলীয় ৬দফা দাবি গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করার দাবি জানানো বজ্রপাতের চেয়েও বেশি মারাত্মক। যৌথ আন্দোলনে শরীক কোন দল এমন অদ্ভুত আচরণ কেমন করে করতে পারলো এটাই সাবাইকে হতবাক করেছে। গোলটেবিল বৈঠককে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র ছাড়া এর মধ্যে আর কোন সৎ উদ্দেশ্য তালাশ করে পাওয়া সম্ভব নয়। ৮বছর ব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কায় DAC-এর ৭টি দলের নেতৃবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিস্তব্ধ অবস্থায় পড়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর সভাপতি গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বৈঠক মুলতবি করা হলো। চরম হতাশা নিয়ে সবাই ধীরে ধীরে উঠে বের হয়ে গেলেন।

মাওলানা মওদূদীর সাথে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎ

চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেবের ড্রইংরুম থেকে বের হয়ে গাড়ি কাছে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি । দেখলাম, শেখ মুজিব ও জনাব তাজুদ্দীন একসাথে আসছেন। হঠাৎ আমি তাঁর দিকে এগিয়ে হাত মিলিয়ে বললাম, "আপনি কি করতে চান বুঝতে পারছিনা । চলুন না মাওলানা মওদূদীর সাথে বসে আলাপ করি।" তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। ইস্ট পাকিস্তান হাউজ থেকে যে সরকারি গাড়িতে এসেছিলেন সে গাড়িকে চলে যেতে বললেন। তিনি ও তাজউদ্দীন আমার সাথে জামায়াতের গাড়িতে উঠলেন।

একটু আগেই মাওলানা বৈঠক থেকে বাড়িতে ফিরে গেলেন। আমাদের গাড়ি মাওলানার চেম্বারের সামনে থামলে আমি শেখ মুজিবকে পাশের বৈঠকখানায় বসিয়ে মাওলানাকে ভেতরে খবর দিলাম। মাওলানা সাথে সাথেই চেম্বারের দরজা খুলে শেখ সাহেবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। খবর পেয়ে মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদও হাজির হলেন। তাজুদ্দীন শেখ সাহেবের পাশেই বসলেন, আমি ও মিয়া সাহেব পাশাপাশি বসলাম। আলোচনার সূচনার উদ্দেশ্যেই আমি বললাম। "মাওলানা আপনার সাথে যোগাযোগ না করেই আমি শেখ সাহেবকে নিয়ে এলাম। তিনি কি চান তা তাঁর কাছ থেকে শুনবার উদ্দেশ্যেই আমি নিয়ে এসেছি। এখন শেখ সাহেব বলুন।"

শেখ মুজিব উর্দু ও ইংরেজি উভয় ভাষা মিলিয়ে প্রায় ১০/১২ মিনিট তাঁর বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, "মাওলানা সাহেব, আমি ৬দফার আন্দোলন শুরু করার পরই আমাকে গ্রেফতাঁর করা হয়। আমি জেলে থাকা অবস্থায়ই আমার ৬দফার সাথে আরো

www.pathagar.com

৫দফা যোগ করে ছাত্ররা ১১দফার আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়।আযম সাহেব ৬দফা সম্পর্কে শুরু থেকে এ পর্যন্ত একই ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু মাওলানা ভাসানী আজব চিজ। তিনি প্রথমে ৬ দফা ডিসমিস বলে ঘোষণা করলেন অথচ আমার অনুপস্থিতিতে ১১দফা নিয়ে মাতামাতি করেছেন। ছাত্র ও শ্রমিক মহলে ১১দফার ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। মাওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকেও যোগদান করলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য মোটেই ভালো নয়। তিনি জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন চালাচ্ছেন। আমি যদি ৬দফার বদলে DAC-এর ৮ দফা মেনে নেই, তাহলে আমার বিরুদ্ধে মাওলানা ছাত্র ও শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলবেন। জনগণের মধ্যে ৬দফাসহ ১১দফা যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এর ফলে আমি বিরাট সমস্যায় পড়েছি। মাওলানা ভাসানী বিরাট এক ফিতনা। তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন।"

একটানা এ কথাগুলো বলার পর একটু থেমে আবেগময় কণ্ঠে বললেন, "মাওলানা সাহেব, মেহেরবানী করে ৬ দফাকে সমর্থন করে আমাকে সাহায্য করুন। দেখবেন, আমি মাওলানা ভাসানীকে দেশ থেকে তাড়াবো।"

মাওলানা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "আপনি যদি আপনার দলীয় দাবিতে অনড় থাকেন তাহলে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবে এবং মাওলানা ভাসানী আরও মজবুতভাবে কায়েম হবে। মাওলানা চান যে, গোলটেবিল বৈঠক বানচাল হয়ে যাক। আপনার এ পদক্ষেপ মাওলানার উদ্দেশ্যই পূরণ করবে। মনে রাখবেন ৭/৮ বছরের আন্দোলনের ফলে গণতন্ত্র এখন আমাদের দুয়ারে হাজির। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে আবার সামরিক শাসন অনিবার্য হয়ে পড়বে । গোলটেবিল বৈঠককে সফল করুন এবং গণতন্ত্র বহাল হতে দিন। আগামী নির্বাচনে আশাকরি আপনি ভালো করবেন।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাসখন্দ ইস্যুকে ভিত্তি করে সম্মিলিতভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও ৬দফার কারণেই আপনার দল শরীক হতে পারেনি। এবার তো আপনার দল DAC-এ শরীক হয়ে ৮দফা প্রণয়নে একমত হয়েছে। আপনার দলীয় দাবি অপর ৭দলকে মেনে নিতে বাধ্য করতে পারেন না।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ৮দফা মেনে নিতে সম্মত হয়েই গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছেন। আপনি কেমন করে আশা করতে পারেন যে, DAC-এর অন্যান্য দল আপনার দাবি মেনে নেবে? গোলটেবিল বৈঠককে সফল করে গণতন্ত্রকে এক্ষণি বহাল করার মহাসুযোগ নষ্ট করবেন না। দেশে অবিলম্বে নির্বাচন হতে দিন। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দলীয় মেনিফেস্টো অনুযায়ী পরিচালনা করবেন। আমি বিষয়টা বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।"

ইতোমধ্যে চা-নাস্তা এলো শেখ সাহেব আর কিছুই বললেন না। একটু চা খেয়ে বিদায় নিলেন। যে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছিলাম, সে গাড়িতেই ইস্ট-পাকিস্তান হাউজে পৌঁছাবার জন্য সাথে গেলাম। গাড়িতে আমি মাওলানার কথাগুলো সিরিয়াসলি বিবেচনা

www.pathagar.com

করার জন্য কয়েকবার তাগিদ দিলাম। সারা পথে মাঝে মাঝে দু'এক কথা আমিই বললাম। তাঁরা দু'জনই গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। কোন কথাই আর বললেন না। আমাকে তাঁর পক্ষে কনভিন্স করার চেষ্টা করলেন না, মাওলানার যুক্তি সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করলেন না।

ইস্ট পাকিস্তান হাউজে পৌঁছলে গাড়ি থেকে নেমে আমার সাথে হাত মিলিয়ে নীরবে চলে গেলেন। মুখে অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব লক্ষ করলাম। তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্য হাসিটুকুও দেখা গেল না।

অনিশ্চিত অবস্থায়ই রাওয়ালপিন্ডি গমন

DAC-এর যে বৈঠক ৮মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়, সে বৈঠক আর হতে পারেনি। নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান এবং আরও কয়েকজন মিলে শেখ মুজিবকে বুঝাতে সক্ষম না হওয়ায় DAC-এর বৈঠক করে কোন লাভ নেই বলে আমাদেরকে জানানো হল। এখন প্রশ্ন দেখা দিল যে, এ অবস্থায় গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে আর কি লাভ হবে? তবু এ অনিশ্চিত অবস্থায়ই পরদিন ৯মার্চ সবাই রাওয়ালপিন্ডি গেলেন। সেখানে বিকেলে জামায়াতের দায়িত্বশীলদের বৈঠকে মাওলানা মওদুদী পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। গোলটেবিল বৈঠককে সফল করার জন্য নওয়াবযাদার সর্বাত্মক চেষ্টার কথা জানালেন। শেখ মুজিবের একগুঁয়েমির কারণে দেশে আবার এক সামরিক শাসনের আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, মাওলানা আপনি আরও একবার শেখ মুজিবকে বুঝাবার চেষ্টা করবেন? তাকে আবার আপনার কাছে নিয়ে আসবো? মাওলানা বললেন, "যে ব্যক্তি পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানীর হুমকির ভয়ে জাতির ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়, এমন অদূরদর্শীর সাথে আলোচনা অর্থহীন।"

এ অবস্থায়ও পরদিন ১০মার্চ সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্টের গেস্ট হাউজে অনুষ্ঠিতব্য গোলটেবিল বৈঠকে হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রইলো। শেষ পর্যন্ত কি হতে যাচ্ছে কেউ তা বলতে পারছে না। শেখ মুজিবের হঠকারিতাঁর কারণে গণতন্ত্র ঘরের দুয়ার থেকে ফিরে যাবার আশঙ্কায় সবাই পেরেশানি বোধ করলেন। ১৯৬২ সাল থেকে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সফল হওয়ার শেষ পর্যায়ে ব্যর্থ হবার উপক্রম হলো বলে সবাই শঙ্কিত।

রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের বিবরণ :

১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডির প্রেসিডেন্টস গেস্ট হাউসে কনফারেন্সের প্রথম বৈঠক বসে। ঈদুল আযহার কারণে ১০ মার্চ পর্যন্ত বৈঠক মুলতবি হয়। ঐ বৈঠকে DAC-এর আহবায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান ফরমালি ৮ দলীয় জোট-ডাক এর পক্ষ থেকে ৮দফা দাবি পেশ করেন। এ বিষয়ে পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা হবার কথা। এটা সবার কাছেই স্পষ্ট ছিল যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান DAC-এর ৮ দফা মেনে নেবেন এবং এর ভিত্তিতে পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার

www.pathagar.com

মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। কিন্তু ১০ মার্চ মুলতবী বৈঠক শুরু হবার পূর্বে ৮মার্চ লাহোরে DAC-এর বৈঠকে শেখ মুজিব তাঁর দলীয় ৬ দফা দাবি গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করার প্রস্তাব দিয়ে চরম জটিলতা সৃষ্টি করে দিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে DAC-এর ৮ দফা মেনে নেবার পর তা বাস্তবায়িত করার কর্মপন্থা সম্পর্কে DAC-এর লাহোর বৈঠকে কোন আলোচনার পরিবেশই অবশিষ্ট রইল না। এ সত্ত্বেও চরম অনিশ্চয়তাঁর মধ্যেই ১০ মার্চ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈঠক বসলো। যার যার নির্দিষ্ট আসনে সবাই বসলেন। কিন্তু যথারীতি বৈঠকের কর্মসূচি শুরু হলো না।

আইয়ুব খান জানতে পারলেন যে, শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবির কারণে DAC-এর মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। নওয়াবযাদার সাথে আইয়ুব খানের টেলিফোনে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা হয়। কিন্তু কোন পথই বের করা গেলনা। এ সত্ত্বেও বৈঠক বসার সিদ্ধান্ত বহাল রইল। নওয়াবযাদা শেখ মুজিবকে সম্মত করাতে সক্ষম হবেন বলে সামান্য ইঙ্গিত ছিলো বলেই বৈঠক বসলো।

দেখা গেলো যে, DAC-এর ৮ দলের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ আসন থেকে উঠে টেবিলের আশেপাশেই পরস্পর কথাবর্তা বলছেন। আইয়ুব খান তাঁর দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে নিজেদের আসনে বসে আছেন। নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান মাও. মওদুদী ও চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর মাঝের আসনে একবার মাওলানার সাথে আর একবার চৌধুরী সাহেবের সাথে মাঝে মাঝে কথা বলেছেন। সবাই চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেছেন বলে বুঝা গেলো।

সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়লাম :

আমার হাতে একজন এক টুকরা কাগজ দিলেন। গেটে জামায়াতের স্থানীয় দায়িত্বশীল আমার অপেক্ষা করছেন বলে জানলাম। আমি বের হতেই সাংবাদিক বাহিনী আমাকে ঘিরে ফেললেন। আমি গেটে অপেক্ষারত ব্যক্তির দোহাই দিয়ে ছাড়া পেলাম বটে, কিন্তু গেট থেকে হলে ফিরে আসার আগেই আবার সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়তে হল। বৈঠকে কি হচ্ছে জানার জন্য কতভাবে যে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করা হলো, যার কোন জওয়াব দেওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। আমি নানা কথা বলে তাদের খপ্পর থেকে বেঁচে আসতে চাইলাম। একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'গত রাতে সেনা প্রধান ইয়াহইয়া খানের সাথে শেখ মুজিবের যে গোপন সাক্ষাৎ হয়েছে সে কথা কি আপনি জানেন? আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।'

হলে ফিরে আসতে আসতে ভাবলাম, এ জাতীয় গোপন বৈঠক কখনো গোপন থাকে না। এ বৈঠক যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে এর উদ্দেশ্য কি? পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত Polic-এর ফলে নির্মিত হিরো হিসেবে শেখ মুজিবের সাথে সেনা প্রধানের কি ধরনের সমঝোতা হতে পারে তা ভেবে পেলাম না। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত হলাম যে, এ গোপন বৈঠকের খবর মিথ্যা হওয়ার কথা নয়।সাংবাদিকরা

www.pathagar.com

খবর জেনে যায় এবং কোন কোন সময় তাদের কাউকে জানিয়েও দেওয়া হয়। শেখ মুজিবের মতো বড় নেতা সেনা প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকলে উভয় পক্ষেই বেশ কয়েক জনের জানা স্বাভাবিক। তাই যত গোপন বৈঠকই হোক তা মুখে মুখে ও কানে কানে সহজেই ছড়িয়ে যায়।

হলে ফিরে এলাম

গোলটেবিল বৈঠকের পর হলে ফিরে এসে পূর্বের স্থবির অবস্থাই দেখলাম। সরকারি দায়িত্বশীল ও প্রায় সব বিরোধি দলীয় জাঁদরেল নেতাঁরা এমন অচল অবস্থায় পড়ে রইলেন দেখে হতাশ হলাম। দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে ভাবতে পারছিলাম না। গোলটেবিল বৈঠক যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে বাকি রইলো না। এক সময়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদের লিডার সবুর খান ঘোষণা করলেন যে, আজ বৈঠক মুলতবি ঘোষণা করা হলো। বিরোধি দলের পক্ষ থেকে তাদের দাবি সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জানালে আবার বৈঠক বসতে পারে। কোন সময় নির্দিষ্ট না করেই বৈঠক মুলতবি হয়ে গেলো। বিমর্ষ বদনে সবাই বিদায় হয়ে গেলেন।

হল থেকে বের হতেই সাংবাদিকগণ বিভিন্ন নেতা থেকে বৈঠকের ফলাফল জানতে চাইলেন। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৈঠক মুলতবি হয়ে গেলো বলা ছাড়া কারো পক্ষেই আর কিছু বলার ছিলো না। নওয়াবযাদা সাংবাদিকদের থেকে কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

১১ ও ১২মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে DAC-এর নেতৃবৃন্দ গোলটেবিল বৈঠক সফল করার জন্য শেখ মুজিবকে বুঝাবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। শেখ মুজিবের এক কথা '৬ দফা মুলতবি করার সাধ্যও আমার নেই। ৬ দফা জনগণ গ্রহণ করে ফেলেছে। আমি জনগণের সামনে কৈফিয়ত দিয়ে কুলাতে পারব না। মাওলানা ভাসানী ময়দান দখল করে ফেলবে। আন্দোলনরত ছাত্র-শ্রমিকজনতা একমুখী হয়ে গেছে।'

গোলটেবিলের শেষ বৈঠক

১৩ মার্চ শেষ বৈঠক যথাস্থানেই শুরু হল। সবাই বুঝতে পারলেন যে, এ বৈঠকের ফলাফল শূন্যই হবে। শুধু সমাপ্তি ঘোষণার উদ্দেশ্যেই বৈঠক বসেছে। আইয়ুব খান ঘোষণা করলেন, 'সকল রাজনৈতিক দল দুটো বিষয়ে একমত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১. প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে জনগণের সকল প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে হবে।
২. ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

তাই সরকারের পক্ষ থেকে এ দুটো দাবি মেনে নিলাম। আর কোন বিষয়ে ঐকমত্যে না পৌছার কারণে তা বিবেচনা করা সম্ভব হল না। আমি গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। এরপর ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি DAC-এর এক দায়সারা বৈঠকে আহবায়ক ঘোষণা করলেন যে, DAC-এর প্রধান দুটো দাবি সরকার মেনে নেওয়ায় ৮দলীয় জোটের আর প্রয়োজন রইলো না। তাই DAC বিলুপ্ত ঘোষণা করা হল।

www.pathagar.com

গোলটেবিল বৈঠকের চরম ব্যর্থতা

বহু কাঙ্খিত গোলটেবিল বৈঠকের চরম ব্যর্থতাঁর গ্লানি নিয়ে আমরা মনমরা হয়ে রইলাম। গণতন্ত্র ঘরের দুয়ার থেকে ফিরে যাওয়ার দুঃখে গভীর বেদনায় অস্থিরতা বোধ করলাম। আইয়ুব বিরোধি আন্দোলনে নয় বছরের সংগ্রামের সুফল হাতের মুঠোয় এসেও হারিয়ে গেল। এসব অনুভূতি ডাক-এর সবাইকে মর্মাহত করল। অপরদিকে ১৪মার্চ শেখ মুজিব গোল টেবিল ব্যর্থ করার মহাগৌরব নিয়ে ঢাকা বিমান বন্দরে বীরোচিত সংবর্ধনা পেলেন। গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতাকে তিনি ৬ দফার বিজয় হিসেবে ধারণা করলেন। বিমান বন্দরে তিনি ঘোষণা করলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানি নেতাঁরা ৬দফা সমর্থন করলে আইয়ুব খান তা মেনে নিতে বাধ্য হতেন। এভাবে তিনি পূর্ব পাকিস্তানি সকল দলের নেতাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলেন। মাওলানা ভাসানী সর্ম্পকেও তিনি মন্তব্য করেন যে, রাজনীতি থেকে তাঁর অবসর গ্রহণ করা উচিত।

মাওলানা মওদুদীর সাথে বৈঠক :

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যাবার পর রাওয়ালপিন্ডিতেই জামায়াত নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়। মাওলানা মওদুদী তাতে সভাপতিত্ব করেন।

আমি হতাশা প্রকাশ করলাম, ‘‘এরপর দেশে কী হতে যাচ্ছে? আইয়ুব খান তো আর শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।’’ মাওলানা বললেন, ‘‘আইয়ুব খানকে এখন সেনা প্রধানের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আবার আমরা সামরিক শাসনের অধীন হলাম।’’

ইতোমধ্যে ইয়াহইয়া-মুজিব গোপন বৈঠকের কথা গুজবের পর্যায় পার হয়ে সত্যি ঘটনা হিসেবে ব্যাপক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আমি মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘‘এ বৈঠকের উদ্দেশ্য কী হতে পারে?’’ মাওলানা বললেন, ‘‘গোলটেবিল বৈঠককে ব্যর্থ করার মহান উদ্দেশ্য ছাড়া আর কী হতে পারে?’’ আবার প্রশ্ন করলাম, ‘‘এতে ইয়াহইয়ার স্বার্থ কী?’’ মাওলানা বললেন ক্ষমতা দখল করার এই মহাসুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? দশ বছর আগে যখন সেনাপ্রধান আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন তখন এর পরিবেশ এতোটা অনুকূল ছিলো না। এখন সারাদেশে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে তাতে সামরিক শাসনের পথ খোলাসা হয়েছে। গোল টেবিল বৈঠক সফল হলে সারাদেশ নির্বাচনমুখী হয়ে যেতো। রাজনৈতিক দলগুলোই বিশৃঙ্খলা ঘটায়। তাঁরা নির্বাচনমুখী হলে সহজেই আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসতো । গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে সামরিক শাসন অনিবার্য হয়ে পড়বে বলেই ইয়াহইয়া এ ব্যবস্থা করেছেন।’’ আমি আবার প্রশ্ন করলাম, ‘শেখ মুজিব কি সামরিক শাসন চাইতে পারেন? তিনি কেন এ বিষয়ে ইয়াহইয়া খানকে সমর্থন করবেন?’ মাওলানা একটু ক্ষোভের সাথে বললেন, ‘‘তাঁর হিসাবই আলাদা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এতো বড় নেতা বানিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু নেতাসুলভ দূরদৃষ্টি দান করেননি। তাঁর দৃষ্টি কেবল পল্টন ময়দান ও রাজপথে।

www.pathagar.com

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে সামরিক শাসন আসবে না এমন নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্যই হয়তো তিনি ইয়াহইয়ার সাথে দেখা করে থাকবেন। ইয়াহইয়া খান হয়তো তাঁকে সে নিশ্চয়তাই দিয়ে থাকবেন।'' আমি আবার বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'আপনি বলছেন যে, গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে সামরিক শাসন অনিবার্য হয়ে পড়বে। ইয়াহইয়াহ খান তখন শেখ মুজিবকে কী কৈফিয়ত দেবেন?'' মাওলানা মুচকি হেসে বললেন, '' কৈফিয়ত দিতে হবে কেন? তিনি সরলভাবে অত্যন্ত নেক মানুষ হিসেবে নিজে উদ্যোগ নিয়েই হয়তো বলবেন, মার্শাল ল' জারি করার সামান্য আগ্রহও আমার ছিলো না। প্রেসিডেন্ট আমার হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। আমি তো নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নই। সেনাপ্রধান হিসেবে সামরিক আইন জারি করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না।''

আমি রীতিমত অস্থিরতা প্রকাশ করে বললাম, ''সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক শেখ মুজিব এভাবে গোলটেবিল বৈঠকটি ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হলেন। এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার।''

মাওলানা জবাব দিলেন, ''গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার পেছনে আপনি শুধু শেখ মুজিবকে একা দেখছেন কেন? ভুট্টো ও মাওলানা ভাসানী তো সর্বশক্তি দিয়ে এটাই চেয়েছেন। ইয়াহইয়া খানের ষড়যন্ত্র তো স্পষ্ট। ভুট্টোর সাথে ইয়াহইয়া খানের কোন যোগসাজশও থাকতে পারে। স্বয়ং আইয়ুব খান নাকে খত দিয়ে DAC এর ৮দফা মেনে নেওয়া থেকে বেঁচে গেলেন এবং বিনা ঝামেলায় নিরাপদে ক্ষমতারোহণ বাঘের পিঠ থেকে নেমে যেতে পারলেন। গোলটেবিল বৈঠক সফল হলে আইয়ুব খানকে বিরোধি দলের আরও অনেক পরিপূরক দাবি মেনে নিতে বাধ্য হতে হতো এবং তাতে আইয়ুব খানের চরম পরাজয় বরণ করতে হতো। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় DAC এর ৮দলের মধ্যে শেখ মুজিবের দল ছাড়া আর সকল দলের অত্যন্ত অপমানজনক পরাজয় ঘটলো এবং আইয়ুব খানের পরোক্ষ বিজয় হলো।

তাছাড়া কোন কিছু গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন । ভেঙে দেওয়া বা নষ্ট করা সবচেয়ে সহজ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পরিণামে শেখ মুজিব শুধু একটি দলের নয়, একটি আন্দোলনের মহানেতাঁর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় এ জাতীয় ভূমিকা পালন করতে পারলেন। ইয়াহইয়া খানও এ সুযোগ নিতে সক্ষম হলেন এবং আইয়ুব খানও সুবিধা পেয়ে গেলেন।''

উক্ত বৈঠকে মাওলানাকে অনেকেই নানা প্রশ্ন করলেন। মাওলানা ঐ সব প্রশ্নের জওয়াব দেবার পর বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে কতক পরামর্শ দিলেন। আরও একবার সামরিক শাসনের শিকার হতে হচ্ছে, এ নিশ্চয়তা নিয়েই বৈঠক শেষ হলো।

ঢাকায় ফিলে এলাম

কয়েকদিন পর ভাঙা মন ও চরম হতাশা নিয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এমন মারাত্মক পরিণতির জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ফিরে

www.pathagar.com

এসেই জামায়াতের প্রাদেশিক মজলিশে শুরার বৈঠক ডাকলাম। সামরিক আইন জারি হলে সাংগঠনিক কাঠামোকে বহাল রাখা ও দাওয়াত সম্প্রসারণ করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যই বৈঠক ডাকা হলো । ১৯৬৯ সালের ২৫মার্চ সামরিক শাসন শুরু হবার আগেই মজলিসে শুরার বৈঠক হয়ে গেলো । তাই জামায়াতকে কোন অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হলো না। মাওলানা মওদুদীর দূরদৃষ্টির ফলে ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো না।" (জীবনে যা দেখলাম-৩য় খণ্ড, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃ.নং৭৭-৮৮)

একজন ৬ দফা প্রণেতাঁর দাবি

"গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থ পরিণতির পর করাচী থেকে ঢাকা ফিরে আসার পথে বিমানে এক ভদ্রলোক অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে আমার সাথে হাত মিলালেন। তাকে আমি চিনলাম না। আমার পাশের আসনে বসা ভদ্রলোককে অনুরোধ করে তাঁর আসনে নিয়ে বসালেন এবং তিনি এসে আমার পাশে বসলেন। আমি বিস্মিত হয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলাম। ধারণা করেছিলাম যে, তিনি আদর্শিক দিক দিয়ে নিকটবর্তী হবেন। তাই আমার সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপ করতে চান।

অচিরেই টের পেলাম যে, তিনি সম্পূর্ণ বিরোধি ক্যাম্পের লোক। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার পর যারা বিজয়ীর গৌরব বোধ করছেন, তিনি তাদের একজন। পরাজিত প্রতিপক্ষের একজন প্রতিনিধিকে পেয়ে তিনি বিজয়োৎসবের অংশ হিসেবে আমাকে 'ভ্রান্ত পথ' ত্যাগ করার উপদেশ দিতে চেয়েছেন।

পরিচয় নিয়ে জানলাম, তিনি একজন সিএসপি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ইসলামাবাদে কর্মরত আছেন। ছুটিতে দেশের বাড়িতে যাচ্ছেন। বাড়ি তাঁরা চাঁদপুর। নাম ডক্টর আব্দুস সাত্তার।আমাকে তিনি খুব ভাল করেই চেনেন বলে বললেন। যারা রাজনীতি করেন তাঁরা লেখাপড়ার চর্চা খুব কমই করেন। আমি এর ব্যতিক্রম বলে আমাকে শ্রদ্ধা করেন বলেও উল্লেখ করেছেন। আমার সাথে আলোচনার সুযোগ পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন বলে জানালেন। এভাবে কতক সৌজন্যমূলক কথা বলে তিনি বক্তব্য শুরু করলেন।

"আপনারা ৬দফাকে সঠিকভাবে বিবেচনা করলেন না। এটাকে শেখ মুজিবের একটি হঠকারী রাজনৈতিক প্রস্তাব মনে করে হয়তো এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেন নি। এটা শেখ মুজিবের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে বটে, কিন্তু এর প্রণেতা হলেন ১৮জন পিএইচডি। এর মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং সরকারি ও বেসরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এটা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ফর্মূলা, যা ৮কোটি বাঙালির ভাগ্যের দ্রুত পরিবর্তন করবে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ আঠারো জন পিএইচডি-এর মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই অন্যতম? তিনি জোশের সাথে দাবি করলেন যে, তিনি এ সংগঠকদেরও একজন। আমি জানতে চাইলাম, 'ঐ আঠারো জনের সবাই কি বাঙালি?' তিনি আরও উৎসাহের সাথে জানালেন যে, তাঁরা সবাই বাঙালি জাতীয়তায় বিশ্বাসী।

www.pathagar.com

আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনারা নিশ্চয়ই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ভিত্তিতেই এ ৬ দফা প্রণয়ন করেছেন। উক্ত পরি কল্পনায় কি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে? তিনি খুবই খোলা মনে জওয়াব দিলেন, " "আপনারা জনগণের ময়দানে কাজ করেন। আমরা তাদের সাথে কাজ করছি, যারা দেশ চালাচ্ছেন। পাঞ্জাবীরা আমাদেরকে দাবিয়ে রাখতে চায়। তাদের থেকে আলাদা না হয়ে আমরা উন্নতি করতে পারবো না। আমাদের দু' অঞ্চলের মাঝখানে ভারত। এ অবস্থায় এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকা অস্বাভাবিক।"

আমি বললাম, "আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দেশ গণতন্ত্রের পথে এগুচ্ছে। আমরা কেন্দ্রেও প্রাধান্য বিস্তার করবো। আমরা কেন আলাদা হওয়ার চিন্তা করবো? তাঁরা আলাদা হতে চাইলে দেখা যাবে।"

এর জওয়াবে তিনি এমন কথা বললেন, যা শুনে আমি চমকে গেলাম। তিনি বললেন, "বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। '৪৭ সালে বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করায় আমরা জাতি হিসেবে দুর্বল হয়ে গেছি। বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে গোটা উপমহাদেশে আমরা বিশাল মর্যাদার অধিকারী হতে পারবো।"

আমি জানতে চাইলাম, "পশ্চিম বঙ্গের বাঙালিরা কি ভারত থেকে আলাদা হয়ে আমাদের সাথে মিলে আলাদা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে রাজি হবে?"

তিনি আস্থার সাথে বললেন, "আলবত তাঁরা প্রস্তুত হবে। তাঁরা কলকাতাকে রাজধানী করতে চাইবে। বঙ্গদেশ বিভক্ত না হলে তো আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী কলকাতায়ই থাকতো। ব্রিটিশ আমলেও কলকাতা বহু বছর ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল।"

আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ ভদ্রলোক মুসলিম হিসেবে চিন্তা করেন না, বাঙালি হিসেবে গর্ববোধ করেন। তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়ার পরিবর্তে সহানুভূতি বোধ করলাম। বললাম যে, দীর্ঘ সময় ধরে আপনার চিন্তাধারা সম্পর্কে জানার সুযোগ হলো। এখন আমার কথা শুনুন।

"আপনারা এ প্রজন্মের মানুষ। আমরা ব্রিটিশ আমল দেখেছি। ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণদেরকে জমিদারি স্বত্ব দিয়ে মুসলিম কৃষকদেরকে তাদের প্রজা বানালো।সর্বক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের সাহায্যে এদেশে ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করলো। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ৪টি প্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার ও ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার কায়েম হয়। মাত্র দু'বছরে কংগ্রেস শাসিতপ্রদেশ সমূহে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা যে নির্যাতন ভোগ করেছে, তাঁরই প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে পাকিস্তান কায়েমের আন্দোলন দানা বাঁধে এবং ৪৭ সালে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকারী হই।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যারা পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন, তাঁরা মুসলিম জাতীয়তাবোধের লালন না করে পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে পরবর্তী জেনারেশনে বাঙালি জাতীয়তাঁর উদ্ভব হয়। আপনাদের মতো মেধাবীদের

www.pathagar.com

সামনে তাঁরা পাকিস্তান-আদর্শ তুলে না ধরার কারণেই নতুন প্রজন্ম ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে।" তিনি বললেন, "ইতিহাসের গতি এখন ফেরার উপায় নেই।" এভাবেই করাচী থেকে ঢাকা পর্যন্ত তিন ঘন্টা সময় দু'প্রজন্মের চিন্তাধারার আদান-প্রদানে কেটে গেলো।"

(জীবনে যা দেখলাম-৩য় খণ্ড, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃ.নং ৯০-৯২)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাংলাদেশ বেতারের সাবেক সিনিয়র পরিচালক জনাব অনু ইসলাম নয়াদিগন্তের ১৫ আগস্ট ২০০৭ এর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের বক্তৃতাঁর রেকর্ড সংরক্ষণ করা তাঁর দায়িত্বের অংশ ছিল। বাংলাদেশ বেতাঁরে শেখ সাহেবের সংরক্ষিত একটি বক্তৃতাঁর ভাষা নিম্নরূপ:

"ছয় দফা দেবার পর মানুষ মনে করেছিল যে, ছয় দফা কিছু একটা কম্প্রমাইজ বোধ হয় শেখ মুজিব করবে। এটা আর কিছু না। আমি যে ৬দফা দিয়েছি কয় দফা দেবার জন্য সেটাও আমি জানতাম আর আমাদের দল জানত। কিন্তু ওর থেকে আর নড়ি-চড়ি নাই। নিগশিয়শনে বসে একটি স্টেপ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যখন পাঠিয়ে দিলাম নজরুল সাবরে, কামাল সাবরে তখন উঠে গেল সে কনফেডারেশন। ৬দফা থেকে আরো একটু বেড়ে গেলাম। তো আন্দোলন আস্তে আস্তে এগিয়ে নিতে হয়। তাই আমরা হাত দিলে সহজে হাত নামাই না।"

আবার সামরিক শাসন

দেশের এ নাজুক অবস্থায় আইয়ুব খান সেনা প্রধান ইয়াহইয়া খানের সাথে যোগাযোগ করে দেশে সামরিক আইন জারি করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ইয়াহইয়া খান তাঁকে সাফ জানিয়ে দেন-দেশে সামরিক আইন জারি করতে হলে তা করবে সেনা বাহিনী। আইয়ুব খান একথার মর্ম ভাল করে উপলব্ধি করলেন। তিনি ১৯৬৯ সালের ২৪মার্চ লিখিতভাবে সেনাপ্রধান ইয়াহইয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। ইয়াহইয়া খান পরদিন ২৫মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে বেতাঁর ভাষণে জানিয়ে দেন-দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে, শাসনতন্ত্র বাতিল করা হয়েছে, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং রাজনৈতিক তৎপরতাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে ইয়াহইয়া খান চীপ মার্শাল ল'এডমিনিস্ট্রেটর হন এবং প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব তাঁর নিজ হাতে তুলে নেন।

শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ

১৯৬৯ সালের ২৫মার্চ জেনারেল ইয়াহইয়া খানের মার্শাল ল' জারির সপ্তাহ খানেক পর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা চৌধুরী রহমত ইলাহীর এক টেলিগ্রাম পেলাম। তাতে তিনি জানিয়েছেন যে, "বর্তমান পরিস্থিতিতে জামায়াতের করণীয় সম্পর্কে আমীরে জামায়াতের হেদায়াত পৌঁছাবার জন্য আমি অমুক তারিখে ঢাকা পৌঁছতে চাই। আমি শেখ মুজিবের সাথেও দেখা করা জরুরি মনে করি। আপনি তাঁর সাথে সাক্ষাতের সময় নিয়ে রাখবেন।"

www.pathagar.com

আমি ফোনে শেখ সাহেবের সাথে সরাসরি কথা বললাম। তিনি সাক্ষাতের সময় ঠিক করে দিলেন। আমি চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে যথা সময়ে শেখ সাহেবের ধানমন্ডির ৩২নং বাড়িতে পৌঁছলাম। আমার সাথে জামায়াতের প্রাদেশিক প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি জনাব মুহাম্মদ নুরুযযামানও ছিলেন।

শেখ মুজিব চৌধুরী সাহেবকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে কোলাকুলি করলেন এবং আমাদের দু'জনের সাথে হাত মিলিয়ে ভেতরে খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় তাঁর দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের কাউকে ভেতরে নিলেন না। তিনি আমাদেরকে বসাবার পর চৌধুরী সাহেবের সাথে কথা বলার আগে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আযম সাহেব! আমি যদি জানতাম যে, আবার মার্শাল ল' হবে তাহলে গোলটেবিল বৈঠকে আমার ভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো।' আমি সঙ্গে সঙ্গে এ কথার জওয়াবে কিছুই না বলে চৌধুরী রহমত ইলাহীর সাথে শেখ সাহেবকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। তিনি সময় নিয়ে দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে পাশ কাটিয়ে আমার সাথে কথা শুরু করা সঠিক মনে হয়নি। তাছাড়া তিনি আমার সাথে বাংলায় কথা বলছিলেন, যা চৌধুরী সাহেবের বুঝবার কথা নয়।

চৌধুরী সাহেব পয়লা সৌজন্যমূলক কথা বললেন। শেখ সাহেব কেমন আছেন, বাড়িতে সবাই ভালো আছেন কিনা এজাতীয় কিছু বলার পর চৌধুরী সাহেব জানতে চাইলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে এর পরিণাম কি হবে বলে তিনি ধারণা করেছিলেন। শেখ মুজিব কিছুটা বিব্রত ও উষ্মার ভাব প্রকাশ করে বললেন, 'আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, সামরিক আইন জারি হবে না। উদ্ভূত সঙ্কট নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন, যাতে ৬দফাকে বিবেচনায় এনে কোন ফর্মূরা বের করা যায়। প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করে সেনাপ্রধানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বলে ধারণা ছিল না। সেনাপ্রধান সামরিক শাসন চান না বলেই আমার ধারণা ছিল। আপনারা জানেন যে, জেনারেলরাই দেশটাকে বর্তমান সঙ্কটময় অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে।'

চৌধুরী সাহেব বললেন, আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে গোটা পাকিস্তানে আইন শৃঙ্খলার যে চরম অবনতি হয়েছে তাতে আইয়ুব খান কিছুতেই পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না। এর পরিণতি যা হয়েছে আমরা এরই আশঙ্কা করেছিলাম।' আমি এ সুযোগে বললাম, 'শেখ সাহেব! আপনার মনে থাকার কথা যে, মাওলানা মওদুদী আপনাকে বলেছিলেন, গোলটেবিল বৈঠক সফল না হলে আবার সামরিক শাসনই অনিবার্য হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।'

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'আইয়ুব খান সেনাপ্রধানের হাতে ক্ষমতা তুলে না দিলে ইয়াহইয়াহ খান সামরিক আইন জারি করার সুযোগই পেত না।'

চৌধুরী সাহেব বললেন, 'যা হবার তাতো হয়েই গেলো আপনি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় অন্যতম যুবনেতা ছিলেন, আপনি নিশ্চয়ই চান না যে, পাকিস্তান ভেঙে যাক। সব রাজনৈতিক দলের সাথে দেশ গড়ার ব্যাপারে আপনার চিন্তার সমন্বয় কিভাবে হতে পারে

সে ফর্মুলা আপনাকে বের করতে হবে। অন্য সবাই একদিকে, আর আপনি অন্যদিকে থাকলে সঙ্কটের সমাধান কেমন করে হবে?'

শেখ সাহেব আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। চৌধুরী সাহেব তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেবার জন্য অনেক শুকরিয়া জানালেন। শেখ মুজিব মৃদু হেসে একথা বলে আমাদেরকে বিদায় করলেন, "আমি মনে করি যে, ৬দফা সবাই মেনে নিলে পাকিস্তানের ঐক্য আরও মযবুত হবে।"

ফিরে আসবার সময় গাড়িতেই চৌধুরী সাহেব মন্তব্য করলেন, 'আমি নিশ্চিত হলাম যে, গোলটেবিল বৈঠক চলাকালে সেনাপ্রধানের সাথে শেখ মুজিবের গোপন সাক্ষাতের খবরটি গুজব ছিল না।" (জীবনে যা দেখলাম-৩য় খণ্ড, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃ. ৯২-৯৩)

জাতির উদ্দেশ্যে ইয়াহইয়া খানের দ্বিতীয় ভাষণ

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহইয়া খান ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ৭দফা ঘোষণা করেন । দফাগুলো নিম্নরূপ:

১. পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ (এক ইউনিট) বাতিল করে সাবেক প্রদেশগুলোকে পুনর্বহাল করা হবে।

২. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যা সাম্যনীতি বাতিল করে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' অর্থাৎ জনসংখ্যা অনুপাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩. ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতি কায়েম হবে।

৪. নতুন নির্বাচিত গণপরিষদ ৪মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা সমাপ্ত করে জাতীয় সংসদে রূপান্তরিত হবে।

৫. ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করা যাবে।

৬. শাসনতন্ত্র রচনা ও চালু না করা পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকবে।

৭. ১৯৭০ সালের ১লা অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রেসিডেন্টের বক্তব্যের আলোকে জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে নিম্ন পন্থায় নির্ধারিত হয় :

পূর্ব পাকিস্তান	১৬২ আসন
পাঞ্জাব	৮২ আসন
সিন্ধু প্রদেশ	২৭ আসন
সীমান্ত প্রদেশ	১৮ আসন
বেলুচিস্তান	৪ আসন
কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় এলাকা	৭ আসন
সর্বমোট	**৩০০ টি আসন**

প্রাদেশিক পরিষদ

পূর্ব পাকিস্তান - ৩০০টি আসন

পাঞ্জাব	১৮০ আসন
সিন্ধু প্রদেশ	৬০ আসন
সীমান্ত প্রদেশ	৪০ আসন
বেলুচিস্তান	২০ আসন
সর্বমোট	**৩০০টি আসন**

উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা হওয়ার কারণে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন পিছানো হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ ডিসেম্বর। ১২ নভেম্বর উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলে প্রলয়ংকরী সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ার কারণে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদ বিনষ্ট হয়। কোন কোন মহল থেকে আবারো নির্বাচন পিছানোর দাবি উঠে। তবে আর নির্বাচন পিছানো হয় নি।

'৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে দেশ নির্বাচনমুখী হয়

১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে দেশে আবার রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হয়। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হওয়ায় প্রতিটি দল নির্বাচন কেন্দ্রিক তৎপরতা শুরু করে। জামায়াত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত জনগণকে অবহিত করার জন্য ১৯৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারি প্রশাসনের অনুমতি দিয়ে ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য আমীরে জামায়াত সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী রাখবেন এ ঘোষণা সম্বলিত পোস্টারিং ও মাইকিং করা হয়। জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগে। ১৭ জানুয়ারি সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসে অবতরণ করলে তাঁকে ব্যাপক সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। ঐদিন রাতে তিনি হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠানরত পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মী সম্মেলন স্থলে এক সুধী সমাবেশে ভাষণ দেন। আনুষ্ঠানিক দাওয়াত না দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত সুধী মাওলানার বক্তব্য শুনার জন্য সমাবেশে হাজির হন। ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মীরা নিজেদের আসন ছেড়ে দিয়ে সুধীদের বসার জায়গা করে দেয়। সমাবেশ শেষে মাওলানা শহীদ আব্দুল মালেক স্মৃতি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। এসময় মাওলানার সাথে ছিলেন পাকিস্তান ইসলমী ছাত্র সংঘের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও বিচারপতি এ.কে.এম. বাকের।

১৮ই জানুয়ারি বিকাল ২টার সময় পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভার কাজ আরম্ভ হয়। জনসভায় জনতার ঢল নামলো। ঘন্টাখানেক সময়ের মধ্যে পল্টন ময়দান কানায়

কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তখনও হাজার হাজার লোক পল্টনের দিকে আসছিল। এ সময় কয়েকটি ট্রাকে করে ভাড়াটে গুন্ডাবাহিনী তখনকার জিন্নাহ অ্যাভিনিও (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিও) এলাকায় এসে নামলো এবং ট্রাকে করে আনা ইটের টুকরা দিয়ে জনসভায় হামলা চালালো। হামলায় নেতৃত্ব দান করে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খান। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের পরিকল্পনা ও নির্দেশে এ হামলা পরিচালিত হয়। জনসভা পন্ড করার জন্য তখনকার সময়ে ২লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিল আওয়ামী লীগ। জনসভার চর্তুদিকের রাস্তা আওয়ামী লীগের গুন্ডাদের দখলে থাকায় মাওলান মওদুদীর সমাবেশস্থলে আসা সম্ভব হয়ে উঠে নি। ঐ দিনের এ হামালায় জামায়াত কর্মী আব্দুল আওয়াল ও আব্দুল মাজেদ শাহাদাত বরণ করেন এবং প্রায় ২হাজার জামায়াত কমী আহত হন। উল্লেখ্য যে, এ সময় ঢাকার জেলা প্রশাসক ছিলেন একজন কাদিয়ানী। তাঁর ইঙ্গিতে প্রশাসন যন্ত্র হামালাকারীদের পক্ষালম্বন করে। উল্ল্যেখ যে, এ জনসভায় জামায়াতের সিলেট অঞ্চলের প্রায় সব নেতা ও কর্মী এবং ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সদস্য ও কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা মওদুদীর পূর্ব পাকিস্তানে সর্বশেষ সফর

১৯৭০ সালের ২৮শে জুন মাওলানা মওদুদী ঢাকায় আসেন এবং জামায়াতের পার্লামেন্টারী বোর্ডের মিটিং এ সভাপতিত্ব করেন। ঐ বৈঠকে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য জামায়াতের নমিনীর তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। সমগ্র পাকিস্তানে ১৫০জন নমিনী বাছাই করা হয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতের জাতীয় পরিষদে ৮৭জন নমিনী ছিলেন । উল্লেখ্য এ সফরই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে মাওলানা মওদুদীর জীবনের সর্বশেষ সফর।

'৭০ এর নির্বাচনে সিলেট অঞ্চলে জামায়াতের নমিনীবৃন্দ

'৭০ এর নির্বাচনে সিলেট অঞ্চলে জামায়াতের পক্ষ থেকে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে যারা অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন

১. জনাব সামসুল হক
২. জনাব নূরুযযামান
৩. এডভোকেট আব্দুল জালাল চৌধুরী

প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যারা অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন :

১. জনাব এডভোকেট আব্দুল মুকিত
২. জনাব আব্দুল হাকিম তাপাদার
৩. জনাব ফজল আহমদ চৌধুরী
৪. এডভোকেট ফখরুল হাসান
৫. এডভোকেট আব্দুল মতিন
৬. মৌলভী ফজলুর রহমান

www.pathagar.com

৭. মাস্টার কামরুল ইসলাম
৮. মাওলানা গৌছ উদ্দীন আব্দুর রব
৯. জনাব আনিসুর রহমান মোক্তার
১০. জনাব আব্দুস সাত্তার
১১. জনাব খলিলুর রহমান
১২ মাওলানা ইসমাইল রাইয়াপুরী
১৩. জনাব আব্দুল্লাহ বানিয়াচঙ্গী
১৪. এডভোকেট তাজুল ইসলাম

জনাব সামসুল হক কানাইঘাট-জকিগঞ্জ-বিয়ানীবাজার আসন থেকে, জনাব নূরুযযামান সিলেট সদর-গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর আসন থেকে এবং এডভোকেট আব্দুল জালাল চৌধুরী কুলাউড়া আসন থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচন করেন।

এডভোকেট আব্দুল মুকিত সিলেট সদর আসন থেকে, জনাব আব্দুল হাকিম তাপাদার বিয়ানী বাজার গোলাপগঞ্জ আসন থেকে, জনাব ফজল আহমদ চৌধুরী জকিগঞ্জ আসন থেকে, এডভোকেট ফখরুল হাসান জৈন্তাপুর গোয়াইনঘাট আসন থেকে, মৌলভী ফজলুর রহমান বালাগঞ্জ-বিশ্বনাথ আসন থেকে, এডভোকেট আব্দুল মতিন ছাতক আসন থেকে, মাস্টার কামরুল ইসলাম সুনামগঞ্জ সদর আসন থেকে, মাওলানা গৌছ উদ্দীন আব্দুর রব বড়লেখা আসন থেকে, জনাব আনিসুর রহমান মোক্তার কুলাউড়া আসন থেকে, জনাব আব্দুস সাত্তার মৌলভীবাজার সদর আসন থেকে, জনাব খলিলুর রহমান রাজনগর আসন থেকে, মাওলানা ইসমাইল রাইয়াপুরী নবীগঞ্জ আসন থেকে, জনাব আব্দুল্লাহ বানিয়াচঙ্গী বানিয়াচঙ আসন থেকে, এডভোকেট তাজুল ইসলাম বাহুবল-চুনারুঘাট আসন থেকে প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

তৎকালীন সময়ে জামায়াতের এ অঞ্চলের রুকনবৃন্দ

'৭০ এর নির্বাচন পর্যন্ত সিলেট অঞ্চলে জামায়াতের যারা রুকন ছিলেন তাঁরা হলেন :

ক্র. নং	নাম	বাড়ি	অবস্থান	মন্তব্য
০১	জনাব সামসুল হক	কানাইঘাট	সিলেট শহর	
০২	হাফিজ মাওলানা লুৎফর রহমান	কানাইঘাট	সিলেট শহর	
০৩	জনাব আজির উদ্দীন আহমদ	শেখ ঘাট	সিলেট শহর	
০৪	মাওলানা আব্দুর নূর	হরিপুর/খাজাঞ্চী /লাউয়াই	সিলেট শহর	

www.pathagar.com

০৫	মাওলানা মুকাররম আলী	বিয়ানী বাজার	সিলেট শহর	
০৬	জনাব সিরাজুল ইসলাম	জগন্নাথপুর	সিলেট শহর	
০৭	মাস্টার আব্দুর রাজ্জাক	গোলাপগঞ্জ	সিলেট শহর	
০৮	মাওলানা মনিরুজ্জামান (ইসলামাবাদী)	চুনারুঘাট	সিলেট শহর	
০৯	জনাব হরমুজ আলী	উমাইর গাঁও	উমাইর গাঁও	
১০	মাস্টার মইনউদ্দীন	উমাইর গাঁও	উমাইর গাও	
১১	জনাব ছমির উদ্দীন	উমাইর গাঁও	উমাইর গাও	
১২	মাওলানা আব্দুল হাই	দলইর গাঁও	উমাইর গাও	
১৩	মাওলানা এখলাছুল মুমিনিন	গোলাপগঞ্জ	গোলাপগঞ্জ	
১৪	জনাব আব্দুল হাকিম তাপাদার	বিয়ানীবাজার	বিয়ানীবাজার	
১৫	মাওলানা আতাউর রহমান খান	বালাগঞ্জ	বালাগঞ্জ	
১৬	মাস্টার মুদাচ্ছির আলী	জকিগঞ্জ	জকিগঞ্জ	
১৭	মাস্টার সালাহউদ্দীন খাদেম	আখাউড়া	ফেঞ্চুগঞ্জ	
১৮	অধ্যাপক মো. ফজলুর রহমান	বিনয়ানীবাজার	ফেঞ্চুগঞ্জ	
১৯	মাস্টার বশির আহমদ	বড়লেখা	বড়লেখা	
২০	এডভোকেট আব্দুল জালাল চৌধুরী	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	
২১	জনাব আনিসুর রহমান মোক্তার	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার	
২২	সাংবাদিক বুরহান উদ্দীন খান	সিলাম	মৌলভীবাজার	
২৩	ডা. করম আলী	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২৪	জনাব আজির উদ্দীন নাযির	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২৫	এডভোকেট আব্দুল মতিন	ছাতক	সুনামগঞ্জ	
২৬	মাওলানা সিরাজুল ইসলাম	জামালগঞ্জ	সুনামগঞ্জ	
২৭	অধ্যাপক মাওলানা সাইয়্যেদ একরামুল হক	জগন্নাথপুর	হবিগঞ্জ	

রুকনদের মধ্যে '৭০এর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জনাব সামসুল হক, জনাব এডভোকেট আব্দুল জালাল চৌধুরী, জনাব এডভোকেট আব্দুল মতিন, জনাব আব্দুল হাকিম তাপাদার ও জনাব আনিসুর রহমান মোক্তার। অবশ্য জনাব নূরুযযামানও রুকন

www.pathagar.com

ছিলেন। তাঁর বাড়ি গোয়াইনঘাট আর তিনি অবস্থান করতেন ঢাকা শহরে। তিনি জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক শাখার প্রচার সম্পাদক ছিলেন।

অবশিষ্ট রুকনগণ যারা প্রার্থী ছিলেন না তাঁরা জানপ্রাণ দিয়ে জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেন। উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক মো.ফজলুর রহমান ঢাকায় রুকন হন। তিনি জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী শাখার ১৯৬৯-'৭০ সেশনে সমাজকল্যাণ বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ঢাকায় অধ্যাপক গোলাম আযমের নির্বাচনী কর্মী হিসেবে সেখানে কাজ করেন। '৭০এর শেষ দিকে সিলেটে চলে আসেন। এ সময় ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবর্গ জামায়াত প্রার্থীদের পক্ষে বি শেষ ভূমিকা রাখেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন: সাইয়্যেদ শাহজামাল চৌধুরী, মাওলানা ফরীদউদ্দীন চৌধুরী (পরবর্তীতে এম.পি.) ব্যারিষ্টার আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক আব্দুল মুসাওয়্যির, ডা.শাহ মাহবুবুস সামাদ, হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ, শাহাবুল আম্বিয়া, মো.ওমর আলী, আব্দুল মালিক, আব্দুল খালিক, আব্দুস সামাদ আরিফ, ফরিদ আহমদ রেজা, আলী আকবর, শরীফ আব্দুল কাদির, নজরুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল মতিন, মাওলানা নুরুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুর রউফ, আ. মজিদ চৌধুরী বাবুল, মাওলানা মাহবুব আহমদ এহিয়া, মাওলানা কুদরতে ইলাহ, হাফিজ আলা উদ্দীন, মাওলানা আলতাফুর রহমান ও বদরুল ইসলাম।

সুনামগঞ্জের যারা ভূমিকা রাখেন তাঁরা হলেন: আজিজুর রশীদ চৌধুরী, জুয়েল চৌধুরী, শাহনুর চৌধুরী, সামসুল আলম।

হবিগঞ্জের যারা ভূমিকা রাখেন তাঁরা হলেন: এড.আব্দুশ শহীদ ও জহুর আলী।

মৌলভীবাজারের যারা ভূমিকা রাখেন তাঁরা হলেন: সিরাজুল ইসলাম মতলিব, সৈয়দ আবুল কালাম আযাদ, আব্দুল হক (পরবর্তীতে এডভোকেট) আব্দুল মুকিত, মাহমুদ আলী, মোহাম্মদ মুজাহিদ, সাইয়্যেদ আব্দুল বারী, সামসুল হোসাইন তরফদার প্রমুখ।

এ সময় জামায়াতের কর্মী হিসেবে যারা বিশেষ ভূমিকা রাখেন তাঁরা হলেন: জনাব আলা উদ্দীন আতহার আলী (ঝেরঝেরী পাড়া), সিরাজুল ইসলাম (শেখ ঘাট), তাহির আলী (শেখ ঘাট), হাজী ওয়ালী উল্লাহ (শেখ ঘাট), ফটিক মিয়া(রায়নগর) আব্দুর রাজ্জাক (রায়নগর), আব্দুল জলিল (রায়নগর) রুস্তম মিয়া (রায়নগর), মুহিবুর রহমান (রায়নগর), মাহমুদ মিয়া (রায়নগর), মদরিছ আলী, চুনু মিয়া, সফু মিয়া (সোনারপাড়া), আইয়ুব আলী (কালিগঞ্জ), কালা মিয়া (সোনার পাড়া), চাঁন মিয়া (সোনারপাড়া), হামীদ বক্স মুহিন (সোনার পাড়া), আব্দুস সত্তার তোতা মিয়া, মাহমুদুর রহমান (রায়নগর), আবুল লেইছ (তেররতন), আব্দুল জালাল (রায়নগর), মুজিবুর রহমান (রায়নগর), কুতুব উদ্দীন (হাওয়া পাড়া), নুর মিয়া (লোহারপাড়া), দক্ষিণ সুরমার হাজী নুর উদ্দীন, ছিকন্দর গাজি ও তজম্মুল আলী জায়গীরদার (কাঁচা মিয়া) ও জিল্লুল হক মোক্তার এবং দরগাহ মহল্লার মুহূরী বোরহান উদ্দীন।

www.pathagar.com

১৯৭০ এর নির্বাচনে হাজী হায়াত উল্লাহ্ সাহেবের অবদান

শেখ ঘাটের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী এবং প্রভাবশালী ইসলামী ব্যক্তিত্ব হাজী হায়াত উল্লাহ সিলেটে জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু হবার প্রথম দিক থেকেই সুধী হিসেবে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। '৭০ এর নির্বাচনে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এ সময় গোটা দেশের আবহাওয়া আওয়ামী লীগের পক্ষে। তখন আওয়ামী লীগের বাইরে অন্যান্য দলের নির্বাচনী প্রচারণায় কাজ পরিচালনা করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের বাইরে অন্য দলও নির্বাচন প্রার্থী কোন জনসভার আয়োজন করলেই তাদের বিরোধিতাঁর সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সময় প্রশাসনের পর্যাপ্ত সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হয় নি, কারণ প্রশাসনে আওয়ামী সমর্থক প্রচুর লোক ছিল। এরা কোন রকম সহযোগিতা করত না। এ রকম পরিস্থিতিতে সিলেট শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে জামায়াতের উদ্যোগে কোন জনসভার আয়োজন করলে হাজী হায়াতুল্লাহ তাঁর নিজস্ব ট্রাক যোগে ২/৩ ট্রাক ভর্তি জামায়াত কর্মী ও সমর্থকসহ নিজে সমাবেশে উপস্থিত হতেন। হাজী সাহেব এবং তাঁর লোকেরা মিটিং এ উপস্থিত হয়ে গেলে পর্যাপ্ত জনসমাগম হয়ে যেত এবং জনসভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সমাপ্ত হত। জনসভায় উপস্থিত শ্রোতাঁরা জামায়াত নেতৃবৃন্দের বক্তব্য মনযোগ সহকারে শুনতেন। তাঁরা স্বীকার করতেন জামায়াত নেতৃবৃন্দের বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ। জামায়াতের প্রার্থীগণ সৎ ও যোগ্য, কিন্তু তাঁরপরও তাদের সমর্থন অন্যদিকে এটা উপলব্ধি করা যেত।

এ সময় জামায়াতের পূর্বপাক সেক্রেটারী অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় সফর করেন এবং জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সকল নির্বাচনী এলাকায় সফর করেন। তিনি সিলেট অঞ্চলেরও বিভিন্ন জনসভায় নির্বাচনী বক্তব্য রাখেন। গোটা প্রদেশ সফর করে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয় তা তিনি এভাবে তুলে ধরেন ঃ

আমি প্রায় সব আসনে গিয়েছি এবং নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা করেছি। জনসভাগুলোতে যথেষ্ট লোক সমাগম ছিলো। সভার শেষভাগে এলাকার গণ্যমান্য লোকদের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থাও করা হতো। প্রায় সর্বত্রই বৈঠকেই উপস্থিত লোকদের পক্ষ থেকে একই রকম মন্তব্য শুনেছি। মন্তব্যের সারকথা একই, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি যাই হোক। আপনার বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। যে উদ্দেশ্যে আমরা ভারত থেকে পৃথক হলাম, সে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে জামায়াতকেই ভোট দেওয়া উচিত। আপনাদের প্রার্থীতো সব দিক দিয়ে অন্যান্য দলের প্রার্থীর চেয়ে বেশি উপযুক্ত। কিন্তু আপনাদের দলের প্রধান পশ্চিম পাকিস্তানি । আপনাদেরকে ভোট দিলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমেই থেকে যাবে। এবার আমাদের নির্বাচনী টার্গেট হওয়া উচিত কেন্দ্রে পূর্ব পাকিস্তানী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে দেশের কর্তৃত্ব থাকায় সর্বদিক দিয়ে আমরা পেছনে পড়ে আছি। জাতীয় সংসদে পূর্ব পাকিস্তানের আসন সংখ্যা বেশি হওয়ায় কেন্দ্রে পূর্ব

www.pathagar.com

পাকিস্তানি নেতৃত্ব কায়েমের সুযোগ এসেছে। এবারকার নির্বাচনে আমাদেরকে এ সুযোগটা নিতে দিন। আমরা এ নির্বাচনে আমাদের অধিকার আদায় করে নিই। ভবিষ্যতে আপনাদের মতো লোকদেরকে নির্বাচনে আমরা প্রাধান্য দেবো। কিন্তু এ নির্বাচনে আমাদেরকে ক্ষমা করুন।" (জীবনে যা দেখলাম-৩য় খণ্ড, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃ.নং ১০৮)

নির্বাচনী জনসভায় আওয়ামী লীগের কর্মীবাহিনী প্রায়ই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। যেখানে স্থানীয় প্রভাবশালী লোকদের কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না সেখানে অধ্যাপক গোলাম আযম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলতেন 'শেখ সাহেব! আপনার দলের কর্মীদেরকে রাজনৈতিক আচরণ শিক্ষা দিন। যদি তাদেরকে গুন্ডামী করে অন্য দলের সভা ভাঙা থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারেন, তাহলে একদিন আপনার সাথেও তাঁরা বেতমিযি করবে। এদেরকে সংশোধন করতে না পারলে আপনি শান্তিতে দেশ পরিচালনা করতে পারবেন না। এ জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল লোকদের সহযোগিতা নিয়ে হয়তো ক্ষমতায় যেতে পারবেন; কিন্তু দেশ শাসন করতে পারবেন না। আর যাই করা যাক গুন্ডা দিয়ে শাসন করা যায় না।'

(জীবনে যা দেখলাম-৩য় খণ্ড, অধ্যাপক গোলাম আযম, পৃ.নং ১০৯)

অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের এ ভবিষ্যতবাণী পরবর্তী পর্যায়ে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে।

নির্বাচনী ফলাফল

নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২ আসনের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ লাভ করে ১৬০টি আসন। বাকি দুটি আসনের মধ্যে একটিতে জনাব নুরুল আমীন তাঁর নির্বাচনী এলাকা ময়মনসিংহ থেকে এবং অপরটিতে রাজা ত্রিদিব রায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে পাস করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর পিপুলস পার্টি লাভ করে ৮৮টি আসন। এছাড়া কাইয়ুম মুসলিম লীগ ৯টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ৭টি, ন্যাপ ৭টি, জমিয়রত উলামায়ে ইসলাম ৭টি, জামায়াতে ইসলামী ৪টি, কনভেনশন মুসলিম লীগ ২টি এবং মারকাজী উলামা পার্টি ৭টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে। জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাওলানা আব্দুর রহমান ফকীর বগুড়ার প্রাদেশিক আসনে জয়লাভ করেন।

নির্বাচনের পর রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় কিভাবে হয় তা এ পুস্তকের প্রথম দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
সিলেটে মুসলিম শাসনের ইতিকথা

১৯৪৭ পূর্বে অবিভক্ত ভারতে সিলেট ছিল আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। আসাম প্রদেশের বেশির ভাগ এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ শহর যেমন গৌহাটি, শিলং, চেরাপুঞ্জি, কামরূপ, কাছাড় সবই বর্তমানে স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এমনকি সিলেটের অন্যতম মহকুমা হেডকোয়ার্টার করিমগঞ্জ এবং থানা হেডকোয়ার্টার ও গুরুত্বপূর্ণ শহর বদরপুর, রাতাবাড়ি, পাথারকান্দি, শিলচর ইত্যাদি স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই আছে। ভারতের পতাঁরাই তাদের জাতীয় পতাঁরা। ভারতীয় কুফরী জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম' ও 'জয়জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা' তাদের জাতীয় সংগীত। ধর্ম নিরপেক্ষবাদ ও সমাজতন্ত্র তাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ। ভারতে ইসলামী, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন আছে কিন্তু ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। হিন্দু মুসলিম রায়ট সেখানকার নিত্য দিনের ঘটনা। মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মাণ করা ভারতীয়দের নৈতিক অপরাধের আওতায় পড়েনা। মুসলমান সেখানে মাইনরটি। রাষ্ট্রীয় বা সরকারি কাজে মুসলমানদের উপস্থিতি খুবই নগণ্য। যদিও মন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি হিসেবে কয়েকজন মুসলমানের নাম শুনা যায়। এরা নামে মুসলমান বাস্তবে তাঁরা ইসলাম থেকে অনেক দূরে। মরার পর তাদের অনেকের মরদেহ দাহ করা হয়। করিম চাগলার মরদেহ দাহ করার ঘটনা সবার জানা আছে।

আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে সিলেটও ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবার কথা ছিল। অথচ সিলেট প্রথমে পাকিস্তানের অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল। কি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যার কারণে সিলেট তাঁর অংগহানী করেও আসাম তথা ভারতের আওতা থেকে বের হয়ে এসে প্রথমে পূর্ব পাকিস্তানের অতঃপর স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হল। এ বিষয়ে অবগত হতে হলে সিলেটের অতীত ইতিহাসের উপর কিছু আলোকপাত করা দরকার। অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

সিলেটের ভৌগলিক অবস্থান

বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সিলেট বিভাগ। এর বর্তমান আয়তন ৪৯১২ বর্গমাইল। অথচ ১৯৪৭-এর আগে সিলেটের আয়তন ছিল ৫৪৪০ বর্গমাইল। সিলেটের উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে খাসিয়া, জৈন্তা ও গারো পাহাড়, পূর্বে ভারতের করিমগঞ্জ ও কাছাড় জেলা। দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এর পশ্চিমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা।

২৩°৫৯ থেকে ২৫°১৩ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯০°৫৪ থেকে ৯২°২৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে সিলেটের অবস্থান। এ অঞ্চলে জেলা সংখ্যা মোট ৪টি যথা:সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ।

www.pathagar.com

ভূ-প্রকৃতি :

সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ পাহাড়ী এলাকা। মধ্যভাগ সমতল ভূমি। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল ভাটি ও হাওর এলাকা। ঐতিহাসিকদের অনুমান ৭ম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিলেটের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল বঙ্গোপসাগরের সাথে সাগর হিসেবে সংযুক্ত ছিল। আস্তে আস্তে পলি ভরাট হয়ে জনবসতি গড়ে উঠেছে। তবে এখনও এ অঞ্চলে বহু হাওর ও বিলের অস্তিত্ব আছে।

নামকরণ :

এ অঞ্চল ছিলট, সিলেট, সিলহট, শ্রীহট্ট ও জালালাবাদ নামে পরিচিত। চীন দেশীয় বৌদ্ধ পন্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাং মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। তিনি কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মার আমন্ত্রণে কামরূপ ভ্রমণ করেন। এ সময় সিলেট ছিল কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে সিলেট ভ্রমণ করেন। তাঁর লিখিত ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়া যায় সিলেটের নাম 'শিলা চটলো'। আরো এক বর্ণনায় পাওয়া যায় 'শিলি চাতল'। হিউয়েন সাঙ সিলেটের বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন'শিলা চটলো' সমুদ্রতীরে অবস্থিত এর চতুর্দিকে পাহাড় ও বনজঙ্গল। প্রখ্যাত মুসলিম মনীষী ও পরিব্রাজক আলবেরুনী একাদশ শতাব্দীতে তাঁর রচিত 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থে সিলেটকে 'সিলাহেত' উল্লেখ করেছেন। মরোক্কর অধিবাসী প্রখ্যাত মুসলিম পরিব্রাজক ইবনে বতুতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে সিলেট আসেন এবং হযরত শাহজালাল (র) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি 'নহরে আজরাক' (সুরমা নদী) দিয়ে নৌপথে সিলেট আসেন। 'হট্টনাথের পাচালী' গ্রন্থে সিলেটকে 'শ্রীহট্ট' উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল (রহ) স্মৃতি জড়িয়ে সিলেটকে 'জালালাবাদ'ও বলা হয়।

সিলেটে মুসলিম শাসন

হযরত শাহজালাল (রঃ), ছিকন্দরগাজী ও সিপাহসালার নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বে তাদের বাহিনী ১৩০৩ সালে সিলেটের শেষ হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট জয় করেন এবং এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। হযরত শাহজালাল (র) এর সিলেট আগমনের পূর্বে সুরমা নদীর পারে টুলটিকর এলাকায় শেখ বুরহান উদ্দীন (র) পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করতেন। তাঁর কয়েকজন মুসলিম প্রতিবেশী ছিলেন যারা পরিবার-পরিজনসহ অত্র এলাকায় বসবাস করতেন । এমনিভাবে এই সময়ে হবিগঞ্জের (তরফের) চুনারুঘাট থানার কাজিরখিল গ্রামে কাজী নুর উদ্দীন নামে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান সপরিবারে বসবাস করতেন। তাঁর প্রতিবেশীদের অনেকেই মুসলমান ছিলেন। সমসাময়িক সময়ে হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জ থানার জলসুখা এলাকায় মুসলমানদের বসবাস ছিল বলে সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা যায়।

উপরিউক্ত মুসলমানগণ ধর্মান্তরিত মুসলমান না বংশপরম্পরায় মুসলমান? তাঁরা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা না অস্থায়ী বাসিন্দা, না অন্যকোন এলাকা থেকে এসে এখানে

www.pathagar.com

বসবাস শুরু করেন এ সংক্রান্ত কোন ঐতিহাসিক দলিল পাওয়া যায় নি। অনুমান নির্ভর দু'টো তথ্যসূত্র থেকে তাদের ব্যাপারে কিছু তথ্য প্রদান করা হচ্ছে :

১. খ্রিস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরব মুসলমান ব্যবসায়ীগণ চট্টগ্রাম, সিলেট, কামরূপ, আসাম হয়ে চীন পর্যন্ত ব্যবসা করেছেন-এটা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। ব্যবসায়ীগণ এ অঞ্চল থেকে হাতির দাঁত, চন্দনকাঠ, সুগন্ধি ইত্যাদি পণ্য সংগ্রহ করতেন। মুসলিম ব্যবসায়ীগণ শুধু ব্যবসাই করতেন না, তাঁরা ধর্মপ্রচারেও আত্মনিয়োগ করতেন। তাদের ধর্ম প্রচারের কারণে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনে মুসলিম বসতি গড়ে উঠে। তাদের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম, আরাকান ও চীনে মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়। চট্টগ্রাম থেকে চীনে যাবার রাস্তা ছিল। চট্টগ্রাম থেকে মেঘনা নদী উজায়ে আজমিরিগঞ্জের জলসুখা হয়ে সুরমা নদী দিয়ে কামরূপ হয়ে চীন। তখন জাহাজে কোন ইঞ্জিন ছিল না বিধায় জাহাজ পাল খাটিয়ে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে অগ্রসর হতেন। ব্যবসায়ীগণ সাথে মেয়ে লোক আনতেন না। তাঁরা যেখানে অবতরণ করতেন সেখানে ধর্মপ্রচার করতেন। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের সাথে তাদের অনেকে পারিবারিক সম্পর্কও স্থাপন করেছেন। তাদের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ নিজস্ব এলাকায় থেকে গেছেন। এভাবে বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম বসতি গড়ে উঠে। সিলেট, চুনারুঘাটে ও আজমিরিগঞ্জে এভাবে মুসলিম বসতি গড়ে উঠতে পারে।

২. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ সালে বঙ্গ বিজয় করেন। কয়েক বছর পর কামরূপ জয়ের উদ্দেশ্যে বখতিয়ার খলজি মুসলিম সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁরা নৌপথে আজমিরিগঞ্জ হয়ে বানিয়াচঙ্গের দিকে অগ্রসর হন এবং বানিয়াচঙ্গ জয় করেন। কিছু লোক এ সমস্ত এলাকায় থেকে যান এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এরাই হযরত শাহজালাল (র) কর্তৃক সিলেট বিজয়ের আগের বাসিন্দা।

হযরত শাহজালাল (র) এর সিলেট আগমনের প্রেক্ষাপট

টুলটিকর মহল্লায় বসবাসরত শেখ বুরহান উদ্দীন একপুত্র সন্তান লাভ করেন। সন্তান লাভে খুশি হয়ে তিনি ইসলামী রীতি অনুযায়ী নবজাত পুত্রের আকিকা উপলক্ষে একটি গরু জবাই করেন। টুলটিকর এলাকা তৎকালীন গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌড়ের রাজা গোবিন্দের রাজত্বে গরু হত্যা নিষিদ্ধ ছিল।আকিকা উপলক্ষে গরু জবাই খবর গৌড় গোবিন্দের কাছে পৌঁছে যায়। তিনি শেখ বুরহান উদ্দীনকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর নবজাতক শিশুকে হত্যা করেন এবং তাঁর ডান হাত কেটে ফেলেন। মজলুম বুরহান উদ্দীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে উপস্থিত হয়ে সুলতান সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের নিকট গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করেন এবং প্রতিকার দাবি করেন। সুলতান সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ গৌড় গোবিন্দকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে সিকান্দর গাজীর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনী গৌড়-গোবিন্দের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং সোনারগাঁয়ে ফিরে যায়। সুলতান এবার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে সিকান্দর গাজীকে পুনঃআক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। সাথে সিপাহসালার সৈয়দ

নাসিরউদ্দীনকে তাঁর সাথে যাবার জন্য হুকুম প্রদান করেন। এ সময় সুদূর আরব থেকে আগত কামিল দরবেশ হযরত শাহজালাল (র) ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ রাজধানী সোনারগাঁয়ে অবস্থান করছিলেন। তিনি শেখ বুরহানউদ্দীনের নবজাত শিশু হত্যা সংক্রান্ত ঘটনা অবগত হন । তিনি তাঁর ৩৬০ আউলিয়া সহ এ অভিযানে শরীক হন। প্রশ্ন হচ্ছে এ বাহিনী স্থলপথে না জল পথে রাজধানী সোনারগাঁ থেকে সিলেটে আসে?

১৩০৩ সালে সোনারগাঁ থেকে সিলেটে আসার রেলপথের প্রশ্নই উঠেনা-কেননা হযরত শাহজালাল (র) এর সিলেট আগমনের ছয়শত বছর পর ১৯১২ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে সিলেট-ঢাকা রেল সার্ভিস চালু হয়। ঐ সময় মটরগাড়িও ছিল না। পায়ে হেঁটে আসতে হলে পাহাড় জঙ্গল মাড়িয়ে আসা সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া আসার রাস্তায় মেঘনা পার হবার পর মাঝ পথে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য, তাঁরপর তরফ রাজ্য, তাঁরপর ইটা রাজ্য, তাঁরপর কুকি রাজ্য ছিল। এসব রাজ্যের হিন্দু রাজন্যবর্গ স্বাধীন ছিলেন।ফলে তাদের রাজ্য বিনা বাধায় অতিক্রম করে একটা সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ে সিলেট আসা বাস্তবে সম্ভব ছিল না। সুতরাং বিকল্প থাকে নৌপথ। নৌপথে আরব বণিকরা সিলেট পার হয়ে কামরূপ এবং চীন গমন করেন। নৌপথে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সিলেট আসেন। নৌপথে ইবনে বতুতাও সিলেট আসেন। নৌপথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকজন এবং সিলেট জেলার ব্রিটিশ প্রশাসকগণ সিলেট আসেন। সুতরাং হযরত শাহজালাল (র) ও তাঁর সঙ্গীসাথী এবং ছিকন্দর গাজী ও সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের বাহিনী নৌপথে মেঘনা নদী উজায়ে সুরমা নদী দিয়ে আজমিরিগঞ্জ, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও ছাতক হয়ে সিলেট এসেছিলেন এটাই স্বাভাবিক এবং বাস্তবসম্মত। তাদের সাথে শেখ বুরহান উদ্দীনসহ গাইড ও গুপ্তচর থাকা স্বাভাবিক।

এ সময় সিলেট শহরের তোপখানা, তালতলা, জল্লারপার, হাওয়াপাড়া, তাঁতীপাড়া এবং তদসংলগ্ন এলাকা জলাশয় ছিল। তখন নদী বন্দর ছিল চালিবন্দর। হযরত শাহজালাল (র)এর বাহিনী চালিবন্দরের আগে শেখঘাট এলাকায় জাহাজ থেকে অবতরণ করেন এবং রিকাবীবাজার ও আম্বরখানা হয়ে গৌড়গোবিন্দের রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ অতর্কিত ঘেরাও করেন। উপায়ন্তর না দেখে গৌড়গোবিন্দ মোকাবিলা না করে সুড়ঙ্গ পথে পেঁচাগড় হয়ে পলায়ন করেন। যে সুড়ঙ্গ পথে গৌড়গোবিন্দ পলায়ন করেন এই সুড়ঙ্গের আংশিক অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। সিলেটের মালনীছড়া চা বাগানে গেলে এ সুড়ঙ্গ পথ আজও দেখা যায়। সুড়ঙ্গ সংলগ্ন মালনীছড়া এলাকাই ছিল গৌড়গোবিন্দের রাজপ্রাসাদ। বর্তমানে যে টিলায় জেলা জজের বাসস্থান অবস্থিত এখানেই ছিল গৌরগোবিন্দের মন্ত্রী মনারায়ের বাসস্থান।

সিলেট বিজয়ের ব্যাপারে দুটি কিংবদন্তী বহুলভাবে প্রচারিত। একটি হল হযরত শাহজালাল (র) ও তাঁর সঙ্গী সাথীগণ জায়নামাজ বিছিয়ে সুরমা নদী পার হয়েছেন। অন্যটি হল হযরত শাহজালাল (র) এর সঙ্গী হযরত শাহচট (রঃ) আযান দেন। আযানের ধ্বনির সাথে সাথে গৌড়গোবিন্দের সাততলা প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যায়। দুটোই বাস্তবের

www.pathagar.com

সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা বাংলার রাজধানী সোনারগাঁ থেকে স্থলপথে সিলেটে আসা সম্ভব ছিল না। বিকল্প রাস্তা নৌপথে নৌযান যোগে আসলে জায়নামাজ বিছিয়ে সুরমা নদী পার হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আসলে জায়নামাজ বিছিয়ে সুরমা নদী পার হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আর আযানের সাথে সাথে সাততলা প্রাসাদ ধ্বংসের প্রশ্ন? ১৩০৩ সালে সিলেট কেন গোটা এশিয়া কিংবা সমগ্র দুনিয়ায় সাততলা ভবনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং গৌড়গোবিন্দের প্রাসাদ সাততলা হবার প্রশ্নই উঠেনা।

সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল (র) প্রথমে 'আকল কুয়ার' পাশে অবস্থান নেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ প্রথমে আশেপাশে বাসস্থান গড়ে তুলেন। পীর মহল্লা আজও তাঁদের স্মৃতি ধারণ করে সগৌরবে বিদ্যমান। উল্লেখ্য, হযরত শাহজালাল (র) এবং ৩৬০ আউলিয়া কেবল দরবেশই ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন মুজাহিদ। তাঁরা তরবারি ব্যবহার করে যুদ্ধ করতে অভ্যস্থ ছিলেন। হযরত শাহজালাল (র)-এর নিজের ব্যবহার করা তরবারী আজও আছে। যে কোন ব্যক্তি তাঁর দরগাহ মসজিদে আসলে খাদিমের কাছে খোঁজ করলে ঐ তরবারী দেখতে পাবেন।

সিলেট বিজয়ের পর সিলেটের শাসক নিযুক্ত হন সিকন্দর গাজী। তিনি হযরত শাহজালাল (র) এর গাইডেন্সে রাজ্যে ইসলামী শাসন চালু করেন। গৌড়গোবিন্দের গোটা রাজত্ব সিকন্দর গাজীর শাসনের আওতায় চলে আসে। গৌড়গোবিন্দের রাজ্যের এলাকা ছিল সম্ভবত বর্তমান সিলেট সদর, দক্ষিণ সুরমা, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও আংশিক বিশ্বনাথ।

অন্যান্য খণ্ড ও সামন্ত রাজ্য

হযরত শাহজালাল (র) যখন সিলেট আসেন তখন গৌড়গোবিন্দের রাজ্য ছাড়াও বৃহত্তর সিলেটে আরো কয়েকটি স্বাধীন খণ্ড ও সামন্ত রাজ্য ছিল। সেগুলো হলো :

১. লাউড়
২. বানিয়াচঙ্গ
৩. জগন্নাথপুর
৪. তরফ
৫. ইটা
৬. প্রতাপগড়
৭. জৈন্তা
৮. পঞ্চখণ্ড- (পঞ্চখণ্ড ঠিক রাজ্য ছিলনা, ৫টি স্ব-শাসিত অঞ্চল ছিল।)

লাউড় রাজ্য

বর্তমান সমগ্র সুনামগঞ্জ জেলা, হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচঙ্গ, সিলেট জেলার আংশিক বিশ্বনাথ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার কিছু অংশ এবং ভারতের মেঘালয় রাজ্যের কিছু অংশের সমন্বয়ে লাউড় রাজ্যের পরিধি ছিল। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল তাহিরপুর

www.pathagar.com

উপজেলার লাউড়ে। লাউড় থেকে দুটো খণ্ড রাজ্য আপোষে সৃষ্টি হয়। একটি হল বানিয়াচঙ্গ অপরটি হল জগন্নাথপুর। লাউড় রাজার মনোনীত ব্যক্তিগণ বানিয়াচঙ্গ ও জগন্নাথপুর শাসন করতেন। লাউড় রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে জগন্নাথপুরের রাজা এবং বানিয়াচঙ্গের রাজার মধ্যে লাউড় দখল নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। বানিয়াচঙ্গের রাজা গোবিন্দ সিংহ প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি লাউড় দখল করেন। রাজ্য নিয়ে বিরোধের সংবাদ দিল্লির মুঘল সম্রাট আকবর পর্যন্ত পৌঁছে । তাঁর কাছে বিচার চাওয়া হয়। গোবিন্দ সিংহকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হাবিব খাঁ নাম ধারণ করেন। সম্রাট আকবরের অধীনতা স্বীকার করে নেন। তাকে লাউড় ও বানিয়াচঙ্গ শাসনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এভাবে লাউড় ও বানিয়াচঙ্গ মুসলিম শাসনের অধীনে চলে আসে। এ ঘটনা ১৫৬৬ খ্রি: সংঘটিত হয়। কিছুদিন পর হাবিব খাঁ জগন্নাথপুর দখল করে নেন। ফলে জগন্নাথপুরও মুসলিম শাসনের অধীনে চলে আসে।

তরফ রাজ্য

বর্তমান হবিগঞ্জ সদর, লাখাই, বাহুবল, নবীগঞ্জ, চুনারুঘাট, মাধবপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল থানা এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ রাজ্য স্বাধীন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এ রাজ্যের বর্তমান চুনারুঘাট থানার কাজিরখিল গ্রামের বাসিন্দা কাজী নূরউদ্দীন পুত্র সন্তান লাভ করেন। পুত্রের আকীকা উপলক্ষে গরুজবাই করলে তরফ রাজা আচাক নারায়ণ ক্রুদ্ধ হয়ে সদ্যজাত শিশুকে হত্যা করেন। মজলুম কাজী নূর উদ্দীন সিলেট আগমন করে হযরত শাহজালাল (র)এর নিকট অভিযোগ দায়ের করেন। হযরত শাহজালাল (র) এর পরামর্শে সিলেটের শাসনকর্তা সিকন্দর গাজী সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। তরফ রাজা আচাক নারায়ণ ত্রিপুরার রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ত্রিপুরার রাজার কাছ থেকে কোন সাহায্য না আসায় রাজা আচাক নারায়ণ সপরিবারে পালিয়ে যান। ফলে তরফ রাজ্য সিপাহসালার সৈয়দ নাসিরউদ্দীনের দখলে চলে আসে। তিনি রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এভাবে তরফ রাজ্যে ১৩০৪ সালে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে। এ অভিযানে ১২জন আউলিয়া অংশগ্রহণ করায় তরফকে 'বার আউলিয়ার মুল্লুক'ও বলা হয়।

ইটা রাজ্য

বড়লেখা বাদে বর্তমান সমগ্র মৌলভীবাজার জেলা এ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইটা রাজ্যের সর্বশেষ হিন্দু রাজার নাম সুবিদ নারায়ণ। রাজ্যের রাজধানী ছিল রাজনগর। ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে আফগান বীর খাজা ওসমান খাঁ লোহানী যুদ্ধে রাজা সুবিদ নারায়নকে পরাজিত করে ইটা রাজ্য দখল করেন। তিনি 'পতন উষার' নামক স্থানে তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং রাজ্যের নাম রাখেন 'ওসমান গড়'। ১৬১২ সালে খাজা ওসমান মুঘলবাহিনীর সাথে যুদ্ধে সেনাপতি সুজাতখানের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। এভাবে

www.pathagar.com

এ রাজ্য মুঘল শাসনের অধীনে চলে যায়।ওসমান খাঁ কিভাবে ইটা রাজ্যে আসেন তাঁর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ:

১৫৭৬ সালে মুঘল সেনাপতি খান জাহান হোসেন কুলি বেগের সাথে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন রাজা দাউদ কররানী পরাজিত ও নিহত হন। তখন দাউদ কররানীর সেনাপতি কতলু খান আফগানদের রাজা নিযুক্ত হন। কতলু খানের সেনাপতি ছিলেন খাজা ওসমান খাঁ। কতলু খানের পর খাজা ওসমান খাঁ আফগানদের রাজা নির্বাচিত হন। খাজা ওসমান খাঁ মুঘল সেনাপতি কর্তৃক উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে ময়মনসিংহে ঈশা খাঁর সাথে যোগ দেন। তাঁরা মুঘল সেনাপতি মানসিংহকে প্রতিহত করেন। পরবর্তীকালে মুঘল সেনাপতি কামাল কর্তৃকই ময়মনসিংহ থেকে বিতাড়িত হয়ে খাজা ওসমান খাঁ ইটায় আসেন এবং ইটা রাজ্য দখল করেন। এই খাজা ওসমান খাঁই সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ও বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনী'র নায়ক ওসমান।

প্রতাপগড়

বিমান বাহিনীর গ্রুপ কেপ্টেন (অব:) ফজলুর রহমানের লিখিত 'সিলেটের মাটি ও মানুষ' গ্রন্থ সূত্রে আসামের করিমগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশে প্রতাপগড় রাজ্যের অবস্থান। রাজ্যের শেষ হিন্দু রাজা প্রতাপ সিংহ । এ রাজ্যে মির্জা মালিক নামে এক যুবক ভাগ্যান্বেষণে আসেন। তাঁর সাথে রাজকুমারী উমার বিয়ে হয়। তাদের বংশধর সুলতান বাজিদ প্রতাপগড়ের রাজা হন। এভাবে এ রাজ্য মুসলমানদের শাসনে আসে। এ রাজ্য কালক্রমে ঘোর অরণ্য ও পশুর বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। জাতীয় অধ্যাপক সিলেটের কৃতি সন্তান প্রখ্যাত দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন-"বর্তমান ভারতের করিমগঞ্জ জেলার পূর্বাংশ বহুদিন পর্যন্ত কাছাড়ের রাজার অধীনে ছিল। পরবর্তী কালে মির্জা মালিক মোহাম্মদ তুররানী নামে এক তুর্কী সরদার কাছাড়ের রাজাকে পরাজিত করে সে অঞ্চলে একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই রাজ্যই প্রতাপগড় রাজ্য হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করে।"

জৈন্তা রাজ্য

জৈন্তা একটি প্রাচীন রাজ্য। বর্তমান গোয়াইনঘাট কানাইঘাট ও জৈন্তাপুর জৈন্তা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী ছিল নিজপাট। এখানে নিয়মিত নরবলি দেওয়া হত। যে পাথরের উপর নরবলি দেওয়া হত, সে পাথর ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে জৈন্তার রাজবাড়িতে আজও বিদ্যমান। জৈন্তা ছিল মহাভারত যুগে নারী রাজ্য। ১৫০০খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয় খাসিয়া রাজবংশের রাজত্ব। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এ রাজ্য ব্রিটিশদের অধিকারে আসে।

জৈন্তারাজ্যে ইসলাম

"জৈন্তিয়া ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় হযরত শাহজালাল (র)-এর কোন সঙ্গী, ওলী বা দরবেশ ইসলাম প্রচারে গিয়েছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না । অথচ এখানে

অনেক শরীফ সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বসবাস। উপজেলা দুটি মুসলিম প্রধান এলাকা। এর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে ইতিহাসের আলোকে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ:

জয়ন্তিয়া রাজা দ্বিতীয় বড় গোসাঈ রাজত্বকালে (১৭৩১-১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ) সিলেটের মোঘল কর্মচারী দেওয়ান দুর্লভ রাম জয়িন্তয়া রাজ্যের কিছু ভূমি জনসাধারণকে দান করেন অথবা বন্দোবস্ত দেন। এতে জয়ন্তিয়া রাজা ক্ষুব্ধ হয়ে বর্তমান গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণ এলাকা দখল করে নেন। তখন (১৭৪১-'৫৬খ্রি:) নবাব আলীবর্দী খাঁ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি। নবাব আলীবর্দী খাঁ তাঁর জামাতা এবং ভাতিজা ঢাকার শাসনকর্তা নবাব নওয়াজিশ আলী খাঁকে জয়ন্তিয়া রাজাকে শায়েস্তা করার হুকুম দেন।নবাব নওয়াজিশ আলী খাঁর সেনাপতি নওশের আলী খাঁ সিপাই লশকর নিয়ে জয়ন্তিয়া রাজ্য আক্রমণের জন্য সিলেট আসেন। ঐ সময় জয়ন্তিয়া রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় বড় গোসাঈ (১৭৩১-'৭০ খ্রি:)। বড় গোসাঈ নবাবের সেনাবাহিনীর আগমন বার্তা পেয়ে ভয়ে ভীত হয়ে যান। তিনি ঢাকা দক্ষিণের দখল ত্যাগ করে শান্তি প্রার্থনা করেন।মূল্যবান উপহার, উপঢৌকনের সাথে প্রেরণ করেন তাঁর বোন ভৈরব কোয়ারী (কুমারী) কে।নবাব নওয়াজিশ আলী খাঁ রাজকুমারীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে শাদী করেন। রাজকুমারী ভৈরব কোয়ারীর গর্ভে জন্ম হয় নবাব ফতেহ খাঁর। ফতেহ খাঁ (১৭৪১-'৪৮খ্রি:) বড় হলে তাকে পাঠানো হয় লোক লশকর সহ জয়ন্তিয়ায়। খাসিয়াদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজে বিষয় সম্পদের উত্তারাধিকারী হয় বোনের বড় ছেলে। বড় ভাগ্না। রাজা বড় গোসাঈ বোনপো-কে বিশাল সংবর্ধনাসহ জয়ন্তিয়া রাজ্যে বরণ করে নেন। ফতেহ খাঁকে করা হয় জয়ন্তিয়া রাজ্যের প্রধান সেনাপতি। ফতেহ খাঁর পীর কাশেম খাঁও জৈন্তিয়া এসে ইসলাম প্রচার ও বসতি স্থাপন করেন।

ফতেহ খাঁ রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও জনকল্যাণে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি রাজধানী স্থানান্তর, দিঘি খনন ও মসজিদ নির্মাণ করেন। মিনার থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে যায় রাজধানী 'নিজ পাটের' আকাশে বাতাসে। ফতেহ খাঁ'র প্রভাবপ্রতিপত্তি দেখে হিন্দু ও খাসিয়া অমাত্য কর্মচারীরা মনের দুঃখে শিবরাত্রির সলিতাঁর মত জ্বলতে থাকে। তাঁরা রাজার কাছে নালিশ জানায় এই বলে যে, 'মসজিদ থেকে আল্লাহু আকবর . ...আযানের ধ্বনি উচ্চারণের সময় দেবী কালীমাতা ভয়ে কাঁপতে থাকেন। এর প্রতিকার করা না হলে দেব-দেবীর অভিশাপে জয়ন্তিয়া রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে। রাজা বড় গোসাঈ সেনাপতি ফতেহ খাঁকে মসজিদে আযান দেওয়া বন্ধ করার হুকুম করেন। ঈমানের বলে বলীয়ান মোঘল বংশের নওযোয়ান ফতেহ খাঁ রাজার হুকুমে আযান বন্ধ করতে অস্বীকার জ্ঞাপন করেন। রাজার আদেশ অমান্য করার জন্য ফতেহ খাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ভেঙে দেওয়া হয় মসজিদটি। নবাব ফতেহ খাঁর সাথে আগত লোক লশকর, পর্ষদ, অভিজাত শরীফ সম্ভ্রান্ত লোকরা জয়ন্তিয়া, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট এলাকায় ছত্রভঙ্গ হয়ে বসতি স্থাপন করেন।" (সিলেট বিভাগের পরিচিতি, সৈয়দ মোস্তফা কামাল, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০)

www.pathagar.com

পঞ্চখণ্ড

বিয়ানীবাজার উপজেলায় **পঞ্চখণ্ড** পরগণার নিধনপুর গ্রামে **১৯১২** থেকে **১৯২৫** সালের মধ্যে ৬টি তাম্রলিপি পাওয়া যায়। তাম্রলিপিতে দেখা যায় কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মা তাঁর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ভূতিবর্মা কর্তৃক পঞ্চম শতাব্দীতে পাঁচ ব্রাহ্মণের বরাবরে যে ভূমি দান করেছেন, সে দানকৃত ভূমি সপ্তম শতাব্দীতে পুনরায় নবায়ন করেছেন। এ নবায়নকৃত ভূমি কুশিয়ারা নদীর দক্ষিণ তীরে বর্তমান বিয়ানীবাজার উপজেলা, জকিগঞ্জ উপজেলা এবং মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলায় এবং ভারতের করিমগঞ্জ জেলার হাইলাকান্দি এলাকায় এ জমি বিরাজ মান । কামরূপ রাজা পাঁচ ব্রাহ্মণকে পাঁচ খণ্ড জমি দান করেছিলেন। দানকৃত ভূমি 'পঞ্চখণ্ড' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ব্রাহ্মণ ও তাদের উত্তরাধিকারীগণ অত্র এলাকা শাসন করতেন। পঞ্চখণ্ড ছিল ব্রাহ্মণ শাসিত অঞ্চল। **১৬১২** খ্রি: এ অঞ্চল মুঘল শাসনের অধীন হয়। এ অঞ্চলকে স্থানীয়ভাবে মুঘলান বলা হয়।

হযরত শাহজালাল (র) ও তাঁর সঙ্গীদের ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ

সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল (র) প্রশাসনিক কাজ সিকন্দর গাজীর হাতে তুলে দেন। তিনি নিজে এবং তাঁর সঙ্গী ৩৬০ আওলিয়া ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শাহজালাল (র)-এর নির্দেশনায় তাঁর সঙ্গীগণ মুবাল্লিগ হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা এদেশের সাথে পরিচিত ছিলেন না। এ অঞ্চলের আবহাওয়া, পরিবেশ এবং জীবন যাপন পদ্ধতির সাথে তাঁরা অনভ্যস্থ ছিলেন। এ অঞ্চলের ভাষাও তাঁরা জানতেন না। আর রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ মোখালেফ। তথাপি তাঁরা বিভিন্ন স্থানের হিন্দু রাজা ও প্রতাপশালীদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা কোথায় ইন্তেকাল করেছেন এবং তাদের মাজার কোন কোন স্থানে, এ হিসাব দেখলে তাঁরা কোথায় কোথায় মুবাল্লিগের কাজ করেছেন তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হবে। হযরত শাহজালাল (র) এবং তাঁর সঙ্গী ৩৬০ আওলিয়ার মাজারের তালিকা নিচে প্রদান করা হল:

৩৬০ আওলিয়ার মাযার

ক্রমিক	**এলাকার নাম**	**মাযারের সংখ্যা**	**মন্তব্য**
১	সিলেট পৌর এলাকা	৫৩	
২	দক্ষিণ সুরমা উপজেলা	১৭	
৩	বালাগঞ্জ উপজেলা	১২	
৪	সিলেট সদর	৫	
৫	গোলাপগঞ্জ	৩	
৬	কানাই ঘাট	৩	
৭	ফেঞ্চুগঞ্জ	২	
৮	বিয়ানীবাজার	১	
৯	জকিগঞ্জ	১	

www.pathagar.com

মৌলভীবাজার জেলা			
১	মৌলভীবাজার পৌর এলাকা ও সদর	৭	
২	কুলাউড়া	৪	
৩	বড়লেখা	৩	
৪	কমলগঞ্জ	৩	
৫	রাজনগর	১	
সুনামগঞ্জ জেলা			
১	জগন্নাথপুর	৫	
২	ছাতক	২	
৩	তাহিরপুর	১	
হবিগঞ্জ			
১	হবিগঞ্জ সদর	৬	
২	চূনারুঘাট	২	
৩	নবীগঞ্জ	২	
ভারত			
১	করিমগঞ্জের বদরপুর	৩	
২	কাছাড়	১	
৩	চব্বিশ পরগনা	১	ড.মো.শহীদুল্লাহ উনার বংশধর
৪	মেঘালয়	১	
অন্যান্য স্থান			
১	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া	১	
২	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল	১	
৩	কুমিল্লা সদর	২	
৪	নেত্রকোনা	১	
৫	জামালপুর	২	
৬	চট্টগ্রাম	১	
৭	বেলাবো, নরসিংদী	১	

এ সমস্ত স্বনামধন্য আওলিয়া, মুজাহিদ ও মুবাল্লিগদের আত্মত্যাগের কারণে বৃহত্তর সিলেট, ভারতের পূর্বাঞ্চলের কিছু অংশ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের অনেক এলাকা মুসলিম মেজরিটি অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

সিলেটের শাসনকর্তা

সিলেটের প্রথম মুসলিম প্রশাসক সিকান্দরগাজী হযরত শাহজালাল (র) গাইডেন্সে স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৩০৩ থেকে ১৩১২সাল পর্যন্ত তিনি শাসক ছিলেন । তাঁরপর শাসক নিযুক্ত হন হায়দার গাজী। ১৪৪০ সালে সিলেট বাংলার সালতানাতের অধীনে আসে। বাংলার সুলতান সামসউদ্দীন ১৪৪০ সালে মুকাবিল খানকে সিলেটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এ সময় শাসনকর্তার উপাধি ছিল 'ফৌজদার'। ১৪৪০ থেকে ১৬১১ পর্যন্ত বাংলার সুলতানদের নিযুক্ত ফৌজদার দ্বারা সিলেট শাসিত হয়। ১৬১২ খ্রি: সিলেট মুঘল শাসনের অধীনে আসে। এ সময় সিলেটের শাসনকর্তা/ফৌজদার নিযুক্ত হয়ে আসেন মুবারিজ খান। মুঘল আমলের শেষ ফৌজদার ছিলেন মুহাম্মদ আলী খান কাইমজঙ্গ। ১৬১২- ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত সিলেট মুঘল সম্রাটের প্রতিনিধি বাংলার সুবাদারদের দ্বারা নিযুক্ত ফৌজদার কর্তৃক সিলেটের প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হয়। ফৌজদারদের মধ্যে ফরহাদখান খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর অমর কীর্তির মধ্যে সিলেটের শাহী ঈদগাহ ও ফরহাদ খাঁর পুল এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করে। সিলেট ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অধীনে আসে ১৭৬৫ সালে। বিলাতী প্রশাসক সরাসরি সিলেট শাসন করেন ১৭৭১ সাল থেকে। মিস্টার সামনার সিলেটের প্রথম বিলাতী প্রশাসক। তাঁর পদবী ছিল সুপারভাইজার। দ্বিতীয় বিলাতী প্রশাসক মি: থ্যাকারে সিলেট আসেন ১৭৭২ সালে। তাঁর পদবী ছিল রেসিডেন্ট। ১৭৭৮ সালে রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়ে আসেন রবার্ট লিন্ডসে। তিনি Living of Lindsay নামে একটি আত্মজীবনী লিখেন। এই আত্মজীবনী বইতে তৎকালীন সিলেটের প্রায় সব ব্যাপারে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ সময় সিলেটে মান সম্পন্ন সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরি হত। মি:লিন্ডসে ২০খানা সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ করান এবং পর্তুগীজ বণিকদের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করেন। ১৭৯৩ সালে জে.আর নটি সিলেটের প্রশাসক নিযুক্ত হয়ে আসেন। তাঁর পদবী ছিল কালেকটার। ১৮৩১ সালে কালেকটার নিযুক্ত হয়ে আসেন মি:স্টেইন ফোর্স। তাঁর সময় জৈন্তায় রাজা রাজেন্দ্র সিংহ একজন ব্রিটিশ প্রজাকে ধরে নিয়ে কালী দেবীর উদ্দেশ্যে নরবলী দেন। কালেকটার স্টেইন ফোর্স এ অজুহাতে জৈন্তা রাজ্য আক্রমণ করেন। ১৮৩৫ সালে জৈন্তা রাজ্য ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসে। ১৮৭০ সালে সিলেটের প্রশাসক নিযুক্ত হয়ে আসেন মি:সাদারল্যান্ড। তাঁর আমলে ১৮৭২ সালে সিলেট ডিস্ট্রিক বোর্ডের জন্ম হয়। ১৮৭৪ সালে প্রশাসক নিযুক্ত হয়ে আসেন মি: এ.এল.ক্লে । তাঁর উপাধি হয় 'ডেপুটি কমিশনার' বা ডিসি। সেই ১৮৭৪সাল থেকে আজ পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের উপাধি ডিসি বা ডেপুটি কমিশনার।

সিলেটের প্রশাসনিক ক্রমবিকাশ

প্রশাসনের সুবিধার্থে সিলেট জেলাকে পাঁচটি প্রশাসনিক মহকুমায় বিভক্ত করা হয়। ১৮৭৭ সালে সুনামগঞ্জ মহকুমা ১৮৭৮ সালে করিমগঞ্জ ও হবিগঞ্জ মহকুমা এবং ১৮৮২ সালে দক্ষিণ সিলেট বা মৌলভীবাজার মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৪ সালে আসাম

www.pathagar.com

প্রদেশ গঠিত হয়। সিলেট আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯০৫ সালে প্রশাসনের সুবিধার্থে বঙ্গ প্রদেশকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসামকে একত্রিত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়। তখন সিলেটকে চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯১১ সালে হিন্দু সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে বঙ্গভঙ্গ রদ করে পূর্ববঙ্গকে আবার বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন সিলেট আবার আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করার পর এর বিরোধিতা করে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান লিখেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' এ গানই আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। হিন্দুদের বিরোধিতা ও সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ সালে বিলাতের রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতে আসেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। এ সময় কবি রবীঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে মহাখুশিতে ৫ম জর্জকে অভিনন্দন জানিয়ে গান লিখেন "জয় জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা" এ গানই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত সিলেট আসাম প্রদেশের একটি জেলা হিসেবে সংযুক্ত ছিল। '৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হবার পর সিলেট আসাম থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের একটি জেলায় পরিণত হয় এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে বাউন্ডারী কমিশনের অযৌক্তিক ও স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের কারণে সিলেটের অন্যতম মহকুমা করিমগঞ্জকে ভারতের সাথে রেখে দেওয়া হয়। ১৯৮৪ সালে সিলেটের ৪টি মহকুমা যথা সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ প্রশাসনিক আদেশে জেলায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর সিলেটের কৃতীসন্তান তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব এম সাইফুর রহমানের বিশেষ প্রচেষ্টায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার সমন্বয়ে সিলেট বিভাগ ঘোষণা করেন। ১৯৯৫ সালের ১লা আগস্ট সিলেট বিভাগ আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

সিলেট পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ সালে। ২০০১ সালে সিলেট পৌরসভা সিটি কর্পোরেশনে রূপান্তরিত হয়।

সিলেট বিভাগের পৌরসভাসমূহের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় :

ক্রমিক নং	পৌরসভার নাম	প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাল
০১	মৌলভীবাজার	১৮৮৭
০২	হবিগঞ্জ পৌরসভা	১৯১৩
০৩	সুনামগঞ্জ পৌরসভা	১৯১৩
০৪	শ্রীমঙ্গল	১৯৩৫
০৫	জকিগঞ্জ	১৯৯৯
০৬	বিয়ানী বাজার	২০০১
০৭	গোলাপগঞ্জ	

www.pathagar.com

০৮	জগন্নাথপুর	১৯৯৯
০৯	দিরাই	১৯৯৯
১০	ছাতক	১৯৯৭
১১	কুলাউড়া	১৯৯৬
১২	কমলগঞ্জ	১৯৯৯
১৩	নবীগঞ্জ	১৯৯৯
১৪	মাধবপুর	১৯৯৯
১৫	শায়েস্তাগঞ্জ	

সিলেটে ব্রিটিশ বিরোধি আন্দোলন

১৩০৩ সাল থেকে ১৭৬৫সাল পর্যন্ত সিলেট মুসলিম শাসকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের দ্বারা বাংলার স্বাধীনতাঁর সূর্য অস্তমিত হয়। সিলেট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আওতায় আসে ১৭৬৫ সালে। ব্রিটিশরা চতুর জাত। তাঁরা সিলেট দখল নিয়ে প্রথমেই ব্রিটিশ শাসক নিয়োগ করে নি। বরং তাদের নিয়ন্ত্রণে মুসলিম ফৌজদারদের দ্বারা সিলেট শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাদের নিযুক্ত কয়েকজন ফৌজদার হলেন ভিকুখান, হায়দার আলী খান ও আবু তোঁরাব খান। 'সামনার' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত সিলেটের প্রথম ব্রিটিশ শাসক। সিলেটের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে চলে যাবার পর থেকে কিছু সচেতন নাগরিক বিভিন্ন সেক্টরে পরিবর্তন উপলব্ধি করেন। তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। এক পর্যায়ে সিলেট শহরের বাসিন্দা সৈয়দ হাদী ও সৈয়দ মাহদী নামে দুই ভাই স্থানীয় লোকদেরকে সংগঠিত করে ইংরেজদের উৎখাতের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাদের সশস্ত্র প্রস্তুতি চলতে থাকে। অস্ত্র বলতে তাদের হাতে তরবারি ও লাঠি ব্যতীত উন্নত মানের অন্য কিছু ছিল না। তবুও সৈয়দ হাদী ও মাহদী (ডাক নাম হাদা মিয়া ও মাদা মিয়া) স্থানীয় লোকদেরকে সংগঠিত করে ইংরেজ উৎখাত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সিলেট শহরের শাহী ঈদগাহের ঠিক উত্তরের টিলায় ১৭৮২ সালের মহররম মাসে এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। তখন সিলেটের ইংরেজ প্রশাসক ছিলেন রবার্ট লিন্ডসে। রবার্ট লিন্ডসে তাঁর Living of Lindsay নামক এক আত্মজীবনীতে লিখেন। তাঁর বই থেকে এ যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে : 'আমি সিপাহীদের নিয়ে দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে গেলাম । আমার দেশী জমাদারদের হাতে দুটি পিস্তল দিয়ে বললাম, 'আমার সঙ্গে আস। আমার বিপদ দেখলে আমার হাতে পিস্তল দেবে।' আমার ধারণার অতিরিক্ত বিদ্রোহীদের সমবেত দেখে আমি অবাক হলাম। আমাদের আসতে দেখে তাঁরা পিছু হটে এক টিলার উপর শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। তাদের দলে ছিল প্রায় তিনশ লোক।আমি আমার সেপাইদের টিলার নিচে মোতায়েন করলাম। আপোষে মিটমাট সম্ভব কিনা দেখার জন্য আমি আমার দেশী জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে টিলার উপরে উঠে তাদের সম্মুখীন হলাম।

www.pathagar.com

তাদের নেতা পীরজাদাকে বললাম, আমার কানে এসেছে যে, শহরে শান্তি ভঙ্গ হয়েছে। জেলার শাসক হিসেবে আমি তোমাদের অস্ত্রসংবরণ করে ঘরে ফিরে যেতে হুকুম করছি। কাল আমি বিচার করবো।' পীরজাদা তখন গর্বিতভাবে চীৎকার করে বললো, আমরা কি ফিরিঙ্গির কুকুর যে, তাদের হুকুম তামিল করবো? আজ ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন। আজ মারবার ও মরবার দিন।' এ কথা বলে সে আমার মস্তক লক্ষ্য করে তরবারী দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করলো। সৌভাগ্যবশত আমি আমার তরবারী দিয়ে এই আঘাত প্রতিহত করলাম। কিন্তু আঘাত ফিরাতে আমার তরবারী ভেঙে গেল। জমাদার তখন আমার হাতে পিস্তল এগিয়ে দিল। আমি গুলি করে পীরজাদাকে ভূপাতিত করলাম। সে আমার এত কাছে ছিল যে, তাঁর কাপড়ে আগুন লেগে গেল। সিপাহীরা আমার বিপদ দেখে গুলি ছুঁড়তে লাগলো। আমি ও জমাদার দৌড়ে টিলার নিচে গিয়ে সিপাহীদের পরিচালনা করলাম। এরপর সিপাহীরা সঙ্গীন চালালো। আমার পায়ের কাছে একজন বৃদ্ধ আহত হয়ে পড়েছিল। একজন সিপাহী তাকে সঙ্গীনাবদ্ধ করতে চেয়েছিল। আমি পা দিয়ে সরিয়ে বৃদ্ধকে রক্ষা করলাম। হাঙ্গামা শেষ হলে দেখা গেল, পীরজাদা ও তাঁর ভাই মারা গেছেন। তাদের দলের আরো অনেকে আহত হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে আমার সেপাইরা পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়নি। তাঁরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিলে শহরে কোন ইংরেজের প্রাণ রক্ষা হত না। ঘটনার পরে আমার ইংরেজ সহকারীর খোঁজ করলাম। আমি মনে করে ছিলাম তিনি নিহত হয়েছেন। তিনি আমার সামনে এসে সরল মনে স্বীকার করলেন যে প্রাণ ভয়ে তিনি পলায়ন করেছিলেন।" (তথ্যসূত্র: সৈয়দ মুর্তাজা আলী, হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস)

রবার্ট লিন্ডসের নিজের উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় এ যুদ্ধ ছিল ইংরেজ বিতাড়নের যুদ্ধ। বিপ্লবীদের ভাষায় 'আজ মারবার ও মরবার দিন। আজ ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিন' রবার্ট লিন্ডসের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনীর হাতে তখনকার যুগোপযোগী আধুনিক অস্ত্র থাকার কারণে সৈয়দ হাদী ও মাহদী এবং তাদের সঙ্গী-সাথীগণ শাহাদত বরণ করেন। তাদের শাহাদতের পর আপাতত বিদ্রোহ থেমে যায়। এরপর ঐতিহাসিক সূত্র থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিলেট অঞ্চলে অনুষ্ঠিত যে যুদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায় সে যুদ্ধ হল লাতুর যুদ্ধ।

লাতুর যুদ্ধ

১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতে এক প্রচন্ড ব্রিটিশ বিরোধি সংগ্রাম শুরু হয়। ব্রিটিশরা এর নাম দিয়েছে 'সিপাহী বিদ্রোহ'। আসলে এ বিদ্রোহ ছিল সিপাহী জনতার ও মুজাহিদদের সম্মিলিত ব্রিটিশ বিরোধি সংগ্রাম। এ সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করে দেশ আযাদ করা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এ সংগ্রাম শুরু হয়। সিলেটও এ সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে ছিল না। এ সময় বড়লেখা থানার লাতু রেলস্টেশন এলাকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সিলেট থেকে মেজর রিং এর নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী লাতু গিয়ে বিদ্রোহীদের মুখোমুখী হয়।

www.pathagar.com

যুদ্ধে মেজর রিং পরাস্ত হন। তিনি এবং আরো পাঁচ জন সৈন্য নিহত হন। এ খবর সিলেটের প্রশাসকের নিকট পৌঁছার পর তিনি হিন্দু সুবাদার অযোধ্যা সিং এর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। এবার যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। বিপ্লবীদের ২৬জন শাহাদাত বরণ করেন, ৬জন ধৃত হন। অবশিষ্টরা কাছাড়ের দিকে চলে যায়। যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী জয়লাভ করে। তাঁরা কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করে। ধৃত ৬জনকে সিলেট নিয়ে এসে শহরের গোবিন্দ পার্কে (বর্তমান হাসান মার্কেট) গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয় এবং লাশ কয়েকদিন ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে স্থানীয় লোকদেরকে প্রদর্শন করানো হয়।

ফকীর ও কৃষক বিদ্রোহ

'সর্বভারতীয় ব্রিটিশ বিরোধি চেতনায় সিলেটে আগা মোহাম্মদ রেজা বেগের নেতৃত্বে সংঘটিত ফকির ও কৃষক বিদ্রোহ ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল সমগ্র বাংলায় বৃটিশ বিরোধিতাঁর এক চমকপ্রদ নজীর। এরই ঢেউ আসে সিলেটে। রেজা ছিলেন মোগলদের বংশধর। তাঁর শিষ্য ছিল অনেক। ব্রিটিশ শাসনকে তিনি শয়তানের রাজত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেন। কৃষক ও ফকিরদের সংগঠিত করেন। প্রথমে তিনি কাছাড়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।পরে প্রায় বারো শত সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সিলেট আসেন। কোম্পানির বদরপুর দুর্গ আক্রমণ করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই তিনি সিলেটে প্রবেশ করেন। বুন্দাশীলে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাথে তাঁর মোকাবিলা হয়। ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হলে সুবেদার কল্যাণ সিংহকে পাঠানো হয়। আগা মোহাম্মদ রেজা ধৃত হন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়।' (সিলেটে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি, আব্দুল হামিদ মানিক, পৃষ্ঠা নং ১০১-১০২)

কানাইঘাটের লড়াই

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় । এ যুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজরা অবস্থান নেয়। যেহেতু তখনও খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলিম জগতের খলিফা। ফলে উপমহাদেশের মুসলমানদের সমর্থন ছিল ইংরেজদের বিপক্ষে তুরস্কের পক্ষে। তুরস্কের খিলাফত রক্ষার জন্য উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। সিলেটেও আন্দোলনের ঢেউ আসে। আন্দোলন চাঙ্গা করার জন্য স্থানে স্থানে মিটিং-মিছিল, মাহফিল চলতে থাকে । ১৯২২ সালের ২৩ মার্চ কানাইঘাটের মাদরাসার বার্ষিক জলসা উপলক্ষে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।মাহফিলে খেলাফত আন্দোলনের সমর্থক উলামাদের বয়ান করার কথা ছিল।সরকার এ মাহফিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৪৪ দ্বারা জারি করে। মাহফিলের উদ্যোক্তাগণ সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করে মাহফিল চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুরমা ভেলীর কমিশনার জে.ই. ওয়েবস্টার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। উত্তেজিত জনতা লাঠিছটা নিয়ে কমিশনারকে আক্রমণ করে। কমিশনার গুর্খা সৈন্য ও

www.pathagar.com

পুলিশ বাহিনীকে গুলি বর্ষণের আদেশ দেন। ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৬জন প্রাণত্যাগ করেন ও ৩৮জন আহত হন। নিহতগণের নাম:

১. মৌলভী আব্দুস ছালাম- বায়মপুর
২. মোঃ মুসামিয়া- দুর্লভপুর
৩. আব্দুল মজিদ- নিজবাউর ভাগ
৪. হাজি আজিজুর রহমান- উজানীপাড়া
৫. মোঃ জহুর আলী- সদরিী পাড়া
৬. ইয়াসিন মিয়া- ছোটদেশ চটিগ্রাম

পরে কানাইঘাটের জনগণের উপরে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। স্থানে স্থানে পুলিশ গারদ বসানো হয় ও পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়। নিরপরাধ লোকদের ধরে হাজতে পুরা হয় এবং জনগণের মনে ত্রাসের সঞ্চার সৃষ্টি করা হয়। বয়স্ক পুরুষগণ নিজ নিজ বাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র পলায়ন করেন। এই ঘটনাই ছিল ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে জৈন্তাবাসীদের প্রথম সংঘাত। (সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, ফজলুর রহমান, পৃষ্ঠা নং ১২০-১২১)

মাইজভাগের ছিন্ন কুরআনের ঘটনা

১৯২২ সালের ৬এপ্রিল গোলাপগঞ্জ থানার মাইজভাগ গ্রামের মগফুর আলী আমিন সাহেবের বাড়িতে গোলাপগঞ্জ থানার ওসি ২৪জন গুর্খা ফৌজসহ আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে খানা তল্লাসী করে এবং আসবাবপত্র চূরমার করে। এই বইপত্রের সাথে পবিত্র কুরআন শরীফও ছিন্নভিন্ন করে। মগফুর আলী আমিন সাহেব ছিড়া কুরআন শরীফ নিয়ে সিলেট শহরের কুদরত উল্লাহ জামে মসজিদে আসেন। মুসল্লিদেরকে ছিন্ন কুরআন শরীফ প্রদর্শন করেন। সিলেটের "জনশক্তি" পত্রিকায় ছিন্ন কুরআন শরীফের ছবি ছাপানো হয়। ফলে তোলপাড় সৃষ্টি হয় এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে উঠে।

সিলেটে খিলাফত আন্দোলন

"১৯১৪ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধে তুরস্কের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। এই সময় তুরস্কের খেলাফত এবং খলিফাকে মুসলিম জাহানের ঐক্যের প্রতীক গণ্য করা হতো। তুরস্কের বিপর্যয়ের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে মুসলমানরা দায়ী করেন। এতে ইংরেজ বিরোধি চেতনা আরো জোরালো হতে থাকে। ওয়াজ মাহফিলে, সভা সমাবেশ ও খোতবায় ইংরেজ বিরোধি প্রচারণা শুরু হয়। অমনিতেই আলেম উলামারা খ্রিস্টান ঔপনিবেশিক শাসকদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তুরস্কের সাথে একাত্মতা অনুভব করতেন মুসলিম জাতীয়তাবোধ থেকে । এই চেতনা ধারণ করে গড়ে উঠে খেলাফত আন্দোলন। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বঙ্গভঙ্গ রোধ হয় ১৯১১ সালে। এতেও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইটালি ঐ যুদ্ধে ছিল

একপক্ষে। অপর পক্ষে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও তুরস্ক। যুদ্ধ শেষে তুরস্কের বিপর্যয়ের জন্য ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের ক্ষোভের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং খেলাফত আন্দোলন একযোগে এক লক্ষ্যে এসে যুক্ত হয়। ১৯২০-২২ খ্রিস্টাব্দে তুমুল আকার ধারণ করে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুরমা উপত্যকা রাষ্ট্রীয় সমিতির পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মৌলভী আব্দুল করিম বি এ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে মাওলানা আকরম খাঁ, বিপিন চন্দ্র পাল, ড.সুন্দরী মোহনদাস প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এতে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মৌলভীবাজারের যোগীডহরে অনুষ্ঠিত হয় আসাম প্রাদেশিক খেলাফত কনফারেন্স। দেশবন্ধু সি. আর. দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে বৃটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই বছরে সিলেটের শাহী ঈদগাহে বিরাট জনসভা হয়। মহাত্মা গান্ধী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। খেলাফত আন্দোলনে মহিলারাও সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। ঐ সময়ে মহিলারা ছিলেন পর্দানশীল, সমাজ ছিল রক্ষণশীল।

তা সত্ত্বেও খেলাফত আন্দোলনের তহবিলে মহিলাদের অনেকে তাদের অলংকার পর্যন্ত দান করেন। আলেম-উলেমার অংশগ্রহণের ফলে বৃটিশ বিরোধিতা একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে গণ্য হয়ে ওঠে। খেলাফত আন্দোলনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চারাদিঘির পার মানিক পীর রোডে খেলাফত আন্দোলনের অফিস স্থাপন করা হয়েছিল। এটাকে অলিখিত ভাবে খেলাফত বিল্ডিং বলা হতো। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে সম্পাদিত একটি কবুলতনামা থেকে জানা যায় মানিক পীর রোড নিবাসী নকি মিয়া, আব্দুল মজিদ, সোনা বিবি, মো.সুলতান, আব্দুল আজিজ, হাসিবা বানু, আসিবা বানু, আব্দুর রহমান আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার নামে প্রায় এক কেদার ভূমি দান করেন। আব্দুল্লাহ বি.এল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এখানে যে দালান নির্মাণ করেন, খেলাফত আন্দোলনের প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করা হয়। এ বিল্ডিং খেলাফত বিল্ডিং নামে পরিচিতি লাভ করে। এই উত্তাল সময়ে গ্রামগঞ্জেও ধ্বনিত হত "জাগো জাগো মুসলমান হাতে লওরে জয় নিশান। দ্বীনের কাজে হওরে আগোয়ান।"

সিলেটবাসী আলেম উলামা ও নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জেল জুলুম সহ্য করেন। আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণকারীদের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে কয়েকজন কৃতি ব্যক্তির নাম :

সিলেট : আব্দুল মতিন চৌধুরী, মাওলানা ছাখাওয়াতুল আম্বিয়া, মাওলানা আব্দুল মুছব্বির (বালাগঞ্জ), আব্দুল্লা বি এল, ইব্রাহীম চতুলী, আব্দুল হামিদ বি.এল (প্রাক্তন মন্ত্রী), ডাক্তার মর্তুজা চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল হক চৌধুরী, আব্দুল হামিদ চৌধুরী (সোনা মিয়া), মৌলভী রিয়াজ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (জকিগঞ্জ, বারহাল, মাইজগ্রাম, সিলেট খেলাফত কমিটির ছাত্র সংগঠনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ছিলেন, ছাখাওয়াতুল আম্বিয়া ছিলেন সেক্রেটারী), মাওলানা আব্দুল হক, মাওলানা আনজব আলী, মাওলানা

www.pathagar.com

আবু সাঈদ (চুড়খাই), জাহেদ উদ্দীন, আব্দুল মোক্তাদির চৌধুরী, আব্দুল ওয়ারেছ চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল বারী (ঝিঙ্গাবাড়ি), খলিলুর রহমান (বিশ্বনাথ), মাওলানা ইব্রাহিম আলী (বিশ্বনাথ/ভার্থখলা), খোন্দকার সিকন্দর আলী (জৈন্তা), মাওলানা ইব্রাহিম তশনা প্রমুখ।

সুনামগঞ্জ : ফজলুল হক সেলবরষী, দেওয়ান মোহাম্মদ আসফ, মকবুল হোসেন চৌধুরী, দেওয়ান মুহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, আসাফুর রেজা চৌধুরী, মাওলানা সাইয়্যিদ জামিলুল হক, মাওলানা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল খালিক, মাও.শোয়াইবুর রহমান প্রমুখ।

হবিগঞ্জ : কাজী গোলাম রহমান, মাওলানা দেওয়ান মুজিবুর রহমান, নুরুল হোসেন খান, মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বানিয়াচঙ্গী, মাওলানা রিদওয়ান উদ্দিন, ডাক্তার মোহাম্মদ ইলিয়াস, ডা:সৈয়দ আব্দুস শহীদ, ডাঃ আলী আসগর নুরী, মাও.রেদওয়ান উদ্দীন আহমদ, মাস্টার হাতিম উল্লাহ খান, সৈয়দ গোলাম আকবর, এহিয়া খান চৌধুরী, মৌলভী মজিদ বখত চৌধুরী প্রমুখ।

মৌলভীবাজার : মাওলানা সৈয়দ নজীর উদ্দীন আহমদ, মাওলানা আব্দুল কাদির, মাওলানা আব্দুর রহমান সিংকাপনী প্রমুখ।

করিমগঞ্জ : হাজি মুতছিম আলী চৌধুরী, মৌলভী মাহমুদ আলী, মৌলভী আহমদ আলী।

শিলচর : মৌলভী বসারত আলী মুজমদার, মৌলভী তবারক আলী, মৌলভী রশিদ আলী।

হাইলাকান্দি : মৌলভী উমর আলী, রাঙ্গা উটি, সভাপতি, মৌলভী মুহসিন আলী, নিমাই চাঁদপুর, মজরফ আলী, ছামান আলী।”

বৃহত্তর সিলেটের সচেতন শিক্ষিত প্রায় সবাই এ আন্দোলনে কমবেশি ভূমিকা রাখেন। (সিলেটে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি, আব্দুল হামিদ মানিক, পৃষ্ঠা নং-১০২-১০৫)

আঞ্জুমানে ইসলামিয়া, সিলেট

১৮৯৪ সালের ৮জুন, মৌলভীবাজারে আঞ্জুমানে ইসলামিয়া নামে একটি সংগঠনের গোড়াপত্তন হয়। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ আহমদ। পরবর্তী সম্পাদক খান বাহাদুর আলাউদ্দীন চৌধুরী। ১৮৯৬ সালের ২৩ মার্চ সিলেটে আঞ্জুমানে ইসলামিয়া গঠনের উদ্দেশ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত যারা ছিলেন তাদের অন্যতম হলেন আলহাজ্ব মজিদ বখত মজুমদার, আলহাজ্ব জহুর আলী, আব্দুল হালিম, মাসদার আলী উকিল প্রমুখ। আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল:

``But the immediate object is to give the Muslim Youth prliminery moral and religious training pervious to their admission into English schools with a view to enable them to understand the fundamental principles of their own Rerligion and appointing a preacher for the purpose of lecturing on the doctrines of Islam in all district and to guide and control the action of travelling preachers, who time to time visit the place''.

www.pathagar.com

সৈয়দ আব্দুল মজিদ বিএ, বিএল.১৯০২ সালে আঞ্জুমানের সম্পাদক এবং ১৯২০ সালে সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। দেওয়ান মোহাম্মদ আসফের প্রচেষ্টায় সুনামগঞ্জে আঞ্জুম.ল দখলসয়ঢ়নক্ষানে ইসলামিয়ার শাখা গঠিত হয়। হবিগঞ্জে যাদের প্রচেষ্টায় আঞ্জুমানে ইসলামিয়া গঠিত হয় তাঁরা হলেন খান বাহাদুর আজিজুর রহমান চৌধুরী, হবিগঞ্জের ২য় গ্র্যাজুয়েট মাহবুবুর রহমান, তহশিলদার রেহাম উদ্দীন চৌধুরী, সাব-রেজিস্ট্রার ফজলুর রহমান, ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুল আজাদ আলী চৌধুরী, এস.পি আহমদ মোহাম্মদ, পুলিশ সুপার খান বাহাদুর আব্দুর নূর চৌধুরী। মুসলিম লীগ সংগঠিত হবার আগে এই সংগঠনটি সিলেটের মুসলিম জাগরণে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে সিলেটের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

১৯০৬ সালে "ঢাকার নবাব-নবাব সলিমুল্লাহর আহবানে উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ ঢাকার একটি সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন এ সম্মেলনে সিলেট থেকে যারা অংশ গ্রহণ করেন তাদের অন্যতম হলেন মুহাম্মদ এহিয়া জিতুমিয়া, মোহাম্মদ বখত মজুমদার, জনাব আব্দুল করিম ও হবিগঞ্জের জনাব আব্দুল জব্বার। উল্লেখ্য যে, এ সম্মেলনে সিলেটের ১৫জন সদস্য ও ৬জন পর্যবেক্ষক যোগদান করেন। মুসলিম লীগের কার্যক্রম ১৯০৬সাল থেকে সিলেট অঞ্চলে শুরু হয়। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব নেবার পর থেকে সংগঠনটি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী মজবুত গণসংগঠনে পরিণত হয়। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের উত্থাপিত পাকিস্তান প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবার পর পাকিস্তান আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ডান হাত নামে খ্যাত দুজন ব্যক্তি হলেন ভাদেশ্বরের আব্দুল মতিন চৌধুরী (কলা মিয়া) ও 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক আলতাফ হোসাইন। দুজনই সিলেটের বাসিন্দা। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সিলেট মুসলিম লীগ অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সিলেট আসেন ১৯৪৬ সালের ২রা মার্চ।

তিনি পাকিস্তানের সাবেক শিল্পমন্ত্রী আজমল আলী চৌধুরীর শ্রদ্ধেয় পিতা মুসলিম লীগের প্রখ্যাত নেতা এডভোকেট আমজদ আলী চৌধুরীর বাড়িতে অবস্থান করেন এবং বিকালে শাহী ইদগাহ ময়দানে বিশাল জনসভায় ভাষণ দান করেন। পরদিন তিনি আব্দুল মতিন চৌধুরী সহ সড়ক পথে শিলং এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। জিন্নাহর সিলেট সফরের পর মুসলিম লীগ খুবই জনপ্রিয় গণ সংগঠনে পরিণত হয়।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ইংরেজ সরকারের ওয়াদা ছিল যুদ্ধ অবসানে তাঁরা উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রদান করবে। তাদের গড়িমসিতে স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। শুরু হয় Quit India (ইংরেজ ভারত ছাড়) আন্দোলন। যার ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ সরকার ভারত ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। ১৯৪৭ সালের ৩জুন ভারতে নিযুক্ত সর্বশেষ বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

"১৯৪৭ সালের ৩ জুনের ঘোষণায় ইংরেজদের উপমহাদেশ ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। ১৯৪৭ সালের ৩জুন একটি স্মরণীয় দিন। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল অর্থাৎ ১৯০ বছর ব্রিটিশ কর্তৃক উপমহাদেশ শাসন ও শোষণ করার পর বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

১. মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ইচ্ছা করিলে আলাদা ডমিনিয়ন গঠন করতে পারবে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি নতুন গণপরিষদ গঠিত হবে।
২. সীমান্ত প্রদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ডমিনিয়ন পাকিস্তানে যোগ দিবে কিনা, তাঁর জন্য গণভোট হবে।
৩. সিলেট জেলা বাংলাদেশের মুসলমান প্রধান অংশের সঙ্গে যোগ দিবে কিনা তাহাও গণভোট মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
৪. বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের মুসলমান ও অমুসলমান অংশের সীমা, বাউন্ডারী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে।
৫. উপমহাদেশের হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানকে ডমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হবে। তবে গণপরিষদ অন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
৬. দেশীয় রাজ্যসমূহ ইচ্ছামত যে কোন রাষ্ট্রে যোগ দিতে পারবে।"

(সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, ফজলুর রহমান, পৃষ্ঠা নং-১২৩)

মাউন্টব্যাটেনের প্লান অনুসারে ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটে গণভোটের বর্ণনা বিশিষ্ট গবেষক আব্দুল হামিদ মানিকের কলম থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

"সিলেট ১৯৪৭-এর আগে থেকেই আসাম প্রদেশের একটি জেলা ছিল। আসামের দুটি বিভাগে ১২টি জেলার মধ্যে সুরমা ভ্যালিতে ছিল ৫টি জেলা। সমগ্র প্রদেশের নেতৃত্বে সিলেট ছিল অগ্রগণ্য এবং আসামে মুসলিম প্রভাব ছিল বেশি। দ্বিজাতিতত্ত্বের (ধর্মের নয় ধর্মাবলম্বীর ভিত্তিতে) ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্তের ফলে আসাম প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহ অন্যান্য জেলার মত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে-এটাই ছিল স্বাভাবিক কিন্তু কংগ্রেস সুযোগ নিতে চাইলো। বিভাগ পূর্ব নির্বাচনে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের দু'জন প্রার্থী সিলেট থেকে এবং একজন হাইলাকান্দি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন (গোলাপগঞ্জের মাওলানা আব্দুর রশীদ, জৈন্তাপুরের মাওলানা ইব্রাহিম চতুলী ও হাইলাকান্দির আব্দুল মুতলিব) । তাদের সমর্থনে আসাম প্রদেশে তখন ক্ষমতাসীন ছিল কংগ্রেস দল। এই প্রেক্ষিতে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের সমর্থকগণ ভারতের সাথে থাকার দাবি করেন। এর প্রতিবাদ করেন সিলেটের জনগণ। গোলাপ-গঞ্জের আব্দুল মতিন চৌধুরী এ পর্যায়ে রাখেন বিশেষ ভূমিকা। জননেতা মতিন চৌধুরী জিন্নাহ'র 'ডানহাত' রূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর এবং সিলেটের অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় তৈরি হয় গণভোটের প্রেক্ষাপট। ব্রিটিশ সরকার '৪৭-এর ৩জুনের ঘোষণায় সিলেটে রেফারেন্ডামের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

ঘোষণাটি ছিল :

Though Assam is predominantly a nonmuslim province, the district of Sylhet is contiguous to Bengal is predominantly Muslim. There has been a demand that the event of the partition of Bengal, Sylhet should be partitioned. A referendum will be held in the Sylhet district under the aegis of the Governor General and consultation with the Assam Provincial Government to decide whether district of Sylhet should continue to form part of the Assam province or should be amalgamated with the new province to eastern Bengal if that province agrees. If the referendum result is in favour of amalgamation with eastern Bengal, a Boundary Commission with terms of referencc similar to those for the Panjabs and Bengal will be set up to demarcate Muslim-majority areas of Sylhet district and contiguous Muslims majority areas of adjoining district which will then be transfer to eastern Bengal. The rest of Assam province will in case constituent assembly.

এ ঘোষণা মতে সিলেট আসামে থাকবে নাকি পাকিস্তানে যোগ দেবে-এ প্রশ্নে জনমত যাচাইর আয়োজনটি ছিল সিলেটের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণভোটে সিলেটবাসীর মতামত ভিন্ন হলে সিলেটের ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থান হতো সম্পূর্ণ অন্যরকম। সিলেটের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ এটি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই '৪৭ এর জুন মাস থেকেই সিলেট রাজনৈতিক তৎপরতাঁর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। ৬ ও ৭ জুলাই সোম ও মঙ্গলবার গণভোটের তারিখ নির্ধারিত হয়। কমিশনার নিযুক্ত হন মিঃ এইচ এ স্ট্রক। সিলেটের জেলা প্রশাসক মিঃ ডাম ব্রেকের তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করা হয় গণভোট। গণভোট উপলক্ষে পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে গঠিত হয়েছিল সিলেট রেফারেন্ডাম বোর্ড। এ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন আব্দুল মতিন চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আবু আহমদ আব্দুল হাফিজ এডভোকেট।

পাকিস্তানের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্যে বৃহত্তর সিলেটের সর্বত্র শুরু হয় তোড়জোড়। জেলার পাঁচটি সাবডিভিশন-সিলেট সদর, করিমগঞ্জ, হবিগঞ্জ, দক্ষিণ সিলেট (পরে মৌলভীবাজার) ও সুনামগঞ্জ মেতে উঠে এক ব্যাতিক্রমধর্মী রাজনৈতিক তরঙ্গে। অপর পক্ষেও জোর তৎপরতা। পাকিস্তানের পক্ষে সিলেটের বাইরে থেকেও নেতাঁরা ছুটে এলেন সিলেটে। লিয়াকত আলী, সোহরাওয়ার্দী, চৌধুরী খালিকুজ্জামান, মাওলানা আজাদ সুবহানী এমনকি তরুণ শেখ মুজিবও এলেন। আসাম মুসলিম লীগের নেতাঁরর্মীদের সাথে একযোগে তাঁরা ছুটে বেড়ালেন সিলেটের স্থানে স্থানে। দৈনিক আজাদ, মর্নিং নিউজ, সিলেটের যুগভেরী, আসাম হেরালড, আল ইসলাহ, মাওলানা রজিউর রহমান, শাহেদ আলীর প্রভাতী পত্রিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। লেখকরাও সক্রিয় ছিলেন। মাওলানা ভাসানী, আব্দুল মতিন চৌধুরী, আব্দুল হামিদ, দেওয়ান বাসিত, দেওয়ান আজরফ, মাহমুদ আলী, আজমল আলী চৌধুরী, ডাঃ মজিদসহ

www.pathagar.com

অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ময়দানে। তরুণ ছাত্রদের মধ্যে চৌধুরী এ.টি.এম মাসউদ, কাজী মুহিবুর, তসদ্দুক আহমদ, ফজলুর রহমান, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে দেওয়ান ফরিদ গাজী, সা'দত খান, ধলাবারী, কালা মিয়া, মনির উদ্দীন, আব্দুল হামিদ প্রমুখ অগণিত ছাত্র-যুবক বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। ছুটলেন ঘরে ঘরে। সিলেটে আব্দুস সালাম, করিমগঞ্জে মেকাই মিয়া, মৌলভীবাজারে কাজী আব্দুর রকিব, সুনামগঞ্জে আবু হানিফ আহমদ প্রমুখের নেতৃত্বে গঠিত হলো মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী।

জমজমাট প্রচারণা। পাকিস্তানের পক্ষে প্রতীক কূড়াল । অপরপক্ষে ঘর। সিলেটে শ্লোগান উঠলো 'আসামে আর থাকবোনা গুলি খেয়ে মরবোনা, কংগ্রেস সরকার জুলুম করে, নামাজেতে গুলি করে, ভূতের ঘরে কূড়াল মার' ইত্যাদি। অপরপক্ষে শ্লোগান ছিল-'পূর্ববঙ্গে যাব না, নালি শাক খাব না।' জবাবে শ্লোগান তৈরি হলো- 'আসামে আর থাকবো না, মশার কামড় খাবনা' ইত্যাদি। সভা সমাবেশ, শ্লোগান আর কর্মীদের ছুটাছুটিতে সে এক অভূতপূর্ব জাগরণ।

গণভোটে সমাজের প্রতিটি স্তরে সাড়া জেগেছিল। অথচ রেফারেন্ডাম বলতে যা বুঝায়- অর্থাৎ সার্বজনীন ভোটাধিকার ঐ গণভোটে ছিল না। এর উপর শিক্ষারও শর্ত ছিল। গ্রামে যাদের চৌকিদারী ট্যাক্স আট আনা এবং পৌর এলাকায় যাদের হোল্ডিং ট্যাক্স পাঁচআনা কেবল তাঁরাই ছিলেন ভোটার । মুসলমানদের মধ্যে গরিবের সংখ্যা ছিল বেশি। শিক্ষার হারও ছিল কম। এরপরও গণভোটের জোয়ার ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে। উভয়পক্ষে চারণ কবিদের রচিত গান ফিরতে থাকে মুখে মুখে:

আয়রে মুসলিম আয়রে তোঁরা
একবার ফিরে আয়,
বিহার ও কলকাতাঁর দিকে
একবার ফিরে আয়।
আগে মরলো কত মুসলিম বিহার কলকাতায়
শেষে শহীদ হইল আলকাস
সিলেটও জেলায়।

অপরপক্ষে ঃ

না বুঝে ভাই পরের কথায়
ঘরে কূড়াল না মারিও
ভাইরে ভাই ঘরের বাকসে ভোট দিও।
বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ মানুষ মরে লক্ষ লক্ষ
সিলেট জেলায় সেই দুর্ভিক্ষ টানিয়া না আনিও।

www.pathagar.com

(উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২মার্চ, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সিলেট এসেছিলেন। তাঁর সফরের পর সিলেট মুসলিম লীগের সমর্থক বেড়ে যায়। আসামের কংগ্রেস সরকার মুসলিম লীগ সমর্থকদের অনেককে কারাগারে নিক্ষেপসহ জেল-জুলুম শুরু করে। এ অবস্থায় ১৯৪৭ এর ২৪এপ্রিল সিলেট শহরস্থ কোতোয়ালী থানা ভবন থেকে বৃটিশ পতাঁরা নামিয়ে পাকিস্তানী পতাঁরা উঠাতে গিয়ে আলকাস গুলিতে শহীদ হন। (তাঁর নামানুসারে পৌরসভায় একটি সড়ক আছে।) সব মিলিয়ে সমগ্র সিলেট রাজনৈতিক উত্তাপে টগবগে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এভাবে সময় ঘনিয়ে এলো। ভোটের দুটি দিনই ছিল সিলেটে বৃষ্টিমুখর । মুষলধারে বৃষ্টি। রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত। তবু কেন্দ্রগুলিতে ছুটে এলেন নারী পুরুষ দলে দলে। নৌকায়, পায়ে হেঁটে। শান্তিপূর্ণভাবে দু দিনে ২৩৯টি কেন্দ্রে ভোটপর্ব শেষ হলো। দেখা গেল পাকিস্তানের পক্ষে ২লাখ ৩৯হাজার ৬১৯ এবং বিপক্ষে ১লাখ ৮৪হাজার ৪১ ভোট পড়েছে। সাব ডিভিশন ওয়ারী ফলাফল ছিলঃ সাব ডিভিশন

	পূর্ব বাংলার পক্ষে	আসামের পক্ষে
সদর	৬৮,৩৮১	৩৮,৮৭১
করিমগঞ্জ	৪১,২৬২	৪০,৫৩৬
হবিগঞ্জ	৫৪,৫৪৩	৩৬,৯৫২
দক্ষিণ সিলেট	৩১,৭১৮	৩৩,৪৭১
সুনামগঞ্জ	৪৩,৭১৫	৩৪,২১১

১৯৪৭এর ১২জুলাই এ ফলাফল দিল্লিতে পাঠানো হয়।১৪জুলাই সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। এ ফলাফল নিয়ে সিলেটের সর্বত্র সে কি উল্লাস। করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, কাছাড়সহ আসামের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার বিস্তীর্ণ জনপদে খুশির জোয়ার। ৩ জুনের সরকারি ঘোষণায় ছিল, জনমত পাকিস্তানের পক্ষে হলে সিলেট এবং সংলগ্ন মুসলিম প্রধান এলাকাসমূহ পাকিস্তান বা পূর্ববংগের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই আনন্দ উল্লাসের মধ্যেই চার সপ্তাহের মাথায় সীমানা কমিশনের রেডক্লিফ যে রিপোর্ট দিলেন তাতে সিলেটবাসী হতবাক হয়ে গেল। রোয়েদাদ অনুযায়ী করিমগঞ্জ মহকুমার পাথার কান্দি, রাতাবাড়ি, বদরপুর ও করিমগঞ্জ থানার অধিকাংশ এলাকা হয়ে গেল ভারতের অংশ।

স্যার রেডক্লিফের দায়িত্ব ছিল সীমানা নির্ধারণের। জনমত উপেক্ষা করে সিলেটের অবিচ্ছেদ্য আইনসঙ্গত অংশকে আসামের সাথে যুক্ত করার খোঁড়াযুক্তি দিলেন রেডক্লিফ। কুলাউড়া-শ্রীমঙ্গল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল (চা বাগানের ভোটাধিকারহীন শ্রমিকদের গণ্য করে) পাকিস্তানের ভাগে দেয়ার বিনিময়ে ঐ সাড়ে তিন থানাকে দিতে হলো ভারতের ভাগে। অথচ রেফারেন্ডামের সামগ্রিক ফলাফল মত উভয় এলাকাই স্পষ্টত পাকিস্তানভুক্ত হওয়ার কথা। জুনের ঘোষণা এবং জনগণের রায়কে রেডক্লিফ

www.pathagar.com

কেন অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করলেন? এর উত্তর খুঁজেছেন অনেকেই। কেউ বলেছেন, রেডক্লিফ প্রথমে যে রিপোর্ট ও ম্যাপ মাউন্টব্যাটেনের কাছে দাখিল করেছিলেন রহস্যজনক কারণে তা গ্যাজেট অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশ করা হয়নি।

মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে খুশি করার জন্যে রেডক্লিফকে প্রভাবিত করে পাকিস্তান ও সিলেটকে বঞ্চিত করেন। অনেকের মতে, মাউন্টব্যাটেনকে মিঃ জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম গর্ভনর জেনারেল হিসেবে মেনে নেননি বলে জিন্নাহর উপর মিঃ মাউন্টব্যাটেন খেপা ছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে কিছু এলাকা যোগ করার বিনিময়ে জিন্নাহ ছাড় দেন বলেও কথা উঠেছিল। এ ব্যাপারে আরেকটি কথা আছে। ত্রিপুরার মাহরাজা প্রথমেই পাকিস্তানে যোগদানের ঘোষণা দিয়ে বসেন। মহারাজার স্ত্রী ছিলেন বিহারের ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের কট্টর হিন্দুরাজার কন্যা।প্যাটেল ঐ রাজাকে দিয়ে তাঁর কন্যাকে (ত্রিপুরা রাজার রাণী) রেডক্লিফের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাণী সেখানে এক সপ্তাহ ছিলেন । ফলে সবকিছু উলট-পালট হয়ে গেল। পরে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে করিমগঞ্জের একদল মেডিক্যাল ছাত্র জিন্নাহর সাথে দেখা করে ঐ প্রসঙ্গ জানতে চেয়েছিলেন। জিন্নাহ বলেছিলেন, রেডক্লিফ অর্থলোলুপ নন সে কথা জেনেই আমরা তাকে বিচারক মেনেছিলাম। কিন্তু তিনি যে নারী-লোলুপ সে কথা আমাদের লোক জানতে পারেনি।" (সিলেটে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি, আব্দুল হামিদ মনিক, পৃষ্ঠা নং-১০৯-১১৩)

এ ব্যাপারে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা জকিগঞ্জের বাসিন্দা সিলেট বারের বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট সামসুদ্দিন সাহেবের কাছ থেকে এ গ্রন্থের লেখক একটি তথ্য অবগত হন। তিনি বহু লোকের সামনে তথ্যটি বার বার প্রকাশ করেছেন। তথ্যটি নিচে উল্লেখ করা হলো :

"এডভোকেট জনাব সামসউদ্দীন সিলেটের মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তিনি গণভোটের সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। গণভোটের ফল প্রকাশের পর বাউন্ডারী কমিশনার স্যার রেডক্লিফ যখন সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমার কয়েকটি থানা ভারতের সাথে যুক্ত করেন, তখন রেডক্লিফের সাথে কয়েকজন নেতা সহ করিমগঞ্জে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রতিবাদলিপি হস্তান্তর করেন। তিনি এ সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সদ্য বিলাত পড়ুয়া কন্যা মিস ইন্দিরাকে রেডক্লিফের পাশে দেখতে পান। তিনি তথ্য নিয়ে জানতে পারেন রেডক্লিফের সিলেটের বাউন্ডারী নির্ধারণের পুরো সফরে ইন্দিরা আগাগোড়া তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। লর্ড ও লেডী মাউন্টব্যাটেনের সাথে বিপত্নীক জওহরলাল নেহেরু ও তাঁর কন্যা ইন্দিরার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। নেহেরু কন্যা ইন্দিরার সাথে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এবং লেডী এডুইনা মাউন্টব্যাটেনের সাথে নেহেরু অনৈতিক সম্পর্ক ছিল তা তৎকালীন উচ্চ মহলে সবাই জানত।

বি: দ্র: লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কনিষ্ঠকন্যা পামেলা মাউন্টব্যাটেন "India Remembered : A Personal Account of the Mountbatten during the transfer of power"

www.pathagar.com

একখানা স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন "আমার বয়স যখন ১৭ বছর তখন বাবা মার সাথে ভারত এসেছিলাম। তখন আমার মায়ের বয়স ছিল ৪৪ বছর। আমি ভারতে ১৫মাস অবস্থান করি।"

"আমার মা এডুইনা এবং নেহেরুর সংগে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মা অনেক পুরুষের সংগে সম্পর্কে জড়ান। কিন্তু বাবা এসব বিষয়ে অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি বিশেষ করে নেহেরুর সাথে মার ঘনিষ্ঠতা দেখে আনন্দিতই হতেন।"

" বাবা আমার বড়বোনের কাছে ১৯৪৮ সালে একটি পত্র লিখেন।পত্রে তিনি উল্লেখ করেন এডুইনা ও নেহেরুকে একসংগে খুবই মিষ্টি দেখায়। পরস্পরের সাথে ওদের টানটা খুবই নিবিড়।" আমার মা ছিলেন নেহেরুর বিশ্বস্ত বন্ধু। মার কাছে নেহেরুর অনেক চিঠি পাওয়া যায়। একটি চিঠিতে নেহেরু লিখেন " আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম এবং সম্ভবত তুমিও উপলব্ধি করেছ যে, আমরা একটি গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছি যা অপ্রতিরোধ্য।"

"নেহেরুর সাথে মার সম্পর্ক ছিল আমৃত্যু। ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে আমার বাবা নেহেরু ও এডুইনার প্রণয়কে কাজে লাগিয়েছিলেন" "মা, বাবা ও নেহেরুর মধ্যে চমৎকার সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। পন্ডিতজী আমাদের চেয়েও চমৎকারভাবে ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারতেন।" "৫৮ বছর বয়েসে মা এডুইনা ঘুমের মধ্যে মারা যান। মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁর শিয়রের কাছে নেহেরুর লেখা চিঠির একটি প্যাকেট পাওয়া যায়।"

এডুইনার মৃত্যুর পর তাঁর অন্তিম যাত্রায় ইংল্যান্ডের পোর্টস মাউথ বন্দরে নেহেরু ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি ফ্রিগেট পাঠান, নাবিকেরা এডুইনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে মেরীগোল্ড ফুলের স্তবক সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র : নয়াদিল্লি থেকে এএফপি পরিবেশিত এবং দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার ৩৩বর্ষ ১৮৩তম সংখ্যা ২২জুলাই ২০০৭-এ প্রকাশিত}

সিলেট জেলার জনগণ গণভোটে পাকিস্তানে যোগদান করার পক্ষে ১,৫৫,৫৭৮ ভোট বেশি পাওয়ার পর গোটা জেলা এক ইউনিট হিসেবে পাকিস্তানের সাথে আসবে, এটাই ছিল বাস্তবতা, এটাই ছিল যুক্তিসঙ্গত, এটাই ছিল ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু অনৈতিক সম্পর্ক, ষড়যন্ত্র ও পক্ষপাতিত্বের কারণে করিমগঞ্জ, বদরপুর, রাতাবাড়ি, হাইলাকান্দি, শিলচর ইত্যাদি এলাকা হারিয়ে সিলেটের অবশিষ্ট এলাকা '৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হল। পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে বিজয় লাভ করার কারণে সিলেট স্বাধীন বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হল। বিশিষ্ট গবেষক সৈয়দ মোস্তফা কামাল সিলেটে গণভোটের সময় যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের তালিকা তৈরি করেছেন । তালিকাটি নিচে প্রদান করা হল:

মরহুম আব্দুল মতিন চৌধুরী (মন্ত্রী, ভাদেশ্বর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট), মরহুম মাওলানা ছাখা ওয়াতুল আম্বিয়া (রফিপুর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট), মরহুম মোদাব্বির হোসেন

www.pathagar.com

চৌধুরী (মন্ত্রী, মোস্তফাপুর, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ), মরহুম মকবুল হোসেন চৌধুরী (বিন্যাকুলি, সুনামগঞ্জ), মরহুম মফিজ চৌধুরী এম.এ.এল.এ (ছৈলা, ছাতক, সুনামগঞ্জ), মরহুম আব্দুল্লাহ (বানিয়াচঙ্গ, হবিগঞ্জ), মরহুম নাসির উদ্দীন আহমদ চৌধুরী (মন্ত্রী, পিয়াইন, মাধবপুর, হবিগঞ্জ), মরহুম নুরুল হোসেন খান, এম. এল.এ (সাগরদিঘির পশ্চিম পার, বানিয়াচঙ্গ, হবিগঞ্জ), দেওয়ান আব্দুল বাসিত (মন্ত্রী, রাজনগর, মৌলভীবাজার), মরহুম আব্দুল বারী চৌধুরী, এমএলএ (আউশকান্দি, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ), মরহুম দেওয়ান আব্দুর রব চৌধুরী (মন্ত্রী, গহরপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট), মাহমুদ আলী (মন্ত্রী, সুনামগঞ্জ), এ.এইচ.ফয়জুল হাসান, এম.এল.এ (লংপুর, গোয়াইনঘাট, সিলেট), মরহুম রফিজ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী, এম.এল.এ (দৌলতপুর, বাহুবল, হবিগঞ্জ), মরহুম ইনাম উল্লাহ, এমএলএ (সালারে জেলা, মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড, মৌলভীবাজার), মরহুম সৈয়দ সাইদ উদ্দীন আহমদ, এমএলএ (নয়া পাড়া, মাধবপুর, হবিগঞ্জ), মরহুম আব্দুল হেকিম চৌধুরী এমএলএ (ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ, মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের এরিয়া কমান্ডার), মরহুম আবু হানিফা আহমদ (সালারে জেলা, মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল গার্ড, সুনামগঞ্জ), মরহুম আব্দুস সালাম (বারুতখানা, সিলেট সালারে জেলা, মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড, সিলেট), মরহুম আব্দুর রহমান সিংকাপনী (সিংকাপন, মৌলভীবাজার), জনাব আব্দুস সালাম (মন্ত্রী, কানাইঘাট, সিলেট), মরহুম আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী (পিয়াইন, মাধবপুর, হবিগঞ্জ), মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, এমএলএ (শ্রীকুটা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ), মরহুম আব্দুল হাই (পাটলী, মাধবপুর , হবিগঞ্জ), মরহুম উসমান মিয়া সদাগর (কুমারপাড়া, সিলেট), মরহুম মাওলানা সহুল উসমানী (মুহাদ্দীস, সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা), মরহুম মাওলানা রমিজ উদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী (তুরুকভাগ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট), মরহুম মাওলানা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (তুরুক খলা, সিলেট , মরহুম ডাক্তার আব্দুল মজিদ(হাজরাই, সিলেট সদর), মরহুম মাও. ওয়াছিব উল্লাহ (লাউয়াই, সিলেট), মাও. আব্দুর রশী দ(টুকের বাজার, সিলেট), মরহুম জসীম উদ্দীন আহমদ এডভোকেট (রাজনগর মৌলভীবাজার), মরহুম এম.এ বারী ধলাবারী (মজলিশ আমীন, চারাদিঘীর পার, সিলেট), জনাব শামসউদ্দীন আহমদ চৌধুরী (গনিপুর, জকিগঞ্জ), মরহুম আব্দুল খালিক মার্চেন্ট (কুয়ারপাড়, সিলেট), মরহুম তোতা উল্লাহ খান (ছড়ার পার, সিলেট), ফজলুর রহমান (গ্রুপ কেপ্টেইন অবঃ শারীখাট, জৈন্তাপুর, সিলেট), মরহুম মতসির আলী (পাঠান পাড়া, সিলেট), মরহুম আব্দল খালিক জায়গীরদার, তমঘায়ে খেদমত (রাজাপুর, বালাগঞ্জ, সিলেট), মরহুম লাল বারী (কুমার পাড়া সিলেট), মরহুম বসির উদ্দীন বসু মিয়া (মানিকপীর রোড, নয়াসড়ক, সিলেট), মরহুম মনোয়ার আলী (মন্ত্রী, সুনামগঞ্জ), মরহুম আব্দুল কাদিম চৌধুরী ও মরহুম আব্দুল হাই চৌধুরী (সুনাইত্যা, কসবা, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ), জনাব আব্দুল মান্নান ছানু মিয়া (এম. পি. প্রবাসী নেতা ঘোলডুবা, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ), মরহুম

www.pathagar.com

দেওয়ান মজিবুর রহমান চৌধুরী (ইজপুর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ), মৌলভী আবুল কালাম আজাদ (পহেলাবাড়ি, ছাতিয়াইন, মাধবপুর, হবিগঞ্জ), জনাব সি.এম. আব্দুল ওয়াহেদ (কদুপুর, বানিয়াচঙ্গ, হবিগঞ্জ), আব্দুর রহমান (সিলেট, সভাপতি, সিলেট জেলা মুসলিম লীগ), মরহুম দেওয়ান আব্দুর রহিম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী জোবেদা রহিম চৌধুরী (পানি উমদা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ), খান সাহেব মরহুম মহুতাব আলী এম.এল.এ (আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ), মরহুম সৈয়দ মোহাম্মদ ইদ্রিস (নরপতি, চুনারু ঘাট, হবিগঞ্জ), জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বি. এল.এম.এল.এ (বসিনা, বাহুবল, হবিগঞ্জ), জনাব আব্দুল জালাল চৌধুরী (এডভোকেট, ইসলামী চিন্তাবিদ, হাজিপুর, কানিহাটি, মৌলভীবাজার), জনাব শামসুল ইসলাম চৌধুরী (এডভোকেট, প্রসিডেন্ট সিলট একাডেমী জকিগঞ্জ, সিলেট), জনাব মতিউল বর চৌধুরী(সাবেক মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ, বহরা মাধবপুর, হবিগঞ্জ), দেওয়ান মোয়াজ্জম আহমদ চৌধুরী, ছাত্র নেতা (পানি উমদা, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ), মরহুম শহীদ আলী (এডভোকেট বিশ্বনাথ, সিলেট), মরহুম মোকাররম খান (জনাব আব্দুল মুকিত খান এমপি'র পিতা, গোপশহর, সিলেট), দেওয়ান ফরিদগাজী (ছাত্র নেতা, দেবপাড়া, নবিগঞ্জ), মরহুম কাজী বদরুদ্দীন হায়দার (গজনাইপুর, নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ), জনাব নাজমুল হোসেন খান তাঁরা মিয়া(প্রবীণ রাজনীতিবিদ, ঘতরপুর, সিলেট), সিলেটে রেফারেন্ডাম পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করার জন্যে বাইরে থেকে এসেছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, খাজা নাজিম উদ্দীন, হবিবউল্লাহ বাহার, তদানীন্তন ছাত্র নেতা শাহ আজিজুর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান, ফজলুল কাদির চৌধুরী, মরহুম মৌলভী ফরিদ আহমদ, দেওয়ান শফিউল আলম)

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
সিলেট অঞ্চলের আলেম সমাজ

বংগ ভবনে দীর্ঘতম সময় অবস্থানকারী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সিলেটকে বাংলাদেশের 'আধ্যাত্মিক রাজধানী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। জালালাবাদের বাসিন্দাদের ইসলামী মূল্যবোধ, আমল আখলাক ও এ অঞ্চলে অবস্থিত মসজিদ, মাদরাসার সংখ্যা ও চেহারা অবলোকন করলে এ সত্যতাঁর পরিচয় মিলে। এখানকার কথ্যভাষায় প্রচুর আরবি ও ফার্সি শব্দ বিরাজমান। রমজান মাসে এ অঞ্চলের জনগণের জীবনাচারে এমন একটি চিত্র ফুটে উঠে যা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত দেখা যায় না।

যাদের অবদানের কারণে সিলেট আধ্যাত্মিক রাজধানী হিসেবে আখ্যায়িত হল তাঁরা হলেন হযরত শাহজালাল (র) ও তাঁর সঙ্গীসাথী আউলিয়াবৃন্দ ও জালালাবাদের আলেম সমাজ। হযরত শাহজালাল (র) ও তাঁর ৩৬০ আউলিয়া ব্যাপারে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে জালালাবাদের আলেম সমাজের ব্যাপারে কিছু কথা লিপিবদ্ধ করা হল। হক আদায় করে আলেম সমাজ সম্পর্কে লিখলে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ হয়ে যাবে। কিন্তু এ পরিসরে সে সুযোগ নেই। তাই খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকজন মশহুর আলেমের জীবনের কয়েকটি দিক নিচে প্রদান করা হলো:

১. বাহারুল উলূম মাওলানা মোহাম্মদ হোসেন মরহুম (১৮৯০-১৯৭২)

জন্ম-জৈন্তাপুর উপজেলার নিজ পাটগ্রামে। ১৯১৯ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে গোল্ড মেডেলসহ ফখরুল মুহাদ্দিসীন ডিগ্রি হাসিল করেন। । ১৯১৯থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি সিলেট আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন।

তিনি অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সময়ে ইসলাম সম্পর্কিত আরবি, ফার্সি, উর্দু ভাষায় বই ছাপা হয়েছে এমন কোন কিতাব নাই যা তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে সংগৃহিত ছিল না। এছাড়া তাঁর কাছে ১৩৮ খানা পান্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বই সিলেট আলীয়া মাদরাসা, ঢাকা আলিয়া মাদরাসা ও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি ঢাকায় সরকারিভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাঁকে কিতাবের কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বই না দেখে কোন কিতাবের কোন অধ্যায়ের কত পৃষ্ঠায় আছে তা বলে দিতে পারতেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত সম্প্রসারিত ছিল যে তাঁকে বাহারুল উলূম বা জ্ঞানের সমুদ্র উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি ৮টি গ্রন্থ রচনা করেন।

২. হাফিজ মাওলানা আতহার আলী মরহুম (১৮৯৪-১৯৭৬)

জন্ম-বিয়ানীবাজার উপজেলার ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে। ভারতের মুরাদাবাদ, রামপুর ও দেওবন্দে পড়াশুনা করেন। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর খলিফা ছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি এবং নেজামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও যুক্তফ্রন্টের নেতা ছিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ ও পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর মাধ্যমে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়রের ব্যাপারে গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক লবি করেন। তিনি ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বিরাট অবদান রাখেন। তিনি জামাল উদ্দিন আফগানির প্যান ইসলামিজমের একান্ত ভক্ত ছিলেন।

শিক্ষকতা জীবনে প্রথমে সিলেট ও কুমিল্লার কয়েকটি মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। অতঃপর কিশেরগঞ্জের শহিদী মসজিদ স্থাপন করেন। মসজিদের পাশে ১৯৪৫ সালে সুবিখ্যাত মাদ্রাসা 'জামেয়া ইমদাদিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। গতানুগতিক মাদরাসার সিলেবাসের বাইরে তাঁর মাদরাসায় বাংলা, ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান, টাইপরাইট, টেলিগ্রাফী, সেলাই ও বয়ন প্রভৃতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। তিনি মাদরাসায় গবেষণা ও প্রচার দফতর নামে একটি আলাদা দফতর স্থাপন করেন। তাঁর মাদরাসায় আকর্ষণীয় লাইব্রেরি সংযোজন করা হয় যেখানে প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য কিতাবের সমাহার ছিল। তিনি'আল মুনাদি' নামে একটি মাসিক গবেষণাধর্মী পত্রিকা বের করেছিলেন। প্রায় তিনশত কওমী মাদরাসাকে একত্রিত করে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তিনি কারাজীবন ভোগ করেন। জেলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৯৭৬ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামেয়া ইমদাদিয়া মাদরাসা প্রাঙ্গণে তাঁকে দাফন করা হয়।

৩. মাওলানা মুশাহিদ বাইয়মপুরী মরহুম (১৯০৭-১৯৭০)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার বাইয়মপুর গ্রামে। তিনি ভারতের রামপুর, মীরাট ও দেওবন্দে লেখাপড়া করেন। দেওবন্দের কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী তাঁকে সনদ প্রদান করেন। সনদে অন্যান্য কথার মধ্যে লেখা ছিল 'মুহাম্মদ মুশাহিদ দেওবন্দে হিন্দুস্থানের ভেতরে ও বাহিরের ১৮০জন ছাত্রের মধ্যে সর্বোচ্চ জমাতে সর্বোচ্চ নম্বর লাভ করিয়াছেন।

. . . .আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল ও মহৎ জন্মগত গুণাবলি দান করিয়াছেন। তাঁহার মস্তিষ্ক ও জ্ঞানশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং উজ্জ্বল, চরিত্র মহৎ ও পরিপূর্ণ। . . .তাহার জীবন ধারা সুপবিত্র, কলুষমুক্ত ও সর্বক্ষেত্রে প্রশংসনীয়।'

তিনি গাছবাড়ি মাদরাসার মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গাড়বাড়ি মাদরাসায় দাওয়রায়ে হাদীস ও কামিল ক্লাস খোলা হয়। তিনি দারুল উলূম কানাইঘাট মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১০টি গ্রন্থ রচনা করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাঁর 'ইসলামে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার' বইটি প্রকাশ করে।

তিনি ১৯৬২ সালে পাকিস্তন জাতীয় পরিষদের সদস্য (এম.এন.এ) নির্বাচিত হন। তাঁর নির্বাচনী এলাকা ছিল জৈন্তাপুর, কানাইঘাট জকিগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার।

www.pathagar.com

৪. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক মরহুম (১৯২৮-২০০৭)

জন্ম-জকিগঞ্জ উপজেলার বারঠাকুরী গ্রামে। তিনি ভারতের দেওবন্দে অধ্যয়ন করেন। যে সকল মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন সেগুলো হল।

১. ঢাকার বড় কাটরা মাদরাসা।
২. ভারতের শাহজাহানপুর মাদরাসা।
৩. পাকিস্তানের করাচীর দারুল উলূম মাদ্রসা।
৪. ঢাকা সরকারি আলীয়া মাদরাসা।
৫. ঢাকার এমদাদুল উলূম ফরীদাবাদ মাদরাসা।
৬. চট্টগ্রামের পটিয়া জামেয়া ইসলামীয়া মাদরাসা।
৭. সিলেটের কাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল (র) মাদরাসা।
৮. ঢাকার ফয়জুল উলূম আজিমপুর মাদরাসা

তিনি জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সদস্য এবং প্রায় সকল ইসলামী ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির শরিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ১০-এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মিশর, সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, বিলাত, আমেরিকা, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, মরক্কো, রাশিয়া ও ভারত সফর করেন।

প্রথম জীবনে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির সাথে জড়িত ছিলেন। আন্তর্জাতিক মজলিসে তাহাফুজে খতমে নবুওত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

সরকারি আলিয়া মাদরাসার হেড মৌলানা হিসেবে অবসর নেবার পর আমরন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার তাঁকে এ দায়িত্ব থেকে অপসারণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তিনি খুবই যুগোপযোগী খুতবা প্রদান করতেন। তিনি আলেম সমাজের ঐক্যের প্রতীক এবং আলে সমাজের মুখপাত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। আজ পর্যন্ত তাঁর রিপ্লেসম্যান্ট হয় নি।

৫. মাওলানা ইব্রাহিম তশনা মরহুম (১৮৭০-১৯৩০)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার বাটই আইল গ্রামে। তিনি গোলাপগঞ্জের ফুলবাড়ি মাদরাসা, দেওবন্দ ও দিল্লিতে পড়াশুনা করেন।

তিনি ১৮৯৮ সালে কানাইঘাটের উমরগঞ্জ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাজবিদের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের শিক্ষাদানের জন্য তিনি বাহির থেকে উস্তাদ নিয়ে আসেন । ১৯৩০ সালে তিনি পুনরায় হিন্দুস্থান যান। সেখানে তিনি 'ইলমে হাদীস' ও 'ইলমে মারিফত' হাসিল করেন। তিনি হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবীর মুরীদ হন। ১৯০৬ সালে তাঁর মাদরাসা প্রাঙ্গণে বিরাট ইসলামী মাহফীলের ব্যবস্থা করেন। এরপর থেকে এ অঞ্চলে বিরাট আকারের ইসলামী মাহফিলের প্রচলন হয়। তিনি এ এলাকায় খিলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং জেল খাটেন। তিনি সুবক্তা ও কবি ছিলেন।

www.pathagar.com

৬. শামসুল উলামা আবু নছর ওহিদ মরহুম (১৮৯২-১৯৫৩)

জন্ম-সিলেট শহরের হাওয়াপাড়ায়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯৭ সালে আররীতে বি.এ অনার্স ও পরে এম.এ. পাস করেন। তিনি আরবিতে এম.এ পাস করা প্রথম বাঙালি মুসলমান।

তিনি কলকাতায় আলিয়া মাদরাসায় উস্তাদ নিযুক্ত হন। ১৯০৬ সালে গৌহাটি কটন কলেজের আরবি ও ফার্সীভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯০৫ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডি বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৫ থেকে ১৯২০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। ১৯১৪-১৯১৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডি বিভাগের পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করেন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। মুসলিম এ্যাডুকেশন এডভাইজারী কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রিফর্মড (Reformed) মাদরাসার (হাই মাদরাসার) উদ্ভাবক ও প্রবর্তক। তাঁর বড় ছেলে ইস্ট পাকিস্তান স্কুল পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান আবু সাঈদ মাহমুদ, অন্য ছেলে ফজলুর রব কুমিল্লা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান।

৭. মাওলানা আব্দুর রশীদ মরহুম (১৮৯৬-১৯৬৪)

জন্ম-গোলাপগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীপাশা গ্রামে। তিনি জমিয়তে উলমায়ে হিন্দের নেতা ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ভারতীয় কংগ্রেস দলের নমিনেশনে আসাম প্রাদেশিক আইন পরিষদের (এম এল এ) নির্বাচনে মুসলিম লীগের আব্দুল মতিন চৌধুরী নিকট পরাজিত হন। তবে ১৯৪৬ সালে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন। বিজয় লাভের পর তিনি আসামের কংগ্রেসের গোপীনাথ বড়দলই মন্ত্রিসভার আসাম প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালের পর তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বেশ কয়েকটি স্কুল মাদ্রসা ও টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। তিনি রাস্তাঘাটসহ বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেন।

৮. মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া মরহুম (১৮৯৪-১৯৬৯)

জন্ম-গোলাপগঞ্জ উপজেলার বরায়া পরগনার রফিপুর গ্রামে। তিনি সিলেট আলিয়া মাদরাসা থেকে টাইটেল পাস করেন। পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ২টি স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। সিলেট অঞ্চলের খেলাফত আন্দোলনের সহকারী সেক্রেটারী এবং প্রাদেশিক ওলামা কনফারেন্সের সেক্রেটারী ছিলেন। খিলাফত আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা পালনের কারণে তাঁকে এক বছর জেল খাটতে হয়। ১৯২২ সালে সিলেটের মানিকপীর রোডে ঐতিহাসিক খিলাফত বিল্ডিং ও খিলাফত অফিস স্থাপন করেন। খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেন। এ ছাড়া

www.pathagar.com

আসামের কুখ্যাত লাইন প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেন। পরে মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং পাকিস্তান আন্দোলন ও রেফারেন্ডামে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা আতহার আলীর আহবানে তিনি নেজামে ইসলামে যোগদেন এবং যুক্তফ্রন্টের টিকেটে ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া সাপ্তাহিক যুগভেরী ও সাপ্তাহিক আনসার পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 'নেজামে ইসলাম', 'জেহাদ' ও 'কেন পাকিস্তান চাই' নামে তিনটি বই রচনা করেন। ইসলামী ফাউন্ডেশন তাঁর নেজামে ইসলাম বইটি 'ইসলামী শাসনব্যবস্থা' নামে প্রকাশ করে। তিনি জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদুদীর প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর কাছে মাসিক তরজমানুল কুরআন ও মাওলানা মওদুদীর বই মজুদ ছিল।

৯. মাওলানা আব্দুর রহমান সিংকাপনী মরহুম (১৮৮৯-১৯৬১)

জন্ম-মৌলভীবাজার জেলার ইটা পরগনার সিংকাপন গ্রামে। তাঁর তিন ভাই আব্দুল কাদির সিংকাপনী, আব্দুল খালিক সিংকাপনী ও আব্দুল আজীজ সিংকাপনী প্রখ্যাত আলেম ও তেজস্বী ওয়ায়েজ ছিলেন। স্থানীয়ভাবে তাঁরা সিংকাপনী ব্রাদার্স নামে পরিচিত।

আব্দুর রহমান সিংকাপনী কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে টাইটেল পাস করেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর পরিচয় হয়। তিনি তাঁকে নবাব বাড়িতে পারিবারিক মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি সর্বপ্রথম সিলেট অঞ্চলে খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন এবং কারারুদ্ধ হন। তিনি চাষী আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন ও সিলেটে গণভোট আন্দোলনের প্রথম কাতারের সৈনিক ছিলেন। তিনি কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দক্ষিণহস্ত ভাদেশ্বরের আব্দুল মতিন চৌধুরীর (কলা মিয়া) আহবানে মুসলিম লীগে যোগ দেন । তিন নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলার হিসেবে লক্ষ্ণৌ, করাচী, লাহোর ও কলকাতা অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের যে অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহিত হয়, কাউন্সিলার হিসেবে তিনি বৈঠকে যোগদান করেন। তিনি ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের দিল্লি কনভেনশনে যোগদান শেষে সিলেট এসে মন্তব্য করেছিলেন "একটি মারাত্মক ভুল হয়ে গেল দেড়হাজার মাইল দূরে অবস্থিত দুই জনগোষ্ঠী নিয়ে এক রাষ্ট্র গঠন অবাস্তব।" তিনি বহু মসজিদ মাদরাসা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে লোকনাথ রতনমনী টাউন হলে কৃষক সমাবেশ আহবান করেন এবং মাসব্যাপী কৃষি মেলার আয়োজন করেন। তিনি 'আল জালাল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১০. শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব উরফে হাতিম আলী শাহ মরহুম (১৮৫৭-১৯৫৮)

জন্ম-১৮৫৭ সালে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বছর বৃহত্তর সিলেটের করীমগঞ্জ মহকুমার বদরপুরের বুন্দাশীল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ঐতিহাসিক সিপাহী পরিবারে।

www.pathagar.com

তিনি অল্প বয়সে পিতা হারিয়ে মামার অভিভাবকত্বে স্থানীয় বাগবাড়ি মাদরাসা, গোলাপগঞ্জের ফুলবাড়ি মাদরাসা, বিহারের কটক আলিয়া মাদরাসা ও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রামপুরায় পড়াশুনা করেন।

কর্মজীবনে তিনি কাছাড় জেলার কাঠিগড়া মাদরাসা ও আসামের জয়নগর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে নিজ এলাকায় বদরপুর আলিয়া মাদরাসা স্থাপন করে আজীবন এ মাদরাসার খেদমত করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মুর্শিদ মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা হাফিজ আহমদ জৌনপুরী। তাঁর কাছ থেকে তিনি খিলাফত প্রাপ্ত হন।

তিনি আসাম বাংলার জনগণের কাছে 'বদরপুরের ছাহেব' হিসেবে পরিচিত। জনগণ তাঁর আরো একটি নাম রাখেন-সে নামটি হল হাতিম আলী শাহ। দান খয়রাতে তিনি এত মশহুর ছিলেন যে আরবদেশের সুবিখ্যাত দাতা হাতিম তাঈর স্মরণে তাঁর নাম রাখা হয় হাতিম আলী শাহ। আল্লাহ পাক তাকে যে সহায়-সম্পত্তি দান করেছিলেন অকাতরে তিনি তা বিলিয়ে দিতেন। তিনি বহু মসজিদ, মাদরাসা ও মক্তবের প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি ইলমে ক্বিরাতের সুপন্ডিত ছিলেন। নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ছহি তেলাওয়াতের প্রতি তিনি তীক্ষ্ণ নযর রাখতেন। তাঁর দরবারে বহু আলেম উলামাদের শুভাগমন হত। তিনি মুরব্বী হিসেবে তাদের তেলাওয়াত শুনতেন এবং প্রয়োজনীয় নসিহত করতেন।

মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী বদরপুরের সাহেবের প্রিয় ছাত্র, তাঁর মাদরাসার এককালীন উস্তাদ ও তাঁর আদরের কন্যা খোদেজা খাতুনের স্বামী।

তিনি ১০২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

১১. হাফিজ মাওলানা আব্দুল করিম শায়খে কৌড়িয়া মরহুম (১৯০১-২০০১)

জন্ম-বিশ্বনাথ উপজেলার কৌড়িয়া পরগনার খাজাঞ্চী ইউনিয়নে গমরুগুল গ্রামে। তাঁর পিতা শায়েখে কৌড়িয়া মাওলানা আব্বাস আলী মরহুম কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে টাইটেল পাস, অত্যন্ত পরহেজগার আলেমে দ্বীন ছিলেন।

তিনি হাজীগঞ্জ কওমী মাদরাসা, ফুলবাড়ি মাদরাসা, আসামের করীমগঞ্জ বড়বাজার মাদরাসা, ভারতের জামেয়া ইসলামিয়া আমরোহা মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। শেষোক্ত মাদরাসায় তিনি কুরআন শরীফ হিফজ করেন। অতঃপর ১৯২৯ সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ ভর্তি হন।

১৯৩৩ সালে তিনি দেওবন্দে পড়াশুনা সমাপ্ত করে কানাইঘাটের রাজাগঞ্জ মাদরাসার প্রধান হাফিজ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর বিশেষ উদ্যোগে রাজাগঞ্জ ঈদগাহ স্থাপিত হয়। তাকে ঐ ঈদগাহের ইমাম নিযুক্ত করা হয়। তিনি রাজাগঞ্জের মাস্টার আব্দুল ওয়াহাব সাহেবের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঐ বিয়েতে দেওবন্দের হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী উপস্থিত হয়ে খুৎবা পাঠ করেন।

www.pathagar.com

দীর্ঘ ৩০ বছর রাজাগঞ্জে অবস্থানের পর তাঁর পিতাঁর ইন্তেকালের আগে পিতাঁর নির্দেশে তিনি বাড়ি চলে আসেন। তাদের বাড়ির পাশে তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মাদরাসা স্থাপন করা হয়। তিনি আমৃত্যু এ মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। এ মাদরাসাই আজকের বিখ্যাত জামেয়া ইসলামিয়া আব্বাসীয়া মাদরাসা।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাথে যুক্ত ছিলেন। সিলেট গণভোটের সময় তিনি ভারতের পক্ষে অবস্থান নেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী তাঁর সমর্থকদের কাছে একটি পত্র লিখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন "আমরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিলাম। যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এখন এ রাষ্ট্রের হেফাজত করা এবং স্বাধীনতাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা পাকিস্তানের সকল নাগরিকের কর্তব্য ।"

মাওলানা মাদানীর এ বক্তব্য অবগত হয়ে শায়েখে কোড়িয়া পাকিস্তানের আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েমে সাংগঠনিক ভাবে সচেষ্ট হন। তিনি ১৯৬৬ সালে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের পূর্ব পাক সভাপতি এবং ১৯৮৪ থেকে ২০০১ পর্যন্ত আমৃত্যু জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আজ পর্যন্ত তাঁর মানের কোন ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন নাই।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হবার পর ১০মাস এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় লাভের পর কয়েকমাস তিনি কারাবরণ করেন। শায়েখে কৌড়িয়া কওমী মাদরাসা বোর্ড 'আযাদ দ্বিনী এদারার' সভাপতি ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এদারার জন্য জমি ক্রয় করা হয় এবং স্থায়ী অফিস নির্মিত হয়।

তিনি খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাঁর সাথে দেখা করতে দেশ বিদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর বাসায় আসতেন। তিনি খুবই সমাদরে মেহমানদারী করতেন। একবার অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব তাঁর লেখা "ইসলামী ঐক্য ও ইসলামী আন্দোলন" বইটি শায়েখে কৌড়িয়াকে নিজ হাতে প্রদানের জন্য তাঁর চৌফিদেখিস্ত বাসভবনে এক প্রভাতে আগমন করেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের সফরসঙ্গীদের মধ্যে এই বইয়ের লেখকও ছিলেন। শায়েখে কৌড়িয়া মেহমানদের আগমনের সংবাদ জানতে পেরে শেষরাতে নিজহাতে রুটি তৈরি করে নিজে পরিবেশন করে মেহমানদের নাশতাঁর ব্যবস্থা করেন।

১২. মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী মরহুম (১৯১৩-২০০৮)

জন্ম-জকিগঞ্জ উপজেলার ফুলতলী গ্রামে। তিনি ভারতের রামপুর ও সৌদি আরবের মক্কা-মুকাররমায় শিক্ষা লাভ করেন। যে সকল মাদরাসায় তিনি উস্তাদ হিসেবে দায়িত্বপালন করেন সেগুলো হলে:

১. ভারতের বদরপুর আলিয়া মাদরাসা।

২. গাছবাড়ি জামেউল উলূম কামিল মাদরাসা।

৩. সৎপুর আলিয়া মাদরাসা।

৪. ইছামতি আলিয়া মাদরাসা।

৫. ফুলতলী কামিল মাদরাসা।

ইলমে কিরাত শিক্ষা দানে তাঁর অবদান তুলনাহীন। উপমহাদেশের বিখ্যাতকারীদের নিকট থেকে শিক্ষালাভের পর তিনি মক্কা মোকাররমায়ি শায়খুল কোররা হযরত আহমদ হেজাজীর কাছ থেকে ইলমে কেরাতের সনদ লাভ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি নিজ বাড়িতে ইলমে কেরাতের দারস চালু করেন। তাঁরপর তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় আব্বার নামানুসারে 'দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট' গঠন করেন। তিনি এ ট্রাস্টের আজীবন চেয়ারম্যন ছিলেন। এ ট্রাস্টের খরচ বহনের জন্য ৩৩ একর জমিদান করেন। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে ৯ শতাধিক শাখা কেন্দ্র স্থাপন করে ইলমে কিরাত শিক্ষা দেওয়া হয়। ছহী কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার যে নজীর তিনি স্থাপন করেছেন উপমহাদেশে তা অতুলনীয়।

তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। ইসলাম বিরোধি তৎপরতা রোধে গঠিত সংগ্রাম পরিষদের নেতা ছিলেন। নিম্নবর্ণিত সংগঠনসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১.আঞ্জুমানে তালামিযে ইসলামীয়া। ২. আঞ্জুমানে আল ইসলাহ।। ৩. আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকে। ৪. মুসলিম হ্যান্ডস বাংলাদেশ।

তিনি বৃদ্ধানিবাসের পৃষ্ঠপোষক, জমিয়তুল মোদাররিসীনের উপদেষ্টা এবং আঞ্জুমানে মাদারিসে আরাবিয়ার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

এ ছাড়াও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন :

১. লতিফিয়া ফাউন্ডেশন। ২. লতিফিয়া এতিম খানা। ৩. লতিফিয়া দারুল মুত্তালা।

তিনি দেশেও বিলাতে বহু মসজিদ ও মাদরাসা স্থাপন করেন। তিনি ১০এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মাসিক ম্যাগাজিন 'পরওয়ানা' ও 'পরওয়ানা পাবলিকেশন্স' এর প্রতিষ্ঠাতা।

১৩. হযরত মাওলানা হরমুজ উল্লাহ মরহুম আমীর তাবলীগ জামাত (১৯০৩-২০০১)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার ঝিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের আগফৌজ নারাইনপুর গ্রামে। তিনি গাছবাড়ি মাদরাসায় কয়েক জামাত পড়ে ভারতের দেওবন্দে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

সেখান থেকে ফিরে তাঁর পিতাঁর নতুন বসতি আসামের সুনামপুরে একটি মাদরাসা স্থাপন করে তিনি মাদরাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের ৫/৬ মাস পর তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। জানা যায় তিনি দেশের বাইরে তাবলীগের কাজে ব্যস্ত আছেন। তাঁর খোঁজ পাবার পর মাওলানা মুশাহিদ বাইয়ামপুরী ও মাওলানা ইয়াকুব সাহেব তাঁকে বাড়িতে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে তখনকার তাবলীগ জামাতের

www.pathagar.com

আমীর মাওলানা ইলিয়াস (র) এর নিকট পত্র লিখেন। পত্র মারফত অনুরোধ পেয়ে তাকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দেশে এসে তিনি গাছবাড়ি মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। অতঃপর এ মাদরাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা ইয়াকুব সাহেব অবসরে চলে গেলে তিনি ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে তিনি তাবলীগ জামাতেও প্রচুর সময় দিতে থাকেন। এ সময় সিলেট জেলার তাবলীগ জামাতের আমীর ছিলেন এম.সি. কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জনাব আব্দুল খালেক। তিনি বদলী হয়ে যাওয়ায় মাওলানা হরমুজ উল্লাহ সিলেট জেলার আমীর নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য, তাবলীগ জামাতের সিলটের প্রথম মরকজ ছিল ধোপাদিঘির উত্তর পার মসজিদে। তাঁরপর কিছু দিনের জন্য মরকজ স্থানান্তর হয় বন্দরবাজার জামে মসজিদ। অবশেষে মরকজ চলে যায় সুরমা নদীর দক্ষিণ পারে খোজার খোলা জামে মসজিদে।

মাওলানা হরমুজ উল্লাহ দায়িত্ব নেবার পর তাবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় মারকজ ঢাকার কাকরাইল মসজিদে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি তাবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় মরকজ পরিচালক মুরুব্বীদের মধ্যে একজন হয়ে যান। টঙ্গীতে প্রতিবছর বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বিশ্ব-ইজতেমা আয়োজনকারীদের মধ্যে অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তাবলীগ জামাতের মিশন নিয়ে তিনি দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। খুব সাদাসিদে জীবন যাপনকারী মাওলানা হরমুজ উল্লাহ ছিলেন সুন্নাতের আন্তরিক পাবন্দ। তাঁর বক্তব্যের নৈতিক প্রভাব ছিল অসাধারণ। বহুলোক তাঁর বক্তব্য শুনে তাবলীগ জামাতে সময় দিতে প্রস্তুত হত। তিনি বহু লোকের জীবনযাপন পদ্ধতি পাল্টিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আজ পর্যন্ত কোন একক ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয় নি।

১৪. মাওলানা ইব্রাহিম চতুলী মরহুম (১৮৯৪-১৯৮৪)

জন্ম-জৈন্তাপুর উপজেলার চতুল পরগনার হারাতৈল গ্রামে। তিনি ঝিঙ্গাবাড়ি মাদরাসা, ফুলবাড়ি মাদরাসা ও ভারতের রামপুর মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। তিনি খেলাফত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ১৯২২ সালের ৭ জানুয়ারি কারারুদ্ধ হন। তিনি ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতা। তিনি ১৯৪৬ সালে আসাম আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। রেফারেন্ডামের সময় তিনি সিলেটকে ভারতের সাথে সংযুক্ত রাখার পক্ষে আন্দোলন করেন। তবে সিলেট পাকিস্তানভুক্ত হবার পর প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে পাকিস্তানের আনুগত্য প্রকাশ করেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রধান কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী ভারত বিভাগ পূর্ব পর্যন্ত প্রতিবছর রমজান মাসে সিলেটের ঐতিহাসিক নয়াসড়ক মসজিদের এতেকাফ করতেন। মাওলানা ইব্রাহিম চতুলী ছিলেন সে বিখ্যাত নয়াসড়ক মসজিদের পেশ ইমাম।

১৫. হাফিজ মাওলানা আকবর আলী মরহুম (১৯২০-২০০৫)

জন্ম-বিয়ানীবাজার উপজেলার মাটিজুরা গ্রামে। তিনি প্রথম দিকে মাথিউরা মাদরাসা, বাহাদুরপুর মাদরাসা এবং সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় পড়া শুনা করেন। তিনি

www.pathagar.com

আসাম প্রদেশ ভিত্তিক বৃত্তি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষার জন্য ভারত গমন করেন। তিনি ২মাস মুরাদাবাদ অবস্থান করেন। তাঁরপর রামপুর ও দেওবন্দে পড়াশুনা করেন।

তিনি হাফিজে কুরআন ছিলেন। কিন্তু কোন হেফজখানায় বা কোন হাফিজি মাদরাসায় ভর্তি না হয়েই তিনি নিজে নিজে করআন মুখস্ত করেন। অতঃপর প্রসিদ্ধ কয়েকজন উস্তাদকে কুরআন শরীফ হিফজ শুনান। তিনি স্থানীয় কয়েকজন ক্বারীর তত্ত্বাবধানে ছহী তেলাওয়াত শিক্ষাগ্রহণ করেন। শুধু ইলমুল ক্বিরাত অধ্যয়নের জন্য ভারতের বিহারের আজিজিয়া মাদরাসায় ৬মাস অবস্থান করেন।

কর্মজীবনে তিনি প্রথমে আছির খাল মাদরাসায় উস্তাদ নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি দরগাহে শাহজালাল মসজিদে প্রতি রমজান মাসে ছালাতুল তাঁরাবীর ইমামতি করতেন। সিলেটে গণভোটে দরগাহ মসজিদের ইমাম ও খতিব বিতর্কিত হয়ে যাবার পর হাফিজ মাওলানা আকবর আলী সাহেবকে মাত্র ৫ টাকা বেতনে দরগাহ মসজিদের ইমাম ও খতিব নিযুক্ত করা হয়। ঐ সময় কিছু ছাত্র তাঁর কাছে কুরআন শিখতে আসত। তিনি তাদেরকে ফ্রি পড়াতেন। তাদেরকে পড়াতে গিয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং মসজিদ সংলগ্ন খালি জায়গা মাদরাসায়ে কাসিমুল উলূম স্থাপন করেন। বর্তমানে এ মাদরাসায় টাইটেল ক্লাশ চালু আছে। তিনি আজীবন এই মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন।

তিনি খুবই কুরআন প্রেমিক ছিলেন। তিনি রিক্সায় বা গাড়িতে চড়ে কারো সাথে কথা না বলে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকতেন।

কোন মসজিদ বা মাদরাসায় তাকে দায়াত করলে তিনি হাদীয়া গ্রহণ করতেন না। উল্টো নিজের পকেট থেকে কমবেশ পরিমাণ অর্থ দিয়ে আসতেন। তিনি খুবই দানশীল ছিলেন। ছাওয়াল করে কেউ তাঁর কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে আসে নাই। দেশের বাইরে থেকে কোন আলেম সিলেটে আসলে তাঁর সাথে দেখা না করে যেতেন না। তিনি তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। তিনি দেওবন্দের ক্বারী তৈয়ব সাহেবের খলিফা ছিলেন।

১৬. হযরত মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্নভী মরহুম (১৯১৬-১৯৭৭)

জন্ম-মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার বরুণা গ্রামে।

পিতা মাতাঁর কাছে প্রাথমিক শিক্ষার পর গাছবাড়ি মাদরাসায় ভর্তি হন । এ মাদরাসায় পড়াশুনা শেষ করে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে যান। দেওবন্দ মাদরাসায় পড়াশুনা শেষ করে তিনি হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর খেদমতে কিছুদিন অবস্থান করেন। তিনি হযরত মাদানীর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি হযরত মাদানীর খলিফা নিযুক্ত হন।

কর্মজীবনে লুৎফুর রহমান বর্নভী মৌলভীবাজার দারুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি নিজ গ্রামে একটি মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করে নিজস্কন্ধে মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এ মাদরাসা বিরাট মাদরাসায় পরিণত হয়। মাদরাসার

www.pathagar.com

বর্তমান নাম 'জামেয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলূম হামিদ নগর টাইটেল মাদরাসা।' তাঁর সুযোগ্য সন্তান মাওলানা খলিলুর রহমান বর্নভী এ মাদরাসার বর্তমান মুহতামিম।

তিনি হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর মুরীদ হওয়া সত্ত্বেও সিলেটের গণভোটের সময় ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের আমলে ইসলাম বিরোধি মুসলিম পারিবারিক আইন জারী করা হলে তিনি এ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হয়।

ইসলামের খেদমতের জন্য কলমের শক্তির উপর তিনি পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। হেফাজতে ইসলাম নামে প্রথমে একটি মাসিক পত্রিকা, পরে সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। মাওলানা বর্নভী হেফাজতে ইসলামের নামে একটি অরাজনৈতিক সেবাধর্মী সংগঠন গড়ে তুলেন। তিনি সব এলাকায় ওয়াজ মাহফিলে শরীক হতেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল 'আজ ইসলামের ঘরে আগুন লেগেছে। যার কাছে যে পাত্র আছে তা ভর্তি করে পানি নিয়ে এসে ঘরের আগুন নিভাও। কার পাত্র ছোট, কার পত্র বড় , কারপাত্র চেপ্টা বা কার পাত্র গোল ইত্যাদি নিয়ে ঝগড়ার সময় এখন নয়। আগুন নেভানো এখন আসল কাজ।'

১৭. মাওলানা শফিকুল হক বুলবুল মরহুম (১৯২৭-২০০১)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার ধলিবিলি দক্ষিণ (নয়াগাঁও) গ্রামে।

লেখাপড়া : গাছবাড়ি জামিউল উলূম মাদরাসায় ফাজিল তাঁরপর সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেন। তিনি আসাম বোর্ডের অধীনে প্রতিটি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান দখল করেন। কামিল পরীক্ষায় পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ১ম বিভাগে ৩য় স্থান লাভ করেন। অতঃপর ভারতের দেওবন্দে অধ্যয়ন করেন। সেখানে অধ্যয়ন শেষ করে দারুল ইফতায় কিছুদিন কাজ করেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে 'বুলবুলে বাঙ্গাল' উপাধি প্রদান করা হয়।

দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসামের মুড়াঝর আনওয়ারুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। অতঃপর কানাইঘাট মনসুরিয়া মাদরাসায় (বর্তমান দারুল উলূম) পরে গাছবাড়ি দারুল উলূমে শিক্ষকতা করেন।

১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি গাছবাড়ি মাদরাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। এখান থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি মোগলাবাজার রেঙ্গা মাদরাসা ও দরগাহে শাহজালাল কাসিমুল উলূম মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা শফিকুল হক বুলবুল ছিলেন বিরল কিতাব প্রেমিক। বাহারুল উলূম মাওলানা মোহাম্মদ হোসেনের পর সম্ভবত তিনিই জালালাবাদ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি কিতাব অধ্যায়ন করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভাদুঘর আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা আশরাফ আলী মন্তব্য করেছেন যে, 'সম্ভবত পৃথিবীতে এমন কোন মৌলিক ইসলামী কিতাব নাই যা বুলবুল সাহেব পাঠ করেন নি।'

www.pathagar.com

তিনি প্রথমে কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে শহীদ মুস্তফা আল-মাদানীর নিকট পুনরায় বাইয়াত হন। শেষ জীবনে তিনি জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত হন। তাঁর এলাকায় জামায়াতের কোন সভা অনুষ্ঠিত হলে তিনি সভাপতিত্ব করতেন। বিশেষ করে সিলেট-৫ আসনের জামায়াতের মনোনীত এম.পি. প্রার্থী মাওলানা ফরীদ উদ্দীন চৌধুরীর নির্বাচনী সভাগুলোতে (তাঁর এলাকায়) তিনি হতেন মিটিং-এর সভাপতি।

এ গ্রন্থের লেখকের সাথে মাওলানা বুলবুল সাহেবের একাধিকবার সিলেট পৌর এলাকায় কুদরতউল্লাহ্ জামে মসজিদে রমজান মাসে এতেকাফ করার সুযোগ হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে রোজা রেখে তাঁর লেখাপড়া ও কলম চালনা দেখে লেখককে আশ্চর্য হতে হয়েছে। তিনি অত্যন্ত মূল্যবান ৩৫টি বই রচনা করেছেন।

১৮. মাওলানা নুরউদ্দিন আহমদ গহরপুরী মরহুম (১৯২৪-২০০৫)

জন্ম-বালাগঞ্জ উপজেলার গহরপুর গ্রামে। তিনি জালালপুর মাদরাসা, বাঘা আলিয়া মাদরাসা এবং ভারতের দেওবন্দে পড়াশুনা করেন।

বাঘায় অধ্যয়নকালীন সময়ে অন্যান্য ছাত্ররা যখন ঘুমিয়ে থাকত তখন তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ করা আরম্ভ করতেন। এ ভাবে উস্তাদ বিহীন সাধনায় তিনি হাফিজে কুরআন হন।

কর্মজীবনে প্রথমে তিনি বরিশাল পাঙ্গাসিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে নিজ এলাকায় চলে আসেন এবং গহরপুর মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আজীবন গহরপুর মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। এ ছাড়া আরো তেরটি মাদরাসা তাকে মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে রাখে। ১৯৬৬ সাল থেকে আজীবন তিনি কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি তাঁর উস্তাদ হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মদনীর সাথে হজ্ব ও উমরা পালন করেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি বালাগঞ্জ বিশ্বনাথ, গোলাপগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা থেকে এম.এন.এ. হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উল্লেখযোগ্য ভোট লাভ করেন। ইসলাম বিরোধি কার্যকলাপ দেখলে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ গর্জে উঠত। তাঁর এলাকায় যাত্রাপালা গান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতে পারে নি।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তাঁকে কিছুদিন জেল খাটতে হয়। জেলে থাকতে সকল মত ও পথের আলেমগণ একমত হয়েছিলেন যে তাঁরা জেল থেকে বের হবার সুযোগ পেলে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করবেন । বাস্তবে জেল থেকে বের হবার পর আলেমগণ আগের কথা রাখেনি। তিনি আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে সফলকাম হতে না পেরে নীরব হয়ে যান।

১৯. মাওলানা বশির আহমদ শায়েখে বাঘা মরহুম (১৮৯৫-১৯৭১)

জন্ম-গোলাপগঞ্জ থানার বাঘা গ্রামে। মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ফুলবাড়ী মাদ্রাসা ও আসামের করিমগঞ্জ বড়বাজার ইসলামী মাদরাসায় পড়াশুনা সমাপ্ত করেন। অত:পর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ভারতের ঐতিহাসিক মুরাদাবাদ শাহী মাদরাসায় ভর্তি হন। মাদরাসার কোর্স সম্পন্ন করে পরবর্তীতে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন।

www.pathagar.com

দেওবন্দে মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর সান্নিধ্যে বেশ কিছু দিন অবস্থান করে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। খলিফা নিযুক্ত হন। দেশে ফিরে তিনি বাঘার গৌর-বাড়ী এলাকায় একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। ১৯২৯ সালে মাওলানা বশির আহমদ শায়খে বাঘা মাদরাসাটি একটি প্রশান্ত স্থানে স্থানান্তরিত করেন। এ মাদরাসাটি এলাকার গৌরব, দ্বীনি শিক্ষার মরকজ আজকের "বাঘা স্থাগোলাপনগর আরাবিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা।" বহু প্রতিষ্ঠিত আলেম এ মাদরাসায় পড়াশুনা করে নানাভাবে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। দারুল

শায়েখে বাঘা খুবই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। তিনি তার এলাকার ইসলাম ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ দমন করেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি অতুলনীয় সাহসিকতার পরিচয় দেন।

আন্দোলনের কারণে তাঁর মাদরাসার উস্তাদ ও ছাত্রদেরকে একাধিকবার জেল খাটতে হয়েছে। উস্তাদ

বহু মসজিদ ও মাদরাসার প্রতিষ্ঠায় তার অবদান রয়েছে। বিশেষ করে সিলেট শহরের নয়াসড়ক হাফিজিয়া মাদরাসা ও কুমারপাড়া হাফিজিয়া মাদরাসা তার হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নামকরা ওয়ায়েজ ছিলেন। দীর্ঘদেহী হওয়ায় এবং পায়ের আঙ্গুলে সমস্যা থাকার কারণে তাঁকে পালকী যোগে ওয়াজ মাহফিলে নেওয়া হত।

ভারত বিভাগের পূর্ব থেকে তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি আসাম প্রদেশের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাথে জড়িত হন এবং কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে তাঁর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের একটি শক্তিশালী টীম লাহোরে নিখিল পাক জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের ৩দিন ব্যাপী সম্মেলনে যোগদান করে। এ সম্মেলনে শায়েখে বাঘার সভাপতিত্বে একটি অধিবেশনে হাফিজুল হাদিস মাওলানা আব্দুলাহ দরখাস্তী জমিয়তের কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং মুফতি মাহমুদ সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। মাওলানা বশির আহমদ শায়খে বাঘা হন কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি। তিনি আজীবন এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় কুরআনে হাফিজ হন। তাহাজ্জুদে তিনি দীর্ঘ সময় তেলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। ইন্তেকালের আগের রাতে তিনি তাহাজ্জুদে আড়াইপাড়া কুরআন তেলাওয়াত করেন।

২০. আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি মরহুম (১৯১৫-১৯৯০)

জন্ম-গোলাপগঞ্জ থানার ফুলবাড়ি গ্রামে। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (র) এর বংশধর। তিনি প্রাইমারী স্কুলের লেখাপড়ার সমাপ্ত করে গোলাপগঞ্জ এম.সি একাডেমীতে ভর্তি হন। ৭ম শ্রেণী পাস করার পর তিনি একদিন অভিভাবকসহ দেওবন্দ থেকে আগত হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর সাথে সিলেটের নয়াসড়ক মসজিদে সাক্ষাৎ করেন। মাওলানা মাদানী তাঁর বংশ পরিচয় জানতে পেরে এবং তাঁর মেধার পরিচয়

www.pathagar.com

পেয়ে তাকে দেওবন্দ নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অভিভাবকের সম্মতি পেয়ে মাওলানা মাদানী তাকে দেওবন্দে নিয়ে যান।

তিনি ১৯২৮ থেকে ১৯৩৬সাল পর্যন্ত দেওবন্দে অবস্থান করে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি লাহোরে আল্লামা আহমদ আলী লাহোরীর তত্ত্বাবধানে আরো পড়াশুনা করেন। লাহোর থেকে তিনি মদীনা শরীফ গমন করেন। সেখানে আল্লাহর রাসূল (স) এর রওজার পাশে অবস্থান করে আরো দুই বছর হাদীসের উপর অধ্যয়ন করেন। মদীনায় তিনি কুরআন শরীফ হিফজ করেন। মদীনা থেকে ফিরে তিনি আবার দেওবন্দে অবস্থান করেন এবং পড়াশুনা ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যান।

শায়খে ফুলবাড়ি মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি মাওলানা মাদানীর খলিফা নিযুক্ত হন।

কর্মজীবনে তিনি দারুল উলূম হোসেনিয়া ঢাকা দক্ষিণ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এ ছাড়া তিনি গোলাপগঞ্জ বাঘা মাদরাসা, হবিগঞ্জ রায়ধর মাদরাসা, হবিগঞ্জ উমেদনগর মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার মল্লিকপুর দারুল উলূম মাদরাসা তাঁর হাতে স্থাপিত হয়। এছাড়া ফুলবাড়ি মোকাম মসজিদসহ বহু মসজিদ মক্তবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি প্রথমে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাথে জড়িত হন এবং আজাদী আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামী শাসন কায়েমে সচেষ্ট ছিলেন।

মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়েখে ফুলবাড়ি আশির দশকে মাওলানা মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তাবলীগ জামাতের সাথেও জড়িত ছিলেন। তাবলীগ জামাতের মিশন নিয়ে তিনি দুনিয়ার প্রায় সবদেশই সফর করেন।

তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের রচয়িতা। তিনি ভাল ওয়ায়েজ ছিলেন। তিনি বাংলা, উর্দু, আরবি ও ফার্সি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ইংরেজি ভাষায় অনর্গল কথাবার্তা বলতে পারতেন।

২১. মাওলানা কাজী ইব্রাহিম মরহুম (১৯০৫-১৯৯৬)

জন্ম-বিয়ানী বাজার উপজেলার বড়দেশ গ্রামে। তিনি বড়দেশ মাদরাসা, বিয়ানী বাজার আলীয়া মাদরাসা, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় ও কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। উল্লেখ তিনি একটি পরীক্ষায় সমগ্র আসাম প্রদেশের মধ্যে ১ম স্থান অধিকার করেন। অন্যান্য পরীক্ষায়ও তিন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনে তিনি মরহুম মাওলানা আতহার আলী প্রতিষ্ঠিত কিশোরগঞ্জ মাদরাসায় ৩ বছর হেডমাওলানা হিসেবে অতঃপর বিয়ানীবাজার মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করেন। তিনি ইমাম ও খতীব হিসেবে বিয়ানীবাজার উত্তর জামে মসজিদ, সিলেট বন্দরবাজার জামে মসজিদে (১৩ বছর) ও দরগাহে শাহজালাল জামে মসজিদে (৫ বছর) দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কাজী ও মুফতী ছিলেন।

মাওলানা আতহার আলী সাহেবের সংস্পর্শে এসে নেজামে ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হন। তিনি সিলেটে গণভোটের সময় পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন।

তিনি শিরক ও বিদাতের বিরুদ্ধে সর্বদা সংগ্রামরত ছিলেন। তিনি আলেম সমাজের ঐক্যের ব্যাপারে ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬১ সালে সিলেট শাহী ঈদগাহ ময়দানে ইসলামী সেমিনারে সকল মত ও পথের শ্রদ্ধেয় আলেমদের একমঞ্চে আরোহনের ব্যাপারে তিনি সর্বাধিক ভূমিকা পালন করেন। শেষ জীবনে তাবলীগ জামাতে যথেষ্ট সময় দান করেন। তিনি সুবক্তা ছিলেন। যুক্তির মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। মাওলানা কাজি ইব্রাহিম তিনটি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন।

২২. *মাওলানা হরমুজ উল্লাহ শায়দা মরহুম (১৯০৭-১৯৯০)*

জন্ম-সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজিলার দাউদপুর ইউনিয়নের তুড়ুকখলা গ্রামে।

পাঠশালা সমাপ্ত করে স্থানীয় মোগলাবাজার হাই স্কুলে ভর্তি হন। অত:পর নিজের ইচ্ছায় ও অভিভাবকের সম্মতিতে তিনি স্কুলের কোর্স সমাপ্ত না করে দাউদপুর জুনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। জুনিয়র মাদ্রাসা কোর্স সমাপ্ত করে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ফাজিলে তিনি মাদরাসা বোর্ডের পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে সোনার মেডেল লাভ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সাথে টাইটেল পাস করেন।

কর্মজীবনে তিনি প্রথম কুষ্টিয়ায় একটি হাই মাদরাসার সুপার পদে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে তিনি নিয়োগ লাভ কনে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি সিলেট সরকারী আলিয়া মাদরাসার উস্তাদ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি উচুমানের উস্তাদ ছিলেন। এ ছাড়া সুবক্তা এবং সমাজসেবী ছিলেন। বাংলা, উর্দু, ফার্সি ও আরবি ভাষায় অত্যান্তদক্ষ ছিলেন। তিনি কবি ছিলেন। তিনি বাংলা, উর্দু, ফার্সি ও আরবি ভাষায় কবিতা লিখতেন। তাঁর রচিত কসিদা দেশ-বিদেশের কবিদের মধ্যে প্রশংসিত হয়। ওয়াজ মাহফিলে বক্তব্যের সাথে সাথে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে তিনি শ্রোতাদের বিমোহিত করে রাখতেন। কাব্য প্রতিভার জন্য তাঁকে উপাধি প্রদান করা হয় শায়দা।

২৩. **মাওলানা রমিজ উদ্দিন মরহুম** (১৮৭৯-১৯৭৯)

জন্ম-গোলাপগঞ্জ উপজেলার তড়ুকভাগ গ্রামে। তিনি প্রথমে ফুলবাড়ি মাদরাসায় এবং পরে কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাওলানা রমিজ উদ্দিন টাইটেল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসার টাইটেল ক্লাসের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

কর্মজীবনে তিনি প্রথমে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা এবং পরে ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। উল্লেখ্য, এই সময় সিলেটের শামসুল উলামা আবু নসর ওহিদ ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন। সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা স্থাপিত হয় ১৯১৩ সালে। মাওলানা রমিজ উদ্দিন ১৯১৫ সালে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় যোগ দেন। এ মাদরাসায় দীর্ঘ ৩৩ বছর চাকরি করে ১৯৪৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি খুব উঁচুমানের উস্তাদ ছিলেন। ছাত্রদের প্রতি খুব দরদী ছিলেন। তাঁর আর্থিক সহযোগিতায় বহু ছাত্র শিক্ষাজীবন চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অথচ তিনি দান করতেন খুব গোপনে।

স্বপ্নের তাবির বর্ণনায় তাঁর জুড়ি ছিল না। বহু দূর থেকেও লোকেরা তাঁর কাছে এসে স্বপ্নের বিবরণ দিত। তিনি স্বপ্নের যথার্থ তাবির বলে দিতেন।

সাহিত্য ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের তাঁর সম্পর্ক ছিল সুগভীর। তিনি কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান তাপস। তিনি দীর্ঘ ১০০ বছর হায়াত লাভ করেন এবং আন্তরিকতাঁর সাথে জ্ঞান বিতরণ করতে থাকেন।

২৪. মাওলানা আব্দুর রব কাসেমী মরহুম (১৯০২-১৯৯২)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার পিল্লাকান্দি (ধর্মপুর) গ্রামে।। তিনি গাছবাড়ি জামেউল উলুমে পড়াশুনা করে ভারতের দেওবন্দে চলে যান।

দেওবন্দে পড়াশুনা ও গবেষণা কর্ম সমাপ্ত করে তিনি ১৯৪০ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে এসে এলাকাবাসীর অনুরোধে স্থানীয় মনসুরীয়া মাদরাসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মাদরাসাটির সরকারি স্বীকৃতি লাভের ব্যবস্থা করেন। ইতোমধ্যে মাদ্রাসাটি 'সরকারি নেছাবে চলবেনা কওমী নেছাবে চলবে ?' এ নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। মাওলানা বিরোধে জড়িত না হয়ে বাইরে চলে যান। তিনি প্রথমে বওড়ার একটি কামিল মাদরাসায় পরে কিশোরগঞ্জ মাদরাসায় অত্যন্ত দক্ষতাঁর ও সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন।

মনসুরিয়া মাদরাসার অস্তিত্ব বিপন্ন হবার উপক্রম হওয়ায় এলাকাবাসী তাকে ফিরে আসতে বাধ্য করে। তিনি পুনরায় মাদরাসার হাল ধরেন এবং প্রতিষ্ঠানটিকে একটি ফাজিল মাদরাসা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জীবনের শেষ দিনে পর্যন্ত তিনি এ মাদরাসার সাথে জড়িত ছিলেন। মাদরাসাটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তাকে অনেক বৈষয়িক কোরবানী প্রদান করতে হয়েছে।

ছাত্রদের প্রতি তিনি খুবই দরদী ছিলেন। দুর্বল ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি খোঁজ নিতেন এবং তাদের অসুবিধার দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

মাওলানা কাসেমী উঁচুমানের মুহাক্কিক আলেম ছিলেন। কোন কথা শুনে তিনি যাচাই না করে বিশ্বাস করতেন না। দেওবন্দে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি মাওলানা মওদুদীর পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা শুনেন। তিনি সত্য অনুসন্ধানের জন্য ছাত্রাবস্থায় লাহোর চলে যান এবং মাওলানা মওদুদীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর জবান থেকে সবকিছু শুনে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন।

www.pathagar.com

শেষ জীবনে তিনি জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত হয়ে একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেন। এ গ্রন্থকার মাওলানা আব্দুর রব কাসেমী সাহেবের সাথে জামায়াতের এক প্রশিক্ষণ শিবিরে ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ শিবিরের পরিচালকের পক্ষ থেকে মাওলানাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলে মাওলানা বলেন 'সারাজীবন বিভিন্ন অবস্থান থেকে বহু প্রশিক্ষণ নিয়েছি, বহু প্রশিক্ষণ দিয়েছি। কিন্তু এখানে ২/১ দিন অবস্থান করে নিজ চোখে যা দেখলাম ও যা জানলাম তাঁর তুলনা হয় না।' তিনি খুবই সহজ সরল জীবনযাপনকারী আলেমে দ্বীন, আবেদ ও সংগঠক ছিলেন। সুবক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বক্তব্য শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ করত।

২৫. মাওলানা ইদরীস শিবনগরী মরহুম (১৯২৪-২০০৭)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার শিবনগর গ্রামে। পড়াশুনা করেন গাছবাড়ি দারুল উলূম মাদরাসা ও সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায়। কর্মজীবনে তিনি কানাইঘাট মনছুরিয়া মাদরাসা, যশোর সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদরাসা, গাছবাড়ি মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। এ পর্যায়ে আরো উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। দেওবন্দে পড়াশুনা শেষ করে হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর সনদপ্রাপ্ত হয়ে দেশে এসে গাছবাড়ি মাদরাসার নাযিমে তালিমাত পদে যোগদান করেন। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত তিনি এ মাদরাসায় প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পর কানাইঘাট মনসূরীয়া মাদরাসায় আরো কিছুদিন অধ্যাপনা করেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি নেজামে ইসলামের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি কানাইঘাট থানার নেজামে ইসলামের সেক্রেটারী ছিলেন। এ পর্যায়ে তিনি মাওলানা মওদুদীর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর সাথে দীর্ঘ আলাপের পর মাওলানা ইদরীছ সাহেবের সকল খটকা দূর হয়। তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং জামায়াতের রুকন হিসেবে ইন্তেকাল করেন।

তিনি বাংলা উর্দু ও আরবি ভাষায় বেশ কয়েকটি পুস্তক রচনা করেন। তাঁর রচিত 'মিয়ারে হক কি ও কেন' পুস্তকটি খুবই মশহুর। তিনি হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর সিলসিলার সাথেও সম্পর্ক রাখতেন।

২৬. মাওলানা বদরুল আলম শায়খে রেঙ্গা মরহুম (১৯১৩-১৯৮৫)

জন্ম-সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার মোগলাবাজার ইউনিয়নের হরিনাথপুর গ্রামে। তাঁর পিতা মাওলানা আরকান আলী মরহুম জামেয়া তাওয়াক্কুলিয়া রেঙ্গা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা।

মাওলানা বদরুল আলম তাঁর পিতাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ও সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসার কোর্স সমাপ্ত করে ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দে উচ্চশিক্ষার্থে গমন করেন।

দেওবন্দে পড়াশুনা সমাপ্ত করে তিনি হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর ছোহবতে কিছুদিন অবস্থান করে তাঁর হাতে বাইয়াত হন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর খলীফা নিযুক্ত হন।

www.pathagar.com

দেওবন্দ থেকে দেশে এসে তিনি দুটি কাজ হাতে নেন। তিনি বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে তাফসীর ক্লাস চালু করেন। দ্বিতীয় কাজটি হল তাঁর পিতা প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটিকে একটি উন্নত মানের মাদরাসায় পরিণত করা। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পিতা তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন। মাওলানা বদরুল আলম দেশে ফিরার পর পিতা তাঁর হাতে মাদরাসার দায়িত্বভার প্রদান করেন।

শায়েখে রেঙ্গা প্রথম মাদরাসাটির পরিবেশ ও পরিমাণগত দিক দিয়ে একটি ভাল জায়গায় স্থানান্তরের চিন্তা করেন। প্রথমে তিনি মাদরাসাটিকে হরিনাথপুর মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে স্থানীয় মুরুব্বী মরহুম খবির মিয়া সাহেবের পুকুরের পূর্ব পারে এবং পরবর্তীতে বর্তমান স্থানে স্থানান্তর করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে মাদরাসার ভবন নির্মাণ, কিতাব সংগ্রহ ও উপযুক্ত উস্তাদ নিয়োগ করেন। তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশ সফর করেন। বর্তমানে মাদরাসাটি একটি উন্নতমানের মাদরাসায় পরিণত হয়েছে। এখানে দাওরায়ে হাদীস কোর্স চালু আছে।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর অনুসরণে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সাথে জড়িত হন এবং আজাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাথে জড়িত হন। জমিয়তের সাথে যারা ছিলেন তাঁরা হলেন-হযরত মাওলানা আব্দুল করীম শায়েখে কৌড়িয়া, হযরত মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী শায়খে ফুলবাড়ি, মুফতী কুতুবউদ্দিন জাহানপুরী, মাওলানা মুশাহিদ বাইয়মপুরী, মাওলানা ইব্রাহিম চতুলী, মাওলানা বশির আহমদ শায়খে বাঘা, মাওলানা লুৎফুর রহমান বর্নভী, মাওলানা রিয়াছত আলী চখরিয়া, মাওলানা বশির উদ্দিন গৌড়করনী প্রমুখ।

শায়খে রেঙ্গার কাজ খুবই হিকমতপূর্ণ ছিল। তিনি হিকমতের সাথে অগ্রসর হয়ে এলাকায় শরীয়ত বিরোধি কার্যকলাপ প্রতিরোধে সফল হন।

আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি নিজস্ব ভাষায় কবিতাঁর ছন্দে হৃদয়গ্রাহী কয়েকটি মোনাজাত রচনা করেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সাহেবজাদা মাওলানা শামসুল ইসলাম খলীল মাদরাসার মুহতামিম নিযুক্ত হন। বড় ভাইয়ের অসুস্থতাঁর কারণে তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মুহিউল ইসলাম বুরহান ভারপ্রাপ্ত মুহতামিম হিসেবে বর্তমান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

২৭. *মাওলানা আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইসমাইল বাইয়াপুরী মরহুম* (১৯২২-১৯৮৭)

জন্ম-হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজিলার খুরশী ইউনিয়নের বাইয়াপুর গ্রামে। পিতার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি নবীগঞ্জ সিনিওর মাদরাসা ও সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করার পর ঢাকার বিখ্যাত লালবাগ মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস কোর্স সম্পন্ন

www.pathagar.com

করেন। তিনি সব কয়েকটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। আরবি ভাষায় তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন।

কয়েকটি মাদরাসায় শিক্ষকতার পর কুয়েত মিনিস্ট্রি অব আওকাফের অধীনে মাওলানা ইসমাইল রাইয়াপুরী রিসার্চ স্কলার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি খুবই দক্ষতার সাথে গবেষণা কাজ চালিয়ে যান। গবেষণা কর্মে পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য আরবজাহানের আলেমদের প্রশংসা লাভ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন আমাদের দেশের বহু সংখ্যক লোকের আকিদা বিশ্বাসের সাথে শিরক ও বিদআত জড়িয়ে আছে। আকিদা দূরত্বের উদ্দেশ্যে কুরআন, হাদিস ও আরব বিশ্বের মশহুর আলেমদেরও উদ্ধৃতি পেশ করে বাংলায় বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

ছাত্রজীবনে বিপ্লবী ছাত্র নেতা ছিলেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আজাদী আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় পড়াশুনার সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পান। তিনি জামায়াতের কর্মী হিসাবে এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৭০সালে নবীগঞ্জ আসন থেকে জামায়াতে ইসলামীর নমিনী হিসাবে প্রাদেশিক পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি বিজয়ী প্রার্থীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন।

২৮. মাওলানা আব্দুল আজীজ মরহুম (১৯১০-১৯৮৬)

জন্ম-বিয়ানীবাজার উপজেলার মাথিউরা গ্রামে। তিনি বাহদুর পুর মাদরাসায় প্রথম লেখাপড়া শুরু করেন। এ মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা দরগাহে শাহজালাল (র) মসজিদের দীর্ঘকালীন ইমাম ও খতিব হযরত মাওলানা আকবর আলী সাহেবের প্রিয় উস্তাদ মাওলানা মাহমুদ আলী। মাওলানা আব্দুল আজীজ কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি কলকাতার আলিয়া মাদরাসায় ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবিতে মাস্টার্স ডিগ্রি পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক মার্ক পেয়ে বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন এবং গোল্ড মেডেল লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা, দীর্ঘদিন সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি এম.সি. কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ও সিলেট সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ১৯৭০ সালে ফেঞ্চুগঞ্জ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হন।পরে গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বপালন করেন। আরবীতে তিনি এম.এ পাস করলেও ইংরেজি ভাষায় ছিল তাঁর অতুলনীয় দখল। তাঁর কিছু লেখা প্রবন্ধ পড়লে ইংরেজি ভাষার তাঁর উৎকর্ষের প্রমাণ মিলে। উল্লেখ্য মাওলানা আব্দুল আজীজ মরহুম এ গ্রন্থ লেখকের আপন বড় চাচা।

২৯. মাওলানা উবায়দুল হক উজিরপুরী মরহুম সাবেক এম.পি (১৯৩৪ -২০০৮)

জন্ম-জকিগঞ্জ উপজেলার উজিরপুর গ্রামে। লেখাপড়া গোলাপগঞ্জের রানাপিং মাদরাসা ও ঢাকা আশরাফুল উলূম বড়কাটরা মাদরাসায় । তিনি প্রথমে কানাইঘাট লালারচক

www.pathagar.com

মাদরাসায় এবং পরে গোলাপগঞ্জের রানাপিং কওমী মাদরাসায় ৪৩ বছর অধ্যাপনার সাথে জড়িত ছিলেন।

ছাত্রজীবনে তিনি জমিয়তে তোলাবা'র সাথে জড়িত ছিলেন। জমিয়তে তোলাবা'র যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৪ সালে গোলাপগঞ্জের প্রখ্যাত কওমী মাদরাসা রানাপিং থেকে। তিনি তখন এ মাদরাসার ছাত্র ছিলেন এবং সংগঠন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১৯৮১ সালে তিনি হাফেজি হুজুর পরিচালিত খেলাফত আন্দোলনে যোগদেন। অতঃপর তিনি খেলাফত মজলিসে যোগদেন এবং খেলাফত মজলিশের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৯৯১ সালে তিনি সিলেট ৫ আসন থেকে ইসলামী ঐক্য জোটের মনোনীত একমাত্র এম.পি. নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে তিনি বহু উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করেন।

তিনি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ (আযিযুল হক গ্রুপের) কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য, কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর এবং পরে কেন্দ্রীয় অভিবাবক পরিষদের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৩০. শায়খে মাওলানা তজম্মুল আলী মরহুম (১৯১২-২০০৬)

জন্ম-বিয়ানী বাজার উপজেলার কুড়ার বাজার ইউনিয়নের আঙ্গুরা মোহাম্মদ পুর গ্রামে।

মক্তবের পাঠ শেষ করে কিছুদিন দেউলগ্রাম মাদরাসায় পড়াশুনা করে তিনি সিলেট সরকারি আলিয়া মাদষাসা ভর্তি হন। এ মাদরাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় তিনি ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অত:পর আরো উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন।

দেওবন্দ থেকে ফিরে তিনি কিছুদিন দরগাহে হযরত শাহজালাল (র) মাদষাসায় শিক্ষকতা করেন। অত:পর ঢাকার যাত্রাবাড়ী মাদরাসায় কয়েকবছর শায়খুল হাদিস ও মুহতামিম হিসাবে দায়িত্বপালন করেন। সর্বশেষ তিনি যশোর জিলার জামেয়া ইসলামীয়া লাউড়ী রামনগর মাদরাসায় যোগদান করেন।

দীর্ঘদিন অত্যান্ত সুনাম ও যোগ্যতার সাথে এ মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী মুফতী ওয়াক্কাস সহ তার অসংখ্য ছাত্র দেশ বিদেশে দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

তিনি হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর কাঁছে বাইয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর খলিফা নিযুক্ত হন। তিনি একজন লেখক । কবিতার আকারে তাঁর লিখিত মুনাজাতে মকবুল পাঠকদের কাছে খুবই প্রিয় গ্রন্থ। তিনি উর্দু কিতাবাদি বাংলায় অনুবাদ করেন।

লন্ডন, আমেরিকা, ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্যসহ বেশ কয়েকটি দেশ তিনি সফর করেন।

www.pathagar.com

৩১. মাওলানা আশরাফ আলী বিশ্বনাথী মরহুম (১৯২৮-২০০৫)

জন্ম- বিশ্বনাথ উপজেলার ঘড়গাও গ্রামে।

লেখাপড়া : গোলাপগঞ্জের রানাপিং মাদরাসা, চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদরাসা। এ মাদরাসার মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

কর্মজীবনে তিনি গলমু কাপন মাদরাসা শমে মর্দান তাওয়াক্কুলিয়া মাদরাসা ও পারকূল মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। অতঃপর বিশ্বনাথ এম.এ.ই. মাদরাসায় যোগদান করেন। এ মাদরাসা বন্ধ হবার উপক্রম হলে তিনি এ মাদরাসা পননর্গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং নতুন স্থানে মাদরাসা স্থাপন করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে আমরণ তিনি এ মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

তিনি ছাত্রজীবনে ব্রিটিশ বিরোধি আন্দোলনে শরীক হন। অতঃপর তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে যোগদান করেন।

১৯৬৪ সালে তিনি বৃহত্তর সিলেট জেলা জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সেক্রেটারী, ১৯৭৫ সালে এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারত, পাকিস্তান, ইরাক ও গ্রেট ব্রিটেন সফর করেন।

তিনি একজন ভাল লেখক। তাঁর লিখিত কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে-আরো কয়েকটি প্রকাশের পথে। তাঁর সম্পাদনায় তাঁর মাদরাসা থেকে নিয়মিত মাসিক আল ফারুক প্রকাশিত হয়েছে।

৩২. হযরত মাওলানা আমিন উদ্দিন শায়খে কাতিয়া (জন্ম-১৯১৮)

জন্ম-জগন্নাথপুর থানার কাতিয়া গ্রামে। পড়াশুনা: গোলাপগঞ্জের বাঘা মাদরাসা ও ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায়।

১৯৫১ সালে তিনি নিজ গ্রাম কাতিয়ায় 'জামেয়া ইসলামীয়া দারুল উলূম কাতিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ মাদরাসার আজীবন মুহতামিম । এ ছাড়া তিনি সুনামগঞ্জ, সিলেট ও হবিগঞ্জে প্রায় অর্ধশত মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রায় প্রতিটি মাদরাসায় তাকে বরকাতান মুহতামিম হিসেবে রাখা হয়েছে। এ সব মাদরাসায় আর্থিক সংকট দূরীকরণে তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা সহ অনেক দেশে প্রায় অর্ধশতাধিক বার সফর করেন। তিনি মাদারিছে কওমিয়া, আজাদ দ্বীনি এদারায়ে তালিম বাংলাদেশ, সুনামগঞ্জ এদারার উপদেষ্টা।

ইসলাম বিরোধি অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীন সিংহকণ্ঠ। সিলেট সুনামগঞ্জে কোন অসামাজিক কার্যকলাপের খবর পেলে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। প্রশাসন তাকে যথেষ্ট সমীহ করে।

শায়খে কাতিয়া জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা। তিনি পাকিস্তান আমলে দুইবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

বিরোধিদের প্রতি তিনি উদার । মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী একবার বিরোধিদের দ্বারা আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে তিনি সর্বাগ্রে ফলমূলসহ হাসপাতালে হাজির হয়ে তাঁর সাথে দেখা করেন। মাওলানা ফুলতলীর ইন্তেকালের তিনি জানাজায় শরীক হন এবং শিশুর মত ক্রন্দন করেন।

৩৩. মাওলানা আব্দুল মোমিন খলীফায়ে মাদানী (জন্ম-১৯৩১)

জন্ম - হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার পুরানগাঁও গ্রামে।

শিক্ষাজীবন: ইমামবাড়ি মাদরাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জামেয়া ইউনুসিয়া মাদরাসা, হবিগঞ্জের জামেয়া সাদিয়া রায়ধর মাদরাসা এবং ভারতের দেওবন্দ। তিনি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় ১ম বিভাগে পাস করেন।

অধ্যয়ন শেষ করে তিনি কুতুবুল আলম হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর কাছে অবস্থান গ্রহণ করে তাঁর হাতে বাইয়াত হন। পরবর্তীতে তাঁর খলিফা নিযুক্ত হন।

কর্মজীবনে তিনি ইমামবাড়ি মাদরাসা, বালিধারা মাদরাসা, হবিগঞ্জ উমেদনগর মাদরাসা, বিশ্বনাথ জামেয়া মাদরাসা, জামেয়া মাদানীয়া নবীগঞ্জ মাদ্রসায় অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি ইমাম বাড়ি মাদরাসার মুহতামীমের দায়িত্ব পালন করছেন।

ছাত্রজীবনে তিনি জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়ার সাথে জড়িত হন। পরবর্তীকালে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম হবিগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। হযরত মাওলানা হাফিজ আব্দুল করিম ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি। তাঁর মৃত্যুর পর খলীফায়ে মাদানী মাওলানা আব্দুল মোমিন হন জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সভাপতি। তাছাড়া তিনি হবিগঞ্জ দ্বীনি শিক্ষা বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বর্তমান সভাপতি, ইসলাহুল মুসলিমিন হবিগঞ্জ শাখার সেক্রেটারী ও ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ হবিগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি কয়কটি মসজিদ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত। তিনি নানামুখী দ্বীনি খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

৩৪. হাফেজ মাওলানা জিল্লুর রহমান (জন্ম ১৯৩৪)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার ঘড়াই গ্রামে। তিনি গাছবাড়ি মাদরাসা ও ভারতের দেওবন্দে পড়াশুনা করেন। কর্মজীবনে তিনি-

১. জামেয়াউল উলূম গাছবাড়ি মাদরাসা। ২. ঢাকা আলিয়া মাদরাসা। ৩ সিলেট আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন।

১৯৯৮ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সিলেট শহরের বিভিন্ন মসজিদে নিয়মিত কুরআনের তাফসীর করেন। তাঁর এ খেদমত অব্যাহত আছে । এ ছাড়া তিনি ফতেহপুর জামেয়া রহমানীয়া টাইটেল মাদরাসার বুখারী শরিফের ক্লাস নেন। তিনি 'আল ফাওয়া কিহুল' জামিয়া মিনাল কুতুবুস সুনিয়া নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ কিতাব রচনা করেন।

www.pathagar.com

হাফেজ মাওলানা জিল্লুর রহমান সিলেট-৫ কানাইঘাট জকিগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত এম.পি. জামায়াত নেতা অধ্যক্ষ মাওলান ফরীদ উদ্দিন চৌধুরীর আপন মামা।

৩৫. অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল মান্নান (জন্ম ১৯৩৭)

জন্ম-সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার মোগলাবাজার ইউনিয়নের সতিঘর গ্রামে।

ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি ভাল রেজাল্ট করেন। সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। তিনি কামিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন। তাঁর পর মেট্রিকুলেশন, ইন্টামিডিয়েট, বি.এ ও এম.এ. পাস করেন। প্রতিটি পরীক্ষায় মেধাতালিকায় তাঁর স্থান ছিল।

কর্মজীবনে তিনি লেকচারার হিসেবে এম.সি কলেজ ও সরকারি কলেজে চাকরি করেন। অতঃপর তিনি পদোন্নতি লাভ করে সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ চট্টগ্রামও চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে চাকরি করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। অতঃপর তিনি সিলেট এম.সি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ও ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাইমারী সেকশনের ডিজি নিযুক্ত হন। পর্যায়ক্রমে তিনি প্রিন্সিপাল রাজশাহী কলেজ, প্রিন্সিপাল, সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা, আবার চেয়ারম্যান মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড এবং ঢাকা ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর জীবনেও তিনি ঢাকায় অবস্থান করে ইসলামী ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে কর্ম সম্পাদনা করেছেন।

তিনি খুব উচুমানের মুহাক্কিক আলেম ও ভাল ওয়ায়েজ ও দায়িত্ব পালনে খুবই একনিষ্ঠ।

৩৬. মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী (জন্ম ১৯২৭)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার বাটি বিরদল গ্রামে। শিক্ষাজীবন: তাঁর নানা মাওলানা আব্দুল বারী প্রতিষ্ঠিত কানাইঘাট মাদরাসায় ৬ বছর অধ্যয়নের পর সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা থেকে টাইটেল পাস করেন। অতঃপর মদন মোহন কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। ১৯৮১ সালে মদীনা ইউনিভার্সিটির তত্ত্বধানে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে 'তখছসুছ ফিত তাদরিছ' সার্টিফিকেট লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি বরিশাল কাউয়ারচর ফাজিল মাদরাসা, কানাইঘাটের ফয়েজ আম মাদরাসা, ঝিঙ্গাবাড়ি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট সরকারি হাইস্কুল এবং সরকারি আলীয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করে ১৯৮৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর আল-আমিন জামেয়ার প্রিন্সিপাল, শাহজালাল জামেয়া ইসলামীয়া পাঠানটুলা এতিমখানার সুপার এবং শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি ১৯৫০ সালে নিজগ্রামে জনকল্যাণ সমিতি গঠন করেন। ১৯৬০ সালে সিলেট শহরের বনকলাপাড়া মসজিদ স্থাপনে এবং ১৯৭৫ সালে আঞ্জুমানে খেদমতে কুরআন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। অতঃপর ১৯ বছর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ সাল থেকে অদ্যাবধি তিনি আঞ্জুমানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। শাহজালাল জামেয়া স্কুল এন্ড কলেজ শাহজালাল জামেয়া পাঠানটুলা কামিল মাদরাসা, আল-আমীন জামেয়া ইসলামিয়া বাবুস সালাম মসজিদ ও হিফজ মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'দি সিলেট ইসলমিক সোসাইটি' এবং প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় 'জালালাবাদ আর্ন্তাজাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' এর উদ্যোক্তা ট্রাস্টের ট্রাস্টি। তিনি সিলেট শহরের বেশ কয়েকটি মসজিদে প্রতি সপ্তাহে তাফসীরুল কুরআন পেশ করতেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যে ও গ্রেট ব্রিটেনে কয়েকবার সফর করেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকন। সিলেট উত্তর সাংগঠনিক জেলার কানাইঘাট থানার দায়িত্বশীল, জেলার নায়েবে আমীর, সিলেট মহানগরীর মজলিশে শুরার সদস্য ইত্যাদি পদে দায়িত্ব পালন করেন।

৩৭. হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান ইছামতি (জন্ম-১৯৪০)

জন্ম-জকিগঞ্জ উপজেলার রারাই গ্রামে। লেখাপড়া : আসামের বদরপুর মাদরাসা, সড়কের বাজার আহমদিয়া সিনিয়র মাদরাসা ও গাছবাড়ি দারুল উলূম মাদরাসায় লেখাপড়া করেন। তিনি আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় মেধাতালিকাভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। তিনি 'ইলমুল ক্বেরাত' হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ও মক্কা মুকাররমার খতীব ডা.শায়েখ সৈয়দ মুহাম্মদ আলী আলভী মালিকীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

কর্মজীবনে তিনি ইছামতি আলিয়া মাদরাসা, ফুলবাড়ি সিনিয়র মাদরাসা, সৎপুর আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। অতঃপর সৎপুর আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালনের পর বর্তমানে ১৯৮২ সাল থেকে ইছামতি আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'মাসিক শাহজালাল' তাঁর সম্পাদনায় বের হয়। তিনি এশিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির অংগ সংগঠন, জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়ার বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭০ সালে ও ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি আঞ্জুমানে আল-ইসলাহ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি।

www.pathagar.com

তিনি একজন সুবক্তা ও ভাল মুফাসসীর। তিনি মাওলানা 'ফখরুল ইসলাম শিক্ষা ট্রাস্ট' ও 'আব্দুস সাত্তার শিক্ষা ট্রাস্টের' সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

তিনি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের বোর্ড কমিটির সদস্য হিসেবে ৩ বছর অত্যন্ত দক্ষতাঁর সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

৩৮. মাওলানা শায়খে আব্দুল হক গাজীনগরী (জন্ম-১৯২৮)

জন্ম-সুনামগঞ্জ জেলার সদর থানার পাথারিয়া ইউনিয়নের গাজী নগর গ্রামে।

শিক্ষাজীবন: দরগাহপুর মাদরাসা, বানিয়াচং মাদরাসা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুসিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করে ভারতের দেওবন্দে চলে যান। দেওবন্দ থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে তিনি হযরত মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর সোহবতে এক বছর অতিবাহিত করেন এবং তাঁর হাতে বাইয়াত হন।

কর্মজীবনে শায়খ আব্দুল হক গাজী নগরী প্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামেয়া ইউনুসিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন, অতঃপর নিজ এলাকার দরগাহপুর মাদরাসায় যোগদান করেন। বাকি জীবন এ মাদরাসার খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

রাজনৈতিক জীবনে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাথে জড়িত হন। কয়েকবার গ্রেটব্রিটেন ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। তাঁর বহু ছাত্র ও মুরীদান দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে।

৩৯. হাফিজ মাওলানা শায়েখ তফজ্জুল হক (জন্ম ১৯৩৮)

জন্ম-হবিগঞ্জ জেলার সদর থানার কাঠাখালী গ্রামে।

শিক্ষাজীবন: রায়ধর জামেয়া ছাদিয়া, চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদরাসায় লেখাপড়া করেন। তাঁরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর ভর্তি হন। তাঁরপর প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আব্দুল্লাহ্ দরখাস্তীর নিকট তাফসীরের বিভিন্ন দিক রিসার্চ করে ডিগ্রি হাসিল করেন। অতঃপর তিনি জামেয়া ইসলামীয়া নিউটন করাচীতে ভর্তি হন এবং আল্লামা বিন নূরীর নিকট থেকে হাদীস, তাফসীর ও হেকমতে বিশেষ সনদ লাভ করেন। ১৯৬২ সলে তিনি ভারতের দেওবন্দ গমন করেন এবং সেখান থেকে তিনি বিশেষ সনদ লাভ করেন। ১৯৬১ সলে তিনি মাত্র ৬মাসে কুরআন হিফজ করেন।

কর্মজীবনে তিনি জামেয়া সাদিয়া রায়ধর, দারুল উলূম বরুরা, কুমিল্লা, জামেয়া আশরাফুল উলূম বালিয়া ময়মনসিংহ জামেয়া ইমসলামিয়া সেওড়া ময়মনসিংহ প্রভৃতি মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। ময়মনসিংহে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি তাঁরাকান্দা জামে মসজিদ, তাঁরাকান্দা ঈদগাহ ও তাঁরাকান্দা মদিনাতুল উলূম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে এলাকাবাসীর চাপে তিনি তাঁর এলাকার উমেদনগর মাদরাসার দৈন্যদশা দূরীকরণার্থে ১৯৭১ সালে এ মাদরাসার হাল ধরেন এবং মাদরাসাটিকে একটি উন্নত মাদরাসায় পরিণত করেন।

www.pathagar.com

মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষা গ্রহনের সুযোগের কমতি দেখে তিনি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হন এবং একটি মহিলা মাদরাসা ও বালিকা এতিমখানা গড়ে তুলেন। ২০০৩ সালের তিনি হবিগঞ্জ নূরুল হেরা মসজিদ কমপ্লেক্স স্থাপন করেন।

শায়খ তফজ্জুল হক হবিগঞ্জ ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ ও খোদ্দামুদ্দিন সমিতির সভাপতি। জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও হবিগঞ্জ জেলার সভাপতি। এ ছাড়া তিনি হবিগঞ্জ শাখা ইসলামী ঐক্যজোটের সভাপতি।

আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় তিনি কয়েকটি কিতাব রচনা করেন। ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন। আমেরিকায় তিনি তাঁরাবীহের জামায়াতের ইমামতি করেন এবং বিভিন্ন মসজিদে তাফসীর পেশ করেন।

৪০. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন চৌধুরী (সাবেক এম.পি) (জন্ম ১৯৪৭)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার তালবাড়ি গ্রামে। তিনি ঝিঙ্গাবাড়ি মাদরাসা, গাছবাড়ি মাদরাসা ও সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসাায় পড়াশুনা করেন। তিনি এম.সি. কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। কর্মজীবনে তিনি শাহজালাল জামেয়া স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া পাঠানটুলা কামিল মাদরাসার রেক্টর, কানাইঘাটের জামেয়া ইসলামিয়া ইউসুফিয়া তালবাড়ি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল। তিনি 'দি সিলেট ইসলামিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী, জালালাবাদ ইসলামিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী, আঞ্জুমানে খেদমতে কোরআনের সহ সভাপতি, ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সিলেট অঞ্চলের সাবেক সংগঠক। আল হামরা ইন্টারন্যাশনালের ভাইস প্রেসিডেন্ট, নওবেলাল ইন্টারন্যাশনাল ও আল বারাকার চেয়ারম্যান এবং প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় জালালাবাদ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।

১৯৬৬ সালে তিনি মাদরাসা ছাত্র সংগঠন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবীয়ার সিলেট জেলা সেক্রেটারী, ১৯৬৭ সালে ইসলামী ছাত্র সংঘের সিলেট শহর শাখার সেক্রেটারী, তাঁরপর সিলেট শহর শাখার সভাপতি ও বৃহত্তর সিলেট জেলার সভাপতি নিযুক্ত হন।

পরবর্তীতে তিনি জামায়াতে ইসলামিতে যোগদান করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি সিলেট শহর শাখা, সিলেট সদর থানা, সিলেট জেলার আমীর নিযুক্ত হন। এরপর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এবং সিলেট অঞ্চলের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন। ২০০১ সালে তিনি সিলেট-৫(কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ) আসন থেকে এম.পি. নির্বাচিত হন। এম.পি থাকাকালীন সময়ে এলাকার অভূতপূর্ব উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করেন।

৪১. শায়েখ ইসহাক আল মাদানী (জন্ম ১৯৫৭)

জন্ম-গোলাপগঞ্জর উপজেলার লক্ষীপাশার বাউশি গ্রামে। তিনি ফুলবাড়ি মাদরাসা ও সরকারি আলীয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। তিনি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের প্রতিটি

www.pathagar.com

পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অতঃপর মদনমোহন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনজন ছাত্র মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশীপ লাভ করেন। তিনি তাদের একজন। মদিনায় তিনি ডিপ্লোমা ইন এ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ দু বছরের কোর্স মাত্র ৬মাসে সম্পন্ন করেন। পরীক্ষায় তিনি ১০২টি দেশের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে ১ম শ্রেণীতে ৩য় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর আরবি ভাষা ও সাহিত্যে লিসান্স কোর্সে ভর্তি হন। ৪ বছরে এ কোর্স সমাপ্ত করেন। পরীক্ষায় আবর বিশ্বসহ ৭০টি দেশের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে 'মমতাজ' উপাধিতে ভূষিত হন। দেশে ফিরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ও এম.ফিল করে পিএইচডির জন্য থিসিস লেখায় ব্যস্ত।। তিনি সৌদি সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে সিলেটে 'মাবুস' হিসেবে কর্মরত। তিনি শাহজালাল জামেয়া স্কুল এন্ড কলেজ এবং বর্তমানে শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসায় হেডমাওলানার পদে অধিষ্ঠিত।

তিনি বহু মসজিদ, মাদরাসা ও এতিম খানায় সৌদি সরকারের সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। আরব বিশ্বের বিশেষ ব্যক্তিত্ব সিলেট সফর করলে তিনি প্রায়ই দুভাষীর কাজ করেন। তিনি সৌদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের উদ্যোক্তা ও সভাপতি।

তিনি বাংলাদেশকে শিরকমুক্ত করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য নানা কর্মসূচির পালন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি বই রচনা করেছেন। তিনি নিয়মিত মসজিদে তাফসীর পেশ ও জুমাবারে খুতবা দিয়ে থাকেন। তিনি আলেম সমাজের ঐক্যের ব্যাপারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৪২. মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক বিশ্বনাথী (জন্ম-১৯৩২)

জন্ম - বিশ্বনাথ উপজেলার নরসিংহপুর (মোল্লাবাড়ি) গ্রামে। শিক্ষাজীবন : গোলাপগঞ্জ রানাপিং মাদরাসা, ফুলবাড়ি মাদরাসা, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা ও গাছবাড়ি কামিল মাদরাসায় লেখাপড়া করেন।

কর্মজীবন : তিনি ইছামতি দারুল উলূম মাদরাসা, ফুলবাড়ি মাদরাসা, ফুলতলী ছাড়া দেওরাইল কামিল মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তাঁর নিজ এলাকায় ১৯৬০ সালে বিশ্বনাথ দারুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম থেকে অদ্যাবধি তিনি এ মাদরাসার প্রিন্সিপাল ।

ছাত্রজীবনে তিনি 'জমিয়তে তালাবিয়া আরাবিয়ার' সিলেট জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির সিলেট জেলা সভাপতি ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি নেজামে ইসলাম পার্টির পক্ষে জাতীয় সংসদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৭৬ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ জমিয়াতুল মুদাররিছিনের সিলেট বিভাগের সভাপতি। এ ছাড়া তিনি আঞ্জুমানে আল ইসলাহ বাংলাদেশের উপদেষ্টা। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আঞ্জুমানে মাদারিসে আরাবিয়ার সিনিয়র সহসভাপতি, তালামিয়ে ইসলামিয়া বাংলাদেশের উপদেষ্টা, দারুল কেরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের উপদেষ্টা, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের কেন্দ্রের সচিব।

তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এলাকার বিচার ফায়সালায় এবং ইসলাম বিরোধি ও অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি খুবই সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন ।

৪৩. হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ চৌধুরী (জন্ম ১৯৪৬)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার দর্প নগর গ্রামে। তিনি সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা থেকে ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করে কামিল পাস করেন। ১৯৬৫ সালে রমজান মাসে নিজ উদ্যোগে কুরআন হিফজ করেন। তিনি এম.সি. কলেজে ইংরেজিতে বি.এ. অনার্স কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন। বিশেষ কারণে অনার্স কোর্স সম্পন্ন না করে বি.এ. পাস করেন। ১৯৯৫ সালে লন্ডনের 'সিটি এন্ড গিল্ডস' থেকে টিচার্স ট্রেনিং পরীক্ষা পাস করেন। বার্মিংহাম ইউনির্ভাসিটি থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ কোর্স সম্পন্ন করেন। তিনি এম.ফিল করেছেন এবং পিএইচ ডি প্রত্যাশী। কর্মজীবনে তিনি সৎপুর আলীয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তাঁর পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত কানাইঘাট সড়কের বাজার মাদরাসার সুপারের দায়িত্ব পালন করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে দাওয়াতুল ইসলাম ইউকের আমন্ত্রণে লন্ডন চলে যান। সেখানে তিনি ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতিব এবং একাধারে বার বছর লন্ডন ইসলামিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন উসিলায় তিনি পৃথিবীর প্রায় সবদেশ সফর করেন। তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নজমুদ্দিন আরবাকানের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রিয় মেহমান হিসেবে তিনি আংকারায় ও ইস্তাম্বুলে সেমিনারে যোগদান করেন।

তিনি দাওয়াতুল ইসলাম ইউকের সাবেক আমীর, ইসলামিক সোসাইটি অব ব্রিটেনের কনসালটেন্ট কমিটির সদস্য, মুসলিম রাইটস মুভম্যান্টের সভাপতি, টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের অ্যাডুকেশন কমিটিতে মুসলিম অভিভাবকদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি, মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ইসলামিক শরীয়া কাউন্সিল ইউকের চেয়ারম্যান, লন্ডন দারুল উম্মার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ব্রিটেনের কেন্দ্রীয় সরকারের ফুড ষ্ট্যান্ডার্স কমিটির সদস্য। মরহুম আহমদ দিদাত যখন ব্রিটেনে খ্রিস্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন তখন আবু সায়ীদ সাহেব তাঁর পাশে অবস্থান করতেন।

৪৪. মাওলানা আব্দুর রব ইউসুফী (জন্ম ১৯৪৯)

জন্ম- বানিয়াচং উপজেলার কাগাপাশা ইউনিয়নের ইছবপুর গ্রামে। শিক্ষাজীবন : বানিয়াচং আলিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ দিনারপুর বালিধারা মাদরাসা, মৌলভীবাজার আলিয়া মাদরাসা, হবিগঞ্জ উমেদনগর জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করেন। কর্মজীবন : তিনি হবিগঞ্জ উমেদনগর মাদরাসা, ঢাকা জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ মিরপুর মাদরাসা, নবীগঞ্জ মাদরাসা শায়েস্তাগঞ্জ কুতুবের চক

www.pathagar.com

মাদরাসা, বানিয়াচং দারুল কুরআন মাদরাসা ও ঢাকার ঝিগাতলা ও ঢাকার জামেয়া রহমানিয়া হাফিজিয়া মুহাম্মদপুর মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন। ছাত্রজীবনে তিনি জমিয়তে তালাবিয়া আরাবিয়া, পাকিস্তান ছাত্র পরিষদের সাথে সক্রিয় ভাবে জড়িত হন। তিনি ছাত্র পরিষদ হবিগঞ্জ শাখার সেক্রেটারী ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাথে যোগ দেন। তিনি হবিগঞ্জের দায়িত্বশীল ছিলেন। পরে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৮১ সালে তিনি হাফেজী হুজুরের প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮৫ সালে এরশাদ বিরোধি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে জেল খাটেন। ১৯৮৬ সালে খেলাফত আন্দোলন বিভক্ত হয়ে পড়লে তিনি মাওলানা আজিজুল হক গ্রুপের সাথে সামিল হন। ১৯৮৯ সালে খেলাফত আন্দোলনের উক্ত গ্রুপ খেলাফত মজলিশ নাম ধারণ করেন। তিনি খেলাফত মজলিশের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঢাকা মহানগরীর সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁরপর তিনি ১০ বছর এ সংগঠনের প্রশিক্ষণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালে তিনি খেলাফত মজলিশের যুগ্ম-মহাসচিব এবং ২০০২ সালে মহাসচিব নির্বাচিত হন।

১৯৯২ সালে ভারতের অযোধ্যার ষোড়শ শতাব্দীর সুপ্রাচীন বাবরী মসজিদ উগ্রপন্থি হিন্দুরা ভেঙে ফেললে খেলাফত মজলিশ আযোধ্যার অভিমুখে লংমার্চের আয়োজন করে। মাওলানা ইউসুফী লংমার্চ আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি সৌদি আরব, আরব আমিরাত, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফর করেন।

৪৫. প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুর রহমান (জন্ম ১৯৫৩)

জন্ম-গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের হাজীপুর ঘনশ্যাম গ্রামে। তিনি ফুলবাড়ি আলিয়া মাদরাসা ও সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। কর্মজীবনে তিনি কাজির বাজার মসজিদে ১৯৭৩ সালে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হন। ক্রমে তিনি তাঁর মুছল্লি ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় প্রথমে একটি মকতব পরে একটি বিরাট কওমী মাদরাসা গড়ে তুলেন। তিনি এ মাদরাসার মুহতামিম।

ছাত্রজীবনে তিনি জমিয়তে তোলাবায়ে আরাবিয়া ও মুসলিম ছাত্র পরিষদের সাথে জড়িত হন। রাজনৈতিক জীবনে প্রথম দিকে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সিলেট জেলার সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা হাবিব একজন সুবক্তা। মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজী হুজুর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হলে তিনি হুজুরের সফর সঙ্গী হিসেবে সারাদেশ সফর করেন এবং জোরালো বক্তব্য রাখেন।

www.pathagar.com

খেলাফত আন্দোলন ভেঙে গেলে তিনি মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের গ্রুপে অবস্থান নেন। অতঃপর খেলাফত মজলিশ গঠন হলে তিনি এ সংগঠনের সিনিয়র নায়েবে আমীর নিযুক্ত হন। তিনি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আন্দোলন হল: সরদার আলাউদ্দিন বিরোধি আন্দোলন, বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদ আন্দোলন, বরাক বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে আন্দোলন, বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর আপোষহীন ভূমিকা বিদেশী মিডিয়া, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকাসহ বিশ্ব প্রচার মাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়। তিনি ২০০০ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ভবনের বিতর্কিত নামকরণের বিরোধি আন্দোলনের অন্যতম নেতা।

তিনি সাহাবা সৈনিক পরিষদ গঠন করেন। ১৯৮৭ সালে আফগান সরকারের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আফগানিস্তান সফর করেন।

আর্তমানবতা সেবায় তিনি আল মারকাজুল ইসলামী আল খায়রী আল ইসলামি গঠন করেন। তিনি ২০টির অধিক গ্রন্থের লেখক।

৪৬. মাওলানা আব্দুস সালাম আল মাদানী (জন্ম ১৯৫৯)

জন্ম-ছাতক উপজেলার দোলার বাজার ইউনিয়নের চান্দপুর গ্রামে। তাঁর পিতা মাওলানা আনজব আলী মরহুম ভারতের রামপুরের ফারেগ, ১৬টি দেশ পরিভ্রমণকারী ও বেশ কয়েকটি দ্বীনি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা।

জনাব আব্দুস সালাম আল মাদানী বুরাইয়া মাদরাসা, সৎপুর মাদরাসা ও সরকারি আলীয়া মাদরাসা ঢাকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যয়নকালীন সময়ে ১৯৮২ সালে সৌদি সরকারের বৃত্তি লাভ করে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৭ সালে লিসান্স ডিগ্রি লাভ করেন। ফুলতলীর পীর হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ চৌধুরী ফুলতলীর নিকট থেকে ইলমুল কিরাতের সনদ লাভ করে তাঁরই নির্দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কেন্দ্রে রমজান মাসে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মজীবনে তিনি বিশ্বনাথ আলিয়া মাদরাসার, বুরাইয়া আলিয়া মাদরাসা, সৎপুর আলিয়া মাদরাসায় আরবি প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর এলাকাবাসীর চাপে নিজ এলাকায় গোবিন্দগঞ্জ আলিয়া মাদরাসায় প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ছাত্রজীবনে তিন মাদরাসা ছাত্রদের সংগঠন তালাবয়ে আরাবীয়ার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি মাদরাসা ছাত্রদের দাবি দাওয়া আদায়েরর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আন্দোলন করেন এবং ডেলিগেশনের প্রতিনিধি হিসেবে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে দুই বার সাক্ষাৎ করেন। রাশিয়া আফগানিস্তান আক্রমণ করলে তিনি প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলতে গিয়ে আহত হন এবং কারাবরণ করেন। তিনি একজন সুবক্তা। ১৯৯১ সালে তিনি সুনামগঞ্জ-ছাতক-দোয়ারাবাজার এলাকা থেকে

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণকরে যথেষ্ট ভোট লাভ করেন। তিনি বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর রুকন। তিনি সংগঠনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি মাদরাসা শিক্ষক পরিষদের এ অঞ্চলের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন।

৪৭. *প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুর রহীম জন্ম* (১৯৪৮)

জন্ম-কানাইঘাট উপজেলার বড়দেশ এলাকার সরদারী পাড়া গ্রামে। তিনি উমর গঞ্জ মাদ্রাসা ও গাছবাড়ী দারুল উলুম মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন। পড়াশুনায় তিনি বিরল প্রতিভার সাক্ষর রাখেন। তিনি আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ১ম স্থান অধিকার করেন। ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করেন। ফাজিল পরীক্ষার আগের রমজান মাসে মাত্র ২৭ দিনে কুরআন হিফজ করে এক অনন্য দৃষ্টান্ড় স্থাপন করেন।

কামিল পাস করার পর তিনি ঝিঙ্গাবাড়ী কামিল মাদরাসা, বড়দেশ মাদরাসা ও ঐতিহাসিক গাছবাড়ী মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি গাছবাড়ী মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল এবং ১৯৯৯ সাল থেকে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব সূচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৯৩ সাল থেকে তিনি তানযিমুল মাদারিছ সিলেটের সভাপতি । ১৯৯৪ সালে শ্রেষ্ঠ মাদরাসা শিক্ষক হিসাবে বিবেচিত হন। তিনি বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য।

মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের বেগমসহ পরিবারের বেশ কয়েকজন কুরআনে হাফিজ। তিনি একজন ভাল আলেম, দক্ষ প্রশাসক, আবেদ, সমাজদরদী ও এলাকার উন্নয়নে সদা তৎপর ব্যক্তিত্ব।

৪৮. মাওলানা আবুল কালাম মওদুদ হাসান (জন্ম-১৯৫৯)

জন্ম-বানিয়াচং উপজেলার আমিরখালী গ্রামে। তাঁর পিতা মাওলানা মুফাজ্জল হাসান একজন খ্যাতিমান পীর ও বানিয়াচং এল.আর. হাইস্কুলের হেডমাওলানা ছিলেন। বড় চাচা মাওলানা মুজাফফর হাসান দেওবন্দের ফারেগ এবং দেশ বিখ্যাত ওয়ায়েজ ছিলেন। অন্য চাচা মাওলানা মুয়াজ্জল হাসান দেওবন্দের টাইটেল ও কলকাতা আলিয়া মাদরাসার ডবল টাইটেল পাস স্কলার ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বড় বড় মাদরাসার উস্তাদ ছিলেন।

মাওলানা মওদুদ হাসান ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে টাইটেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিসান্স (হাদীস ও ইসলামিক স্টাডিস) এবং লন্ডন গিল্ডহিল ইউনিভার্সিটি থেকে বি.এস.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবনে তিনি সৌদি সরকারের মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক এফেয়ার্স দাওয়া ও এরশাদ বিভাগের পক্ষ থেকে নিযুক্ত মাবউস। তাঁর কর্মস্থল লন্ডন। তিনি দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে ও আয়ার এর আমীর, খতীব ইসলামিক সেন্টার পিকাডেলী মসজিদ, জমিয়াতুল উম্মাহ লন্ডনের গর্ভনিং ও ম্যানেজম্যান্ট কমিটির সদস্য, প্যারেন্ট গর্ভনর-স্টেপনীগ্রীন সেকেন্ডারি স্কুল, লন্ডন মুসলিম কাউন্সিল অব ব্রিটেনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, মুন সাইটি কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ সলিডারিটি ইউকের সদস্য।

www.pathagar.com

মাওলানা আবুল কালাম মওদুদ হাসান ইসলামি কলেজ লন্ডন ও আল হুদা মাদরাসার প্রধান হিসেবে কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বহু দেশ সফর করেছেন এবং বহু আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন।

তিনি জামেয়া রেদওয়ানিয়া আল ইসলামিয়া বানিয়াচং এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কয়েকটি বই রচনা করেছেন এবং কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানের বইও তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তিনি দাওয়াত পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন।

৪৯. মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী সাবেক এম.পি (জন্ম: ১৯৬৩)

জন্ম-জগন্নাথপুর উপজেলার পাটলী গ্রামে। মাদরাসায়ে কাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল (র) মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাস করে এস.এস.সি ও এইচ এস.সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে অনার্স কোর্সে ভর্তি হন। কিন্তু মটর সাইকেল দুর্ঘটনায় আর অনার্স কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। শেষ পর্যন্ত বি.এ. পাস করে এল.এল.বি. কোর্স সম্পন্ন করে সিলেট ও সুনামগঞ্জের উকিলবারে আইনজীবী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি বৃহত্তর সিলেটের মেধাবী ছাত্র হিসেবে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ষ্টুডেন্টস এডওয়ার্ড লাভ করেন। তিনি 'তৌহিদী পরিক্রমা' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। তিনি 'ঈমান ও দেশ বাঁচাও' আন্দোলনের সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা। তিনি খতমে নবুওত আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক। আঞ্জুমানে তানজিমুল মাদারিসের জয়েন্ট সেক্রেটারী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক। সিলেট উপশহর হযরত শাহজালাল (র) ইসলামী একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল।

২০০১ সালে তিনি চারদলীয় ঐক্যজোটের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন আওয়ামী লীগের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আযাদ। সামাদ সাহেবের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে শাহীনুর পাশা চৌধুরী এ নির্বাচনে পরাজিত হন। এ নির্বাচনে পরাজিত হলেও আব্দুস সামাদ আযাদের মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে জনাব শাহিনুর পাশা চৌধুরী এম.পি. নির্বাচিত হন। তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যে সফর করেন। তিনি এলাকার প্রভূত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করেন।

৫০. মাওলানা শায়েখ তাজুল ইসলাম। (জন্ম-১৯৪৬)

জন্ম-বোনিয়াচং উপজেলার আউয়াল মহল গ্রামে। তিনি গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে নবীগঞ্জ হাইস্কুলে ও হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজে ১ বছর ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার পর লেখাপড়ার গতি পরিবর্তন করে মীরপুর কওমী মাদরাসায় ভর্তি হন। তাঁরপর ধরমন্ডল কওমী মাদরাসা, সিকন্দরপুর মাদরাসা, ইমামবাড়ি মাদরাসা ও ঢাকার লালবাগ মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। ধরমন্ডল মাদরাসায় অবস্থানকালীন সময়ে তিনি কুরআন মজিদ হিফজ করেন।

www.pathagar.com

ছাত্রাবস্থায় তিনি লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। ঢাকার প্রায় সব দৈনিক এবং সিলেট ও হবিগঞ্জের প্রায় সব দৈনিকে তাঁর লেখা ছাপা হয়। তাঁর লিখিত কলাম 'সুতরাং সাধু সাবধান' সর্ব মহলে প্রশংসিত। তিনি সাপ্তাহিক চিন্তাধারা পত্রিকার সহ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর গবেষণা কর্মের জন্য তিনি ঢাকা থেকে পালক এওয়ার্ড'৯৮ লাভ করেন। তিনি ২০০০ সালে কলকাতায় চোখ সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। কলকাতা বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এ সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সময় ভারতীয় মন্ত্রী, সাহিত্যিক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। ২০০১ সালে সিলেট সারদা হলে গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। তিনি বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রে প্রচারিত 'জীবন ও ধর্ম' নামের অনুষ্ঠানের পরিচালক। এ পর্যন্ত তিনি ১৮টি বই রচনা করেছেন। এগুলো কাব্য, প্রবন্ধ-সম্ভার, গবেষণা কর্ম, ইতিহাস ঐতিহ্য, ভ্রমণ কাহিনী, রম্য রচনা ইত্যাদি। তাঁর রচিত চলমান জালালাবাদ: ইসলামী রেনেসাঁয় অন্যান্য যারা ১ম খন্ড একটি অসাধারণ গবেষণা কর্ম। এ খন্ডে তিনি জালালাবাদের প্রায় আড়াইশত আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদের জীবন কাহিনী ও ৩৭টি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত ধৈর্য্য ও কষ্টসাধ্য এ কাজ করে তিনি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য বিরাট অবদান রেখেছেন। এ সিরিজের ২য় খন্ড তিনি প্রস্তুত করছেন। তিনি ইনসাফ ও উদারতা দেখিয়ে আলেম সমাজের মধ্যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তিনি ইতিহাসের আনাচে-কানাচে প্রবেশ করে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে ও তিনি যে কাজ করে যাচ্ছেন আল্লাহ যেন তাঁর পূর্ণতা দান করেন।

তিনি সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী। তাই ইসলামী রাজনীতিতে তাঁর অনুপ্রবেশ। তিনি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের সাথে জড়িত । তিনি ১৯৯৬ সালে খেলাফতে মজলিশের হয়ে হবিগঞ্জ-২ বানিয়াচং আজমিরিগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী কিছু ঘটনা

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। পাকিস্তানী সেনাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ঐ বছর ১৬ডিসেম্বর বিজয় লাভ হয়। অতঃপর বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ভারত থেকে এসে বাংলাদেশ শাসন করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১০জুন শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্তি লাভ করে ঢাকার মাটিতে পা রাখেন।

এদিকে বিজয় লাভের অব্যবহিত পর উলামা মাশায়েখ ও ইসলামপন্থীদের জেলে আটক করা হয়। সিলেটের শীর্ষ স্থানীয় উলামাদের অন্যতম শায়েখে কৌড়িয়া-হাফিজ মাওলানা আব্দুল করিম, শায়েখে ফুলবাড়ি মাওলানা আব্দুল মতিন চৌধুরী, মাওলানা নূরউদ্দিন গহরপুরী, শায়েখে কাতিয়া মাওলানা আমিন উদ্দীন, মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী সহ অসংখ্য উলামায়ে মাশায়েখ জেলে আবদ্ধ হন। জামায়াতের জনাব সামসুল হক, হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান, মাওলানা আব্দুর নূর, হাফিজ মাওলানা আবু সায়িদ সহ আরো কয়েকজন জেলে আটক হন। পাকিস্তানের সাবেক শিল্পমন্ত্রী আজমল আলী চৌধুরী, মুসলিম লীগ নেতা ডা. আব্দুল মজিদ ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা মাওলানা সামসুল ইসলাম শেরপুরীকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। অনেক নেতার নাগরিকত্ব হরণ করা হয়।

১৯৭২ সালে গণপরিষদের মাধ্যমে সংবিধান রচিত হয়। সংবিধানে আধিপত্য বাদী ভারত ও সমাজতান্ত্রিক সৌভিয়েত রাশিয়ার অনুসরণে ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ বানানো হয়। ইসলামের নামে দল ও সংগঠন করা সাংবিধানিক আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কোরানের আয়াত 'রাব্বি জিদনি ইলমা এবং ঢাকা বোর্ডের মনোগ্রাম থেকে 'ইকরা বিইসমি রাব্বি কাল্লাজি খালাক' উঠিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হল এবং জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেওয়া হয়। ঢাকা ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজের নাম পরিবর্তন করে নজরুল ইসলাম কলেজ রাখা হয়। আরো কয়েকদিন পর নজরুল ইসলামের 'ইসলাম' শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু নজরুল কলেজ রাখা হয়। এভাবে যেখানে কোরআনের আয়াত পাওয়া গেছে সেখান থেকে আয়াত বাদ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ পাওয়া গেছে সেখান থেকে তা বাদ দেওয়া হয়। নাস্তিক মুরতাদ দাউদ হায়দার রাসূল (স) এর প্রতি জঘন্য ভাষায় কটাক্ষ করে কবিতা লিখে। এইজন্য শাস্তির কোন ব্যবস্থা না করে তাকে জামাই আদরে সরকারিভাবে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 'আল্লাহর রসুল (স) মূর্তি ভাঙ্গার জন্য আগমন করেছিলেন' অথচ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের রাজধানী মসজিদ নগরী ঢাকা

www.pathagar.com

সহ সারাদেশে সরকারি ভাবে মূর্তি স্থাপন করা হয়। অগ্নি উপাসকদের অনুসরণে 'শিখা চিরন্তন' জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। দ্বীনি মাদরাসা বন্ধ করে হাসপাতাল ও সামাজিক মিলন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। সংবিধানের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ' লেখাত হয়ই নাই বরং যেখানে 'আল্লাহ' শব্দ পাওয়া গেছে সেখান থেকে 'আল্লাহ' শব্দটি বাদ দিয়ে 'স্রষ্টা' লেখা হয়। মুসলমানদের নামের আগে 'মুহাম্মদ' ও'আলহাজ্ব' বাদ দিবার দাবি উথাপন করা হয়। মাদরাসা পাস করা ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। পাঠ্য পুস্তক থেকে হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনী বাদ দেওয়া হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ধর্ম শিক্ষা না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাতীয় ও ইসলামী মূল্যবোধ বিধ্বংসী বহু ঘটনা বাস্তবিকই ঘটেছিল যা উল্লেখ করতে গেলে এ অধ্যায়ের কলেবর অনেক বড় হয়ে যাবে। 'আকলমন্দের জন্য ইশারাই যথেষ্ট' মনে করে এ সংক্রান্ত আলোচনার ইতি টানা হল।

পুনর্বাসন কাজ

এ সময় মুজিব বাহিনী ও তাঁর দোসররা ভারত থেকে ফিরে এসে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী আলেম সমাজ, ইসলামী দলের নেতা কর্মী ও সমর্থক এবং আওয়ামী বিরোধি রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপর জুলুম আরম্ভ করে। বিশেষ করে যারা স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করত তাদের অনেকের সম্পদ কেড়ে নেয়। অনেককে চাকরিচ্যুত করে সে পদে তাদের নিজেদের লোককে বসিয়ে দেয়। নিরাপত্তাহীনতাঁর কারণে অনেককে স্বেচ্ছায় জেলে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের পরিবারের সদস্যগণ দৈহিক হুমকির শিকার ও আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়।

এ সময় সিলেট শহরের জামায়াত নেতা হোমিও ডাক্তার শাহ মাহবুবুস সামাদ অসীম সাহস ও জনপ্রিয়তা নিয়ে হযরত শাহজালাল (র)এর দরগার পূর্ব গেইটে তাঁর ফার্মেসী খোলা রাখেন এবং চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যান। তাঁর মধুর ব্যবহার জনগণের জন্য তাঁর দরদ, আর চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সুনামের কারণে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার হৃদয়ে তিনি স্থান করে নেন। দরগাহ মহল্লা এলাকায় তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করার কারণে এলাকায় ছিল তাঁর এক সম্মানজনক ভাব-মর্যাদা। ফলে তাঁকে কেউ ডিসটার্ব করতে সাহস করে নাই। পরিবেশ কিছুটা স্থিতিশীল হবার পর তিনি সিলেট অঞ্চলের জামায়াত নেতা ও কর্মীদের পরিবারবর্গের খোঁজ-খবর নেওয়া আরম্ভ করেন। অন্যদিকে ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো.ফজলুর রহমান প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে সিলেট শহরে আসতেন এবং শনিবার সকালে কর্মস্থলে চলে যেতেন। তিনি ও ডা.সামাদ প্রতি শুক্রবার একত্রিত হয়ে গোটা পুনর্বাসন কাজের পরিকল্পনা করতেন এবং সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতাঁর কাজ চালিয়ে যেতেন এ সময় অনেকেই দুস্থ পরিবারে পৌঁছিয়ে দিবার জন্য তাদের কাছে সাহায্য দ্রব্য জমা করতেন। যারা ঐ সময় পুনর্বাসন কাজে সহায়তা করেছেন তাদের কয়েকজন হলেন সিলেট চেম্বার অব কমার্স এর সাবেক সভাপতি জনাব বদরুল ইসলাম, মিরাবাজারের মৌলভী আব্দুল

www.pathagar.com

কাদির খান, মুল্লার গাঁওয়ের জনাব তজম্মুল আলী জায়গীদার ও বড়লেখার হাজী কুতুব উদ্দীন। এছাড়া একজন মহীয়সী নারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর শ্রদ্ধেয় আম্মা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্যা বেগম সিরাজুন নেছা চৌধুরী। তিনি প্রায় প্রতি মাসে ডা.সামাদ সাহেবকে তাঁর বাসায় ডেকে আনতেন এবং জামায়াতের মজলুম কর্মীদের পরিবারবর্গের কাছে পৌঁছিয়ে দিবার জন্য কিছু সাহায্য দ্রব্য তাঁর হাতে তুলে দিতেন। বিশেষ করে দুই ঈদে তিনি খোলা হাতে সহযোগিতা করতেন। এ সময় আরো এক সাহসী ছাত্র নেতা কুলাউড়ার সৈয়দ গোলাম সোবহানী পুনর্বাসন কাজে বিরাট অবদান রাখেন। অধ্যাপক ফজলুর রহমান ও ডা.সামাদ সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং তাদের তদারকীতে সৈয়দ গোলাম সোবহানীকে একটি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভের ব্যাগ এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিও ওষুধ ক্রয় করার মূলধন জোগাড় করে দেওয়া হয়। তিনি ঢাকা থেকে পাইকারী দামে ওষুধ কিনতেন এবং সিলেট অঞ্চলের সর্বত্র ওষুধ বিক্রি করতেন। এ অছিলায় তিনি জামায়াত কর্মীদের পরিবারবর্গের খোঁজ খবর নিতেন এবং যতদূর সম্ভব সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা করার চেষ্টা করতেন। মাওলানা আব্দুন নূর সাহেব প্রথম দিকে জেলে ছিলেন। তিনি শায়েখে কৌড়িয়া হাফিজ মাওলানা আব্দুল করিম সাহেবের সাথে জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এর প্রধান হিসেবে শায়েখে কৌড়িয়া তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হস্তক্ষেপে জেল থেকে মুক্ত হন। উল্লেখ্য যে, মাওলানা আব্দুন নূর কৌড়িয়া সাহেবের পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দা। শেখ সাহেবের সাথে মাওলানা আব্দন নূর সাহেবের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক থাকায় শেখ সাহেবের বদান্যতায় তিনি তাঁর সাথে একত্রে জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসেন। মাওলানা আব্দুন নুর সাহেব জেল থেকে মুক্ত হবার পর ডা.সামাদ ও অধ্যাপক ফজলুর রহমানের সংস্পর্শে আসেন। মাওলানা আব্দুন নূর সাহেবকে ব্যবসা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে ব্যবসার মূলধনের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তিনি চট্টগ্রাম থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে আসতেন এবং সিলেট অঞ্চলে বিক্রি করতেন। যা লাভ হত তা থেকে নিজের প্রয়োজন পূরণ করতেন। অবশিষ্টাংশ জামায়াতের মজলুম পরিবারের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেন। সৈয়দ গোলাম সোবহানী ও মাওলানা আব্দুন নূর সাহেব ২/৩ বছর এ মহৎকাজ আঞ্জাম দেন।

ডা.শাহ মাহমুদুস সামাদ হযরত শাহজালাল (র) এর দরগার পূর্ব গেইটে একটি ফার্মেসিতে নিরাপদে ব্যবসা করতেন। তিনি খুবই পরোপকারী লোক। এখবর জেলার বাইরে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন জেলা থেকে জামায়াতের ও ছাত্র সংঘের কিছু মজলুম আল্লাহর বান্দা তাঁর সান্নিধ্যে আশ্রয় নেন। যারা বাইরে থেকে তাঁর কাছে আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েক জন হলেন : জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক আবু নাসের মোহাম্মদ আব্দুজ্জাহেরের বড় ভাই জনাব ওয়ালী উল্লাহ, কেন্দ্রীয় নেতা জনাব মীর কাসেম আলীর ভগ্নিপতি শেখ নূর উদ্দীন ও তাঁর বড়ভাই মীর নাসিম আলী, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

জেলা জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারী জনাব এহিয়া আহমদ খালেদ। এ ছাড়া আরো যারা আসেন তাঁরা হলেন ডা.আব্দুস সালাম, ডা.শেখ শিবলী নোমানী, ডা.নাজমুল ইসলাম, ডা.মুহাম্মদ ইলিয়াছ, ডা.শাহ মুজতবা জাহাঙ্গীর ও ডা.আসাদুজ্জামান কাবুল, (এরা সবাই ছাত্র হিসেবে সিলেট মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং এখান থেকে ডাক্তার হন), মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী (ইকবাল)। ডা.সামাদ সাহেব তাঁর নিজ বাসায় আশ্রয় প্রার্থীদের প্রাথমিক থাকা খাবার ব্যবস্থা করেন এবং সময়ের ব্যবধানে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। একাজ সম্পাদন করতে তিনি তাঁর কামাই রোজগারের অর্থ নিয়মিত খরচ করেছেন। এছাড়া প্রয়োজনের তাগিদে তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু জমি বিক্রি করে সমুদয় অর্থ পুনর্বাসন কাজে ব্যয় করেন। এখানে আরো এক সম্মানিত অতিথির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন জামায়াতের সাবেক পূর্ব পাক সেক্রেটারী মরহুম আব্দুল খালেক। তিনি এ সময় মৌলভী বাজারের জনাব দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিবের গ্রামের বাড়িতে কয়েকমাস আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। পুনর্বাসন পিরিয়ডে বাইরে থেকে মাঝে মধ্যে যারা সিলেটে আসতেন তাদের মধ্যে দু'জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা হলেন জামায়াতের বর্তমান কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমদ ও ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রামের সভাপতি মাওলানা সামস উদ্দীন। তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সিলেট আসতেন এখানকার হাল হকিকত জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করতেন, পূনর্বাসিন কাজে পরামর্শ দিতেন এবং মাঝে মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতেন। কোন কোন সময় জনাব মকবুল আহমদ, মাওলানা আব্দুননূর ও অধ্যাপক ফজলুর রহমান সাহেবকে চট্টগ্রাম ডাকায়ে নিয়ে সবার হালহকিকত জানতেন এবং প্রয়োজনীয় গাইডেন্স দান করতেন।

পুনর্বাসিন কাজে সহযোগিতাঁর ব্যাপারে আরো একটি প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা জরুরি। প্রতিষ্ঠানটি হল 'দাওয়াতুল ইসলাম ইউ.কে. এন্ড আয়ারল্যান্ড' এবং এর সাবেক আমীর মুহতাঁরাম 'আব্দুস সালাম'। দাওয়াতুল ইসলামের সহযোগিতায় বিভিন্ন দুর্যোগে মজলুম ব্যক্তিগণ ও তাদের পরিবারবর্গ বিভিন্নভাবে উপকৃত হন। তাদের সহযোগিতাঁর কারণে সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠন মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। দাওয়াতুল ইসলামের সহযোগিতায় জনাব সামসুল হক, হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান, হাফিজ মাওলানা আবু সায়ীদ, মাওলানা আব্দুন নূর, মাওলানা সামসউদ্দীন প্রমুখ বিলাতে যাবার সুযোগ পেয়েছেন। এরা বিলাতে গিয়ে ইসলামী কর্মকান্ডে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন । আলহামদু লিল্লাহ।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সিলেটে ইসলামী কর্মতৎপরতাঁর সূচনা

সিলেট অঞ্চলে জামায়াত নেতা, কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গের পুনর্বাসনের একটা দিক নির্দেশনা (Line of Action) ঠিক করার পর অধ্যাপক ফজলুর রহমান ও ডা.সামাদ বাংলাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার প্রয়াস পান। দেখা গেল ইসলামী

www.pathagar.com

দল ও সংগঠন নিষিদ্ধ হয়ে আছে। মাদরাসা মক্তব খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই। মশহুর উলামা মাশায়েখদের প্রায় সবাই জেলে আবদ্ধ। ইসলামী বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে আছে। কেউ ইসলামী বই পুস্তক প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছে না। ইসলামী বই পুস্তক যার কাছে যা ছিল হয় তা ধ্বংস হয়ে গেছে নতুবা গোপন করে ফেলা হয়েছে । ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে ভারতের প্রবল আপত্তির মুখে লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফী ঢাকা এসে বিশেষ বিমানে করে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) এর পাকিস্তান সম্মেলনে নিয়ে যান। তখন জনৈক কূটনীতিকের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন 'বাংলাদেশে চট্টগ্রামের ব্যারিষ্টার এসএ সিদ্দিকী কর্তৃক লিখিত 'সত্য সমাগত অসত্য বিতাড়িত' নামে একটি ইসলামী বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই জবাব থেকে বুঝা যায় যে, ১৯৭২ থেকে '৭৪ এবং OIC-র সম্মেলন পর্যন্ত বাংলাদেশে মাত্র একটি ইসলামী বই প্রকাশিত হয়েছে। এ ঘটনা থেকে অনুভব করা যায় যে, তখনকার সময়ে ইসলামী বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা প্রকাশের কি সংকটকাল অতিক্রান্ত হয়েছে।

মাইলস্টোন পাবলিকেশন্স লিমিটেড

বাংলাদেশে ইসলামী বই পুস্তকের হাল যে কি হতে যাচ্ছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে ১৯৭২ সালে সিলেটে একটি প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলা হয়। সংস্থার নাম রাখা হয় 'মাইলস্টোন পাবলিকেশন্স লিমিটেড' সংস্থাটি লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়। কোম্পানির চেয়ারম্যান হন খুলনা থেকে সদ্য আগত সিলেট শহরে অবস্থানরত বিয়ানী বাজারের একজন অপরিচিত ব্যক্তি নাম এইচ সালাম। সংস্থার এমডি নিযুক্ত হন অধ্যাপক ফজলুর রহমান। কোম্পানির পরিচালকদের কয়েকজন হলেন ড.মাহবুবুস সামাদ, জনাব বদরুল ইসলাম ও তজম্মুল আলী জায়গীর দার। প্রকাশনা সংস্থার নাম মাইল স্টোন রাখার একটি ইতিহাস আছে। মিশরের ইখওয়ানুল মুসলেমিন নেতা শহীদ কুতুবকে যে ইসলামী বই লেখার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয় সে বইয়ের নামের ইংরেজি তরজমা হল 'Milestone'। এই ঐতিহাসিক বই ও তাঁর লেখক শহীদ কুতুবের স্মরণে প্রকাশনা সংস্থার নাম রাখা হয় 'Milestone Publications Limited' এই সংস্থা থেকে বই প্রকাশ করলে জীবনের ঝুঁকি আসতে পারে জেনে বুঝেই প্রকাশনা সংস্থার এ নাম রাখা হয়েছে। এ সংস্থার পক্ষ থেকে প্রথম বই প্রকাশ করা হয় মরহুম নঈম সিদ্দিকীর 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান'। বইটির প্রচ্ছদ অংকন করেছিলেন জনাব আজিজুর রশীদ চৌধুরী । জনাব সামসুল হক জেলে অন্তরীণ অবস্থায় কয়েকটি বই লিখেন। জেল থেকে তিনি কৌশলে দুইটি বই পাঠিয়ে দেন। বই দুটো সরলমনা শিশু কিশোরদের ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেবার জন্য লিখিত হয়েছিল। লেখক বই দুটোর নাম রেখেছিলেন ইসলামী শিক্ষা-১ ও ইসলামী শিক্ষা-২। তখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতি সামনে রেখে বই দুটোর নাম পরিবর্তন করে বই প্রকাশ করা হয়।পরিবর্তিত নাম হল আধুনিক বাংলা পাঠ-১ ও আধুনিক বাংলা পাঠ-২। '৭৫

www.pathagar.com

সালে দেশের পটপরিবর্তন হয়। তাঁরপর অধুনালুপ্ত ইসলামী পাবলিকেশন্স আধুনিক প্রকাশনী নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঢাকা থেকে ইসলামী বই-পুস্তকের প্রকাশনা শুরু হয়। ফলে সীমান্ত জেলা সিলেট থেকে বই-পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। যার কারণে Milestone Publications Limited আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

স্মরণিকা সংসদ

ইসলামী ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনী আলোচনা করার ব্যবস্থা করার জন্য অধ্যাপক ফজলুর রহমান, ডা.শাহ মাহবুবুস সামাদ ও এম.সি. কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব নূরুল আলম রইসীর পরিকল্পনায় ১৯৭৩ সালে 'স্মরণিকা সংসদ' নামে সিলেটে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। ১৯৭৩ সালের ১২ রবিউল আওয়াল ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এর আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতাঁর পর সিলেট অঞ্চলে প্রকাশ্যে কোন ইসলামী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় নি।ঐ আলোচনা সভায় দু'জন অতিথি বক্তা ছিলেন। তাদের একজন হলেন সিলেট মদন মোহন কলেজের প্রিন্সিপাল বাবু কৃষ্ণকুমার পাল চৌধুরী। অন্যজন হলেন একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা (এ মুহূর্তে তাঁর নাম স্মরণ হচ্ছে না)। প্রিন্সিপাল কৃষ্ণ কুমার পাল চৌধুরী তাঁর বক্তব্যের উপসংহারে বলেছিলেন 'বঙ্গবন্ধু আপনি সোনার বাংলা গড়তে চান? সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ দরকার। আর নবীজীর আদর্শ ছাড়া সোনার মানুষ গড়া সম্ভব নয়।'

১৯৭৪ সালে রবিউল আওয়াল মাসে স্মরণিকা সংসদের উদ্যোগে আরো একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ আলোচনা সভার প্রধান বক্তা ছিলেন জাসদের সিলেট জেলা সভাপতি মাস্টার আব্দুন নূর। '৭৪ সালে জাসদ জনপ্রিয়তাঁর শীর্ষে অবস্থান করছিল। মাস্টার আব্দুন নূর সাহেব তখন সিলেটে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তি। তিনি স্মরনিকা সংসদের ডাকে সাড়া দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে ধারণাতীত তথ্য বহুল ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পেশ করেন।

এ সময় মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বিরোধি দলীয় নেতা হিসেবে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর বহুল প্রচারিত 'হক কথা' মানুষের হাতে হাতে শোভা পাচ্ছিল। তিনি এসময় 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' ও ইসলাম সম্পর্কে প্রকাশ্যে মিটিং মিছিল আরম্ভ করেন। মাওলানা ভাসানীর কার্যকলাপ ও কথাবার্তা জনগণকে খুবই অনুপ্রাণিত করে। মানুষ সাহসী হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে দেশে ওয়াজ মাহফিল, ইসলামী আলোচনা শুরু হয়ে যায়। এ সময় কুরআন হাদীসের আলোচনা, তাফসীর মাহফিল ইত্যাদি প্রকাশ্যে আয়োজন করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

আঞ্জুমানে খেদমতে কুরআন, সিলেট

১৯৭৫ সালের পবিত্র রমজান মাসে আল্লাহর তিন বান্দা সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী, অধ্যাপক ফজলুর রহমান ও জনাব আজির উদ্দীন আহমদ একটি দ্বীনি সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন কায়েম করেন। সংগঠনের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল-'আল কুরআনের নির্দেশ ও রাসুল (স)এর সুন্নাহ অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।'

আঞ্জুমানের কর্মসূচি হল:-ইলম, আমল ও দুঃস্থ মানবতাঁর সাহায্য, আর্ত মানবতাঁর সেবা ও সৃষ্টির খেদমত সংক্ষেপে 'খেদমতে খালক।' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী, সেক্রেটারী অধ্যাপক ফজলুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠাতা প্রচার সম্পাদক জনাব আজির উদ্দীন আহমদ।প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রখ্যাত মুফাচ্ছিরে কুরআন হযরত মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীকে প্রধান অতিথি করে এক ইসলামী মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাহফিল কামিয়াব করার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি 'ইন্তেজামিয়া কমিটি' গঠন করা হয় । সম্মেলন আশাতীত কামিয়াব হয়। শহরে ব্যাপক সাড়া পড়ে।

মাহফিল থেকে ইন্তেজামিয়া কমিটির পরামর্শে আঞ্জুমানে খেদমতে কুরআনকে গণপ্রজা তন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'ডাইরেক্টরেট অব সসিয়েল ওয়েলফেয়ার' (Directorate of Social Wealfare) চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিস থেকে রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া তাদের পরামর্শ অনুসারে কার্যনির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত পরিষদ ছিল নিম্নরূপ :

১৯৭৭ ঈসায়ী পুনর্গঠিত আঞ্জুমানে খেদমতে কোরআনের কার্যনির্বাহী পরিষদ :

সভাপতি	ঃ আলহাজ্ব মুদররিছ চৌধুরী
সহ-সভাপতি	ঃ জনাব আমিরুল ইসলাম
” ”	ঃ জনাব আব্দুল গণি এডভোকেট
” ”	ঃ জনাব আলহাজ্ব আব্দুল বারী
কোষাধ্যক্ষ	ঃ জনাব আজিজুল হক
(সাবেক ম্যানেজার সোনালি ব্যাংক, জিন্দাবাজার শাখা)	
সাধারণ সম্পাদক	ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	ঃ অধ্যাপক ফজলুর রহমান
” ” ”	ঃ অধ্যাপক আফজাল চৌধুরী
” ” ”	ঃ জনাব মাহবুবুর রহমান
সাংগঠনিক সম্পাদক	ঃ জনাব সাখাওয়াতুল ইসলাম চৌধুরী
প্রচার সম্পাদক	ঃ জনাব আজিজুর রশীদ চৌধুরী
সমাজ সেবা সম্পাদক	ঃ আলহাজ্ব ডা.শাহজাহান নুরুস সামাদ চৌধুরী
সদস্য	ঃ অধ্যক্ষ ফয়জুল কবীর
” ”	ঃ জনাব লুৎফুর রহমান জায়গীরদার
” ”	ঃ জনাব তজ্জম্মুল আলী জায়গীরদার
” ”	ঃ জনাব মুসলিম চৌধুরী
” ”	ঃ জনাব মো.আশরাফ আলী

www.pathagar.com

”	”	ঃ জনাব আজির উদ্দিন আহমদ
”	”	ঃ আলহাজ্ব ডা.আব্দুল মন্নান
”	”	ঃ জনাব আবুল লেইছ
”	”	ঃ জনাব সিরাজুল ইসলাম
”	”	ঃ জনাব এডভোকেট আব্দুল মতিন
”	”	ঃ জনাব আলহাজ্ব সুলতান খান
”	”	ঃ জনাব সমুজ মিয়া
”	”	ঃ জনাব মোহাম্মদ হুসেইন
”	”	ঃ জনাব খন্দকার আব্দুল মালিক।

পরবর্তী পর্যায় বিভিন্ন বছরে আঞ্জুমানে খেদমতে কোরআনের কার্যনির্বাহী পরিষদে আরো যারা জড়িত হয়েছিলেন। তাদের কয়েকজন হলেন হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান, হাকিম শাহ হাবিবুর রহমান, জনাব রইছ উদ্দিন আহমদ মীর, ডা.রেজাউল মোস্তাফা, আলহাজ্ব মুহি উস সুন্নাহ চৌধুরী, জনাব নজরুল ইসলাম (ম্যানেজার সোনালি ব্যাংক), জনাব শফিকুর রহমান, এডভোকেট আবু হাসান আব্দুল্লাহ, জনাব সঈদ আব্দুন নবী, মাস্টার আব্দুল লতিফ, জনাব আব্দুল আজীজ খান, জনাব আব্দুস সাত্তার, জনাব আওলাদ আলী চৌধুরী, জনাব আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী, জনাব আজমল খান, মাওলানা আনওয়ার উদ্দীন, এডভোকেট তখলিছুর রহমান, মাওলানা ফরীদ উদীন চৌধুরী, জনাব আব্দুননূর জায়গীরদার, জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব আলাউদ্দীন, অধ্যক্ষ কাজী শিহাব উদ্দীন ইয়াহইয়া, মাওলানা আব্দুন নূর, জনাব ফরীদ আহমদ রেজা, জনাব কাজী গোলাম মস্তফা, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা মুজাররদ আলী, মাওলানা সাদিক উদ্দিন, মাওলানা আব্দুল মুসাওয়্যির, হাফিজ মাওলানা আব্দুল হালিম, জনাব মুবাশ্বির আলী, মাওলানা সামসুদ্দীন, মাওলানা বশিরুজ্জামান, জনাব মইন উদ্দীন চৌধুরী, অধ্যাপক আব্দুস শহীদ, মাওলানা রেজাউল করিম, মাওলানা জমির উদ্দীন, মাওলানা আব্দুল মতিন, শায়েখে ইসহাক আল মাদানী, হাজী হায়াত উল্লাহ, প্রিন্সিপাল মাওলানা ইয়াকুব শরীফ, জনাব আব্দুল মজিদ তরফদার, জনাব মকবুল হোসেন, ডা. শফিকুর রহমান, কাজী এনাম আহমদ, হাফিজ আশফাক আহমদ, জনাব সুহেল আহমদ চৌধুরী, আলহাজ্ব মাহমুদ আলী, অধ্যাপক আব্দুল হান্নান, জনাব বদরুল ইসলাম, জনাব সাইদ চৌধুরী, জনাব এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, জনাব আব্দুল বাছিত, মাওলানা আবু তাইয়্যিব সৎপুরী, অধ্যাপক মাওলানা সাইয়্যেদ একরামুল হক, হাফিজ মাওলানা মাশহুদ আহমদ চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার নাসির উদ্দীন, এডভোকেট কুতুব উদ্দীন, জনাব আনওয়ার আলী আখলু, জনাব আবুল হাশেম, হাজী ফজলুর রহমান, মেজর জেনারেল (অব:) শফি আহমদ চৌধুরী, মৌলভী আব্দুল কাদির খান, ডা. সায়েফ আহমদ, মাওলানা সৈয়দ সালেহ আহমদ, জনাব ফখরুল ইসলাম, ডা. ফজলুর রহমান কায়সার, জনাব শাহ রুস্তম আলী (এজিএম, পুবালি ব্যাংক), মাওলানা মিছবাহুল ইসলাম চৌধুরী, হাফিজ মাওলানা আনওয়ার হোসাইন খান, জনাব জিয়াউদ্দীন নাদের, জনাব সেলিম আওয়াল, শায়েখে মুহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী আল মাদানী, মাওলানা সুহেল আহমদ,

www.pathagar.com

মাওলানা সাইয়্যেদ ফয়জুল্লাহ বাহার, অধ্যাপক আহমদ হোসাইন, জনাব আব্দুল করিম জলিল, জনাব সুলতান আহমদ, জনাব সেলিম উদ্দিন, জনাব নাজিম উদ্দীন, ডা.মুদাব্বির হোসেন, হাফেজ আব্দুল হাই হারুন, মাওলানা ক্বারী আলী হায়দার, জনাব মুকতাবিসুন নূর, জনাব ডা.রেদওয়ানুর রহমান, জনাব আব্দুল গাফফার বাবুল, জনাব আজিজুল হক মানিক, জনাব ডা.জামশেদ বখত, জনাব ইয়াকুব শরীফ, জনাব জাহেদুর রহমান চৌধুরী, প্রিন্সিপাল মাওলানা লুৎফুর রহমান হুমায়দী, অধ্যাপক আব্দুল মুছাওয়ীর, জনাব মতিউর রহমান, জনাব জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী (এজিএম সোনালি ব্যাংক), অধ্যাপক নজরুল হক চৌধুরী, অধ্যাপক আব্দুল আহাদ, জনাব জুবায়ের বখত চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল মতিন শাহবাগী, শায়েখে আব্দুস সালাম আল মাদানী, জনাব আব্দুশ শাকুর, এডভোকেট আলীম উদ্দীন, জনাব সায়েদ বখত চৌধুরী, জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব সিরাজুল ইসলাম শাহিন, মাওলানা আব্দুল হাই জিহাদী প্রমুখ।

আঞ্জুমানে খেদমতে কুরআন প্রতি বছর বিরাট আকারে বার্ষিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের আয়োজন করে থাকে। এ ছাড়া এ সংগঠনের উদ্যোগে বিভিন্ন মসজিদে সাপ্তাহিক তাফসীর মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়। মহিলা অঙ্গনে কুরআন হাদীসের চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ বিশেষ বাসায় নিয়মিত মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়।

আঞ্জুমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। শাহজালাল জামেয়া ইসলামীয়া স্কুল এন্ড কলেজ, মিরাবাজার, শাহজালাল জামেয়া ইসলামীয়া কামিল মাদরাসা-পাঠানটুলা, আল-আমীন জামেয়া ইসলামীয়া, ইসলামপুর, বাবুস সালাম হিফজ মাদরাসা, দক্ষিণ সুরমা, সুনামগঞ্জ আলহেরা মাদরাসার হিফজ বিভাগ আঞ্জুমানের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া এ সংগঠন বিভিন্ন মাদরাসা, সাবাহী মক্তব ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে নিয়মিত সাহায্য করে থাকে। আঞ্জুমান পাঠাগার স্থাপন, রমজান মাসে ছহি কুরআন প্রশিক্ষণ, ইসলামী দিবস পালন, বৃত্তি প্রদান, প্রতিযোগিতাঁর আহবান, খোলামাঠে ঈদের জামায়াতের ব্যবস্থাকরণ, হজ্ব প্রশিক্ষণ ইসলামী বই-পুস্তক প্রদর্শনী ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। খেদমতে খালক পর্যায়ে আঞ্জুমান জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন কার্যকলাপ যেমন জাতীয় দুর্যোগে সহায়তা প্রদান, বেওয়ারিশ লাশ দাফন, গরিব ছাত্রদেরকে সাহায্য প্রদান, বই বিতরণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, আর্তমানবতাঁর সেবা, দুঃস্থদের চিকিৎসা সেবা, নও-মুসলিম পুনর্বাসন, যাকাত সংগ্রহ ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের মাঝে বন্টন ইত্যাদি কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। আঞ্জুমান সমাজ জীবনের বিভিন্ন সেক্টরে অবদান রেখে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

ইসলাম বিরোধি কার্যকলাপের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ

রাসূল (স) এর শানে আপত্তিকর কবিতা লেখায় দাউদ হায়দারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কিছুদিন পর ৭০দশকের প্রথম দিকে ঢাকায় এক মুরতাদ সাহিত্যিক কবি দাউদ হায়দার রাসূল (স) এর শানে বেয়াদবী করে একটি কবিতা লিখে যা তখন একটি জাতীয় পত্রিকায় ছাপা হয়। কবিতা প্রকাশের পর মুসলমানদের সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগে। তৌহিদী জনতাঁর চাপা অসন্তোষ গণরোষে

www.pathagar.com

পরিণত হয়। সারাদেশে এ মুরতাদ কবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। সিলেটের জনগণ এ ঝড়ে শরীক হয়। দাউদ হায়দারের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র ছাপিয়ে শহর ও গ্রামগঞ্জের জনতাকে অবগত করানো হয়। পরিকল্পিত পন্থায় প্রতিবাদ সভা করা হয়। প্রতিবাদে শহর অঞ্চলের জনগণের সাথে গ্রাম গঞ্জের বাসিন্দারাও সাড়া দেয়। জনগণকে প্রতিবাদ মুখর করতে যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হলেন:ডা.শাহ মাহবুবুস সামাদ, অধ্যাপক ফজলুর রহমান ও পাবনা জেলার বাসিন্দা তৎকালীন এম.সি কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব নুরুল আলম রইসী। সারাদেশে ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দাউদ হায়দারকে গোপনে সীমান্ত পার করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দেন।

সর্দার আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

এ দশকে আরো এক কুলাঙ্গার সিলেট এম.সি কলেজের অধ্যাপক সর্দার আলাউদ্দিন সিলেটের স্থানীয় সাপ্তাহিক 'সিলেট সমাচার' নামক পত্রিকায় রাসূল (স) এর চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে এক প্রবন্ধ লিখে। এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর সিলেটের ইসলামপ্রিয় জনতাঁর মনে দারুন ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ জনতাকে সংগঠিত করার জন্য অধ্যাপক আফজাল চৌধুরী, অধ্যাপক ফজলুর রহমান, ডা.শাহ মাহবুবুস সামাদ, এডভোকেট মাওলানা আব্দুর রকীব, আব্দুল মুমিন চৌধুরী প্রমুখ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। চতুর্দিকে প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। প্রতিবাদ বিক্ষোভে মসজিদের ইমাম সাহেবান ও কওমী মাদরাসার উস্তাদ ও ছাত্রগণ শরীক হন। ফলে মুরতাদ সর্দার আলাউদ্দিন তৎক্ষণাৎ সিলেট ত্যাগ করে । এম.সি. কলেজ কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী হয়ে সংগে সংগে তাকে বদলী করার ব্যবস্থা করেন।

প্রদর্শনীর নামে জুয়া, হাউজী, যাত্রা ও অশ্লীল নাচ গানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মামলা

৭০ দশকে প্রশাসনের সহযোগিতায় এক বিশেষ গোষ্ঠি সিলেট স্টেডিয়ামে প্রদর্শনীর (Exhibition) এর আয়োজন করে। প্রদর্শনীতে কিছু ভাল জিনিসের সাথে জুয়া, হাউজি, যাত্রা ও অশ্লীল নাচগানের আয়োজন করা হয়। সিলেটের ইসলাম প্রিয় জনগণ এ আয়োজনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়। বিক্ষুব্ধ জনগণকে পরিকল্পনা মাফিক সংগঠিত করা হয়। শুরু হয় প্রতিবাদ। প্রতিবাদ সভার সভাপতিত্ব করেন শায়েখে কৌড়িয়া হযরত মাওলানা হাফিজ আব্দুল করিম। প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিলে গণজাগরণের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সিলেট সদর মুন্সেফ আদালতে প্রদর্শনীর নামে অশ্লীলতা আমদানির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলায় সিলেট সদর মহকুমা হাকিমকেও আসামী করা হয়। এতে প্রশাসনের টনক নড়ে। তাৎক্ষণিক প্রদর্শনী বন্ধ করার আদেশ জারী করে মামলার রায় হয়। ফলে প্রদর্শনী বন্ধ হয়ে যায়। এ ঘটনার পর আজ পর্যন্ত সিলেট শহরে এ জাতীয় প্রদর্শনীর কোন আয়োজন করা হয় নি।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
১৯৭৫ সালে দেশের পট পরিবর্তন ও পরবর্তী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভোররাতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লে.কর্নেল রশীদ, লে. কর্নেল ফারুক, মেজর পাশা, মেজর হুদা, মেজর মহিউদ্দীন, চাকরিচ্যুত মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ার, মেজর নূর ও তাদের সঙ্গী-সাথীগণ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে মুজিব সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী ও আওয়ামী মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ সম্পাদক খন্দকার মুশতাঁর আহমদকে রাষ্ট্রপতির আসনে সমাসীন করেন। ৪ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ নতুন রাষ্ট্রপতির আনুগত্য প্রকাশ করেন। মুজিব সরকারের নিম্নোক্ত মন্ত্রীগণ মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন।

মন্ত্রী	প্রতিমন্ত্রী
১.আবু সায়ীদ চৌধুরী	১. দেওয়ান ফরিদ গাজী
২. অধ্যাপক ইউসুফ আলী	২.মোমেন উদ্দীন আহমদ
৩.ফনীভূষণ মজুমদার	৩.নুরুল ইসলাম চৌধুরী
৪.সোহরাব হোসেন	৪.শাহ মোয়াজ্জম হোসেন
৫.মনোরঞ্জন ধর	৫.তাহের উদ্দীন ঠাকুর
৬. আব্দুল মোমিন	৬.মুসলেম উদ্দিন খান
৭.আসাদুজ্জামান খান	৭.নূরুল ইসলাম মঞ্জুর
৮.ডা.এ .আর মল্লিক	৮. কে.এম ওবায়দুর রহমান
৯.ডা.মুজাফফর আহমদ	৯.ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল
	১০. রিয়াজ উদ্দীন আহমদ (ভোলা মিয়া)

এদিকে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে আবির্ভূত হবার এক মজার ঘটনা আছে। ১৯৪৭এর পূর্বে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ দুগ্রুপে বিভক্ত ছিল । এক গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন খাজা নাযিম উদ্দিন, মাওলানা আকরাম খাঁ ও জনাব নুরুল আমিন। অন্য গ্রুপের নেতৃত্বে ছিলেন জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও জনাব আবুল হাশেম। '৪৭ পূর্বে উভয় গ্রুপ একদিন পাশাপাশি স্থানে ফরিদপুরে জনসভা আহবান করে। মিটিং শুরু হবার প্রারম্ভে হঠাৎ এক যুবক তাঁর বাহিনী নিয়ে হামলা করে খাজা নাযিম উদ্দিন ও মাওলানা আকরাম খাঁর জনসভা বানচাল করে দেয়। সব শ্রোতা সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেম সাহেবের জনসভায় চলে আসে। ফলে সফল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে সোহরাওয়ার্দী সাহেব জানতে চান, "কে ঐ যুবক, যে প্রতিদ্বন্দ্বির জনসভা ভন্ডুল করে দিয়ে আমাদের জনসভা কামিয়াব করে দিল।" তাঁর সামনে যুবককে আনা হল। ঐ যুবক আর কেউ নন, তিনি

হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। সোহরাওয়ার্দী সাহেব শেখ মুজিবকে কলকাতা নেবার ব্যবস্থা করেন এবং নিজের তত্ত্বধানে তাকে রাজনৈতিক সবক প্রদান করেন।

৪.ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাস আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেনি। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী; প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক; প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক শেষ মুজিবুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠাতা সহ সম্পাদক খন্দকার মুশতাঁর আহমদ।

নীতি আদর্শ ও অন্যান্য ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ (NAP) গঠন করেন। পার্টি গঠন উপলক্ষ্যে ঢাকার সদরঘাটের রূপমহল সিনমা হলে আহূত সম্মেলনে শেখ মুজিবুর মাওলানা ভাসানীকে শারিরীক ভাবে নির্যাতন করেন। ঢাকার পল্টন ময়দানে NAP এর প্রথম জনসভা শেখ মুজিব ও তাঁর অনুসারীগণ হামলা করে ভন্ডুল করে দেন। NAP এর মিটিং বানচাল করে দেবার পর শেখ মুজিব মন্তব্য করেন, তিনি পাকিস্তানের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে পাকিস্তান ধ্বংসের অপচেষ্টাকে অংকুরে বিনাশ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে জনাব অলি আহাদের বই জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫ এর ২৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেন:- "আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও আতাউর রহমান সরকার পাকিস্তানের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে আহূত জনসভার উদ্যোক্তাদের উপর হিটলারী ঝটিকা বাহিনীকে লেলাইয়া দিয়ে পাকিস্তান ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে অংকুরেই বিনাশ করার মহৎ কর্মটি সমাধা করেন। দেশ প্রেমের এত বড় অগ্নি পরীক্ষার মুহূর্তে কোন দেশ প্রেমিক পিছপা হয়? আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান আদর্শ দেশ প্রেমিকই বটে! উভয়ের যুগল প্রচেষ্টায় পাকিস্তান সেদিন নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পায়। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অখন্ডতা বজায় রাখার ব্যাপারে তাদের উভয়ের এই জেহাদী প্রেম নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।" শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের ৮ই মার্চ মাওলানা মওদুদীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন মাওলানা ভাসানী আজব চীজ, তিনি বিরাট ফিতনা, তাকে আমি দেশ ছাড়া করে ছাড়ব।" প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী জনাব শামসুল হক (টাংগাইল) মুসলিম লীগ সরকারের রোষানলে পড়ে কারাগারে আবদ্ধ হন। জেলে আবদ্ধ অবস্থায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ দখলের উদ্দেশ্যে যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিব ও তাঁর কয়েকজন অনুগত সাথী সামসুল হক ও তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুনের মধ্যে সুকৌশলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে পারিবারিক কলহ বাঁধিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, জনাব সামসুল হক জেল থেকে মুক্ত হবার মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁর স্ত্রী ঢাকার ইডেন কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুনকে পরিকল্পিত ভাবে তাঁর দুই শিশু কন্যা সহ উচ্চতর ট্রেনিং-এর জন্য নিউজিল্যান্ড পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সামসুল হক সাহেব তা জানতে পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বিনা চিকিৎসায় পাগল বেশে

www.pathagar.com

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। অবশেষে এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ভুলেও তাদের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারীকে স্মরণ করে না।

অন্যদিকে সহসম্পাদক খন্দকার মুশতাঁর আহমদ শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত বলে অনেকে ধারণা করে। । শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের ঠিক আগের দিন খন্দকার মুশতাঁর আহমদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

নতুন সরকার জাতীয় সংসদ আহবান করে। সংসদ সদস্যগণ নতুন সরকারকে অনুমোদন করে জাতীয় সংসদের স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল তখন লন্ডনে ছিলেন। তিনি মুজিব হত্যার খবর শুনে মন্তব্য করেন "ফেরাউনের পতন হয়েছে" একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ব্যতীত আওয়ামী লীগের সাধারণ সদস্য থেকে আরম্ভ করে দেশের কোন নাগরিক এ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ করে নি।

এ পটপরিবর্তনকে কেন্দ্র করে দেশে বহু পুস্তক, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচিত হয়েছে। এগুলোকে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন ইতিহাসের অংশ হিসেবে।আবার আরো একদল বলেছেন ইতিহাসের বিকৃতি। তাই দেশের কারো কোন লেখার রেফারেন্স না দিয়ে ঐ সময় দেশের এ পট পরিবর্তনকে সামনে রেখে লন্ডনের "দি গার্ডিয়ান, ফিনান্সিয়াল টাইমস, সানডে টাইমস, সানডে টেলিগ্রাফ, আমেরিকার ওয়াশিংটন পোষ্ট এবং ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিও"-তে এ ঘটনা সম্পর্কে পরদিন, তাঁর পরদিন ও তাঁর পরদিন অর্থাৎ ১৬, ১৭ ও ১৮ আগস্ট ১৯৭৫ যে প্রতিবেদন সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল তা হুবহু উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

মুজিব নিজেই দায়ী : মার্টিন উলাকট

"মুজিবের মৃত্যুর নির্মম পরিহাস এই যে, পাকিস্তানীরা তাকে হত্যা করেনি, তাঁর দেশবাসীরাই তাকে হত্যা করেছে। এতে বুঝতে পারা যায়, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার শিখর থেকে হতাশা ও নৈরাশ্যের অতল গহবরে নেমে এসেছিলো, যার ফলে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে।

এর জন্য বহুলাংশে দায়ী মুজিব নিজে। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুজিব কোন সংস্কার সাধনে, এমনকি একটি যোগ্য, সৎ প্রশাসন গড়ে তুলতেও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এবং দেশে কিছুটা প্রগতি আনার জন্য তাঁর শেষ পদক্ষেপই তাঁর পতন ডেকে এনেছে। বামপন্থী আদর্শে তিনি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনী তাঁর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ তাদের সমর্থনেই তিনি প্রথম ক্ষমতায় এসেছিলেন।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীনতাঁর পর থেকে ১২ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড বিদেশী সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির অবক্ষয় কমেনি। কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের কারসাজিতে দেশের কৃষিনীতিও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগের চাঁই। এ অবস্থায় মুজিব নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজছিলেন। তাতে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য মস্কোপন্থী দলগুলো উৎসাহ যুগিয়েছিলো।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে মুজিব দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এ বছর জানুয়ারি মাসে তিনি শাসনতন্ত্র সংশোধন করে কার্যত এক নতুন সংবিধান সৃষ্টি করলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুজিবের হাতে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা ন্যস্ত হলো, এমনকি বিচার বিভাগের কর্তৃত্বও। জাতীয় দল ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দল বেআইনি ঘোষিত হলো।

মুজিব মধ্যযুগীয় নৃপতির মত অফিসে-দরবারে বসতেন, বন্ধু বান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন, গল্প বলতেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের বিদায় করতেন। তাঁর নতুন মন্ত্রিসভায় পুরান মন্ত্রীরাই ছিলেন।

আগেই বিরোধি দলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। জুন মাসে সংবাদপত্রগুলোও সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। আওয়ামী লীগের চাঁই ও মন্ত্রীরা বুঝতে পারলেন যে, সম্ভবত তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে।

এসব মন্ত্রীদের মধ্যে একজন হচেছন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাঁর আহমদ, যিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে সদ্য ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। ১৯৭১ সালে কলকাতায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের তিনি বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন।

খন্দকার ডানপন্থী বলে পরিচিত। সহকর্মী তাজউদ্দীনের ভাগ্য বিপর্যয় থেকে হয়তো তিনি ছবক নিয়েছিলেন।

তাছাড়া আদর্শগত প্রশ্নও ছিল। মুজিব নতুন জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনেক মস্কোপন্থী রাজনীতিবিদকে স্থান দিয়েছিলেন। ফলে আওয়ামী লীগের ভিতরে ও বাইরে প্রাচীনপন্থী মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, নতুন শাসকরা বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করেছেন।সর্বোপরি, স্বাধীনতাঁর পর থেকেই মুজিব সেনাবাহিনীকে আঘাত করে আসছিলেন। শুরু থেকেই ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তি বাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। রক্ষীবাহিনী একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রহরী, গোয়েন্দা পুলিশ ও বিকল্প সেনাবাহিনী ছিল।

১৯৭৩সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীতে ভারতীয় উপদেষ্টা ছিল । এর পরেও রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের দেরাদুনে যেতো। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা ২০ হাজার দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য ছিল আরও অনেক বেশি।

যেভাবেই হোক, রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অসন্তোষই হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ এবং এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আর এক সেনাবাহিনী গঠন করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার যে নীতি মুজিব গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে। (গার্ডিয়ান, লন্ডন, আগস্ট ১৬, ১৯৭৫)

www.pathagar.com

আবশ্যম্ভাবী পতন - কেভিন রেফার্টি

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় গত বছরের মাঝামাঝি সময়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুজিব ভারতে ধান, চাউল ও পাট পাচারের বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ভাগ ভারতে পাচার হয়ে যাচিছলো। অপরদিকে যখন লাখ লাখ বাঙালি না খেয়ে মরেছে, তখন মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচররা চোরাচালানের ব্যবসায় মোটা অংক কামাই করেছে, রাতাঁরাতি ধনী হয়ে উঠেছে।

চোরাকারবার থামাবার জন্য মুজিব সেনাবাহিনীকে তলব করলেন, কিন্তু তাদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে রাজি হলেন না; বরং রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য চাপ দিলেন। চোরাচালানকারী দমনের অভিযান সফল হয়নি। কারণ বেশির ভাগ দোষী ব্যক্তি সরকারের আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু এই অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনী ক্ষমতাঁর কিছুটা আস্বাদ পেয়েছিলো। এতে তাদের অসন্তোষ আরো বেড়ে যায় এবং তাঁরা সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকে। নিজের বিশ্বাসে অটল থাকার মতো সৎ সাহস শেখ মুজিবের কোন দিনই ছিলো না। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের চাপে একক দল পুরাতন পাপীদের ভিড়ে নতুনত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হলো। এদের অনেকেই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজি করে রাতাঁরাতি সম্পদশালী হয়ে উঠেছিলো।

মুজিব তোষামোদপ্রিয় ছিলেন এবং ক্রমেই চাটুকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উঠেছিলেন। এই চাটুকারের দল সযত্নে তাঁর কাছ থেকে অপ্রিয় সত্য গোপন করে রাখতো। সংবাদপত্রের উপর নির্দেশ জারি করা হয়েছিলো মুজিবের বড় ফটো ফলাও করে ঘনঘন ছাপাবার জন্য।

স্বজনপ্রীতির প্রশ্নটি এ বছরে বড় হয়ে ধরা পড়ে। শেখ মুজিবের বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, শেখ তাঁর ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাগিনা শেখ মণিকে গড়ে তুলছেন। প্রতিটি ব্যাপারে তিনি ভাগিনার পরামর্শ নিতেন। দেশব্যাপী সংবাদপত্র নিধন অভিযানের মুখে যে কয়টি পত্রিকা টিকে থাকতে পেরেছে তাঁর একটি হলো শেখ মণির পত্রিকা।

কার্যত মাস কয়েক আগেই অবশ্যম্ভাবী পতনের দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন দিয়ে শক্তিশালী করা হচ্ছে দেখে সেনাবাহিনী শঙ্কিত হয়ে পড়লো। কয়েকটি রাজনৈতিক উপদলও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। কেননা একদিকে তাদের অপসারিত করা হচ্ছে, কিন্তু অপরদিকে তাদের চেয়েও বেশি দূর্নীতিবাজদের অবাধ লুটতরাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে । পদে পদে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে দেখে সাধারণ মুসলমানরাও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে একটা পারিবারিক বাদশাহীর ভিত গড়ে তোলা হচেছ দেখে মন্ত্রিসভার সদস্যরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন।"
(ফিনান্সিয়াল টাইসম, লন্ডন, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫)

www.pathagar.com

কিসে ভুল হলো? - এন্থনি মাসকারেনহাস

"১৯৭২ সালে নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন। দু'টি ঘটনার মাঝখানে ক'বছরে তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে । কিসে ভুল হলো?

মুজিবের ট্রাজেডি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চতর মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ-দুশমনে পর্যবসিত হলেন। তাঁর বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি উপকরণ মিশে আছে।

প্রথমত সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস করতেন। সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ আন্দোলনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে, এমন অনেক সামরিক অফিসারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার সুযোগ তিনি ছাড়তেন না। স্পষ্টতই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরি চালাতেন।

মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে, বেতন ভাতায় ব্যয় বরাদ্দে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো। উভয়ের মধ্যে স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন।

মুজিবের পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ শাসনতন্ত্র ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেওয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবমাননা অনিশ্চয়তাসূচক প্রমাণিত হয়েছে।

'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালিরা ঐতিহ্যগত ভাবেই পশ্চিম-পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি ধর্মানুরাগী। অপরদিকে, বাঙালি মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিত ভাবে সমর্থন করেছিলো বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল।

এই পটভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতাঁর নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর অংশকে আহত করেছিলো। তাই নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাঁর আহমদ বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে রাতাঁরাতি জনসমর্থন লাভ করেছেন। গত শুক্রবার জুমা'র নামাজের জন্য কারফিউ উঠিয়ে দিয়ে মসজিদে এই জনসমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে।

তৃতীয়ত, মুজিব ক্রমেই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আওয়ামী লীগের মোসাহেবরা তাঁর চারদিকে এমন বেষ্টনী গড়ে তুলেছিলো, যার ফলে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর কোন সংযোগ ছিল না।

www.pathagar.com

স্পষ্টতই এই বিচ্ছিন্নতা চরমে পৌঁছল, যখন এ বছর তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র বিলোপ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ও রাশিয়ার একদলীয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। মূলত ব্যক্তিগত শাসন পাকাপোক্ত করার জন্যই তা করা হয়েছিলো। বাংলার মানুষ, যারা তিন পুরুষ ধরে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে, তাঁরা এটা বরদাস্ত করতে পারেনি।

গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যই প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মুজিব তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধনে অবিচলিত ছিলেন। পরিহাস এই যে, এর কোন প্রয়োজন ছিলো না। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায়ও মুজিবের কথায়ই বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে এবং তাঁর কথাই ছিলো দেশের আইন। এ ক্ষমতা ও মর্যাদা বাংলার মানুষ জাতির জনককে সরল মনেই দান করেছিলো। মুজিব যখন এ দান আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তিগত করে নিতে চাইলেন তখনই তাঁরা বিদ্রোহ করলো। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তাঁর উপর আঘাত আসলো। আর কোন পথ ছিলো না, মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখা ভয়ানক বিপজ্জনক হতো।" (সানডে টাইমস, আগস্ট-১৭, ১৯৭৫)

শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে: - অমিত রায়

"বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান নিয়ন্তা হলো শহরের বাসিন্দা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সমর্থনই মুজিবকে নেতা বানিয়েছিলো, ক্ষমতায় বসিয়েছিলো। কিন্তু শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে মুজিব তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন এবং সেদিন থেকেই নিজেকে অতীতের পাতায় তুলে দিয়েছিলেন।

সমস্যার মোকাবিলা না করে মুজিব গুন্ডা-বদমাইশ নিয়ে ২৫হাজার লোকের রক্ষীবাহিনী খাড়া করেছিলেন, যাতে সেনাবাহিনী তাঁর বিদ্রোহ করার সাহস না পায়।

সেনাবহিনীর মধ্যে প্রথম অসন্তোষ দেখা দেয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে যখন দেখতে পেলেন যে, তাদের অধীনস্থ অফিসাররা কয়েক ধাপ ডিঙ্গিয়ে কর্তা হয়ে বসে আছেন। গত বছর এই অসন্তোষ প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে পড়েছিলো। সেনাবাহিনীকে মজুতদার ও চোরাকারবারী খুঁজে বের করার কাজে নিয়োগ করা হলো। কিন্তু তাদের অনুসন্ধানের ফলে যখন স্বয়ং মুজিবের ঘনিষ্ঠজনেরা জড়িত বলে প্রমাণিত হতে লাগলো তখন তাড়াতাড়ি সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে পাঠিয়ে সব কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো।

মুজিবের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হলে গাজী গোলাম মোস্তফা, যিনি 'বাংলাদেশের বড় চোর' বলে কুখ্যাত। দুনিয়ার মানুষ দুঃস্থজনের জন্য রেডক্রসের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাহায্য-সামগ্রী পাঠিয়েছে, আর বাংলাদেশ রেডক্রসের প্রধান হিসেবে গাজী গোলাম মোস্তফা এসব আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ বানিয়েছেন।

মোস্তফাকে রেশন বন্টন কমিটিরও প্রধান বানানো হয়েছিলো। রেশন দোকানের মালিকরা তাঁরই প্রত্যক্ষ মদদ নিয়ে রেশনের খাদ্যসামগ্রী কালোবাজারে বিক্রি করে

www.pathagar.com

দু'হাতে টাকা লুটেছে এবং এই কালো টাকার মোটা অংশ তাঁরা নজরানা হিসেবে মোস্তফার পকেটে তুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট কমিটির প্রধান এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বোর্ডের সদস্য হিসেবেও তিনি খালি জমি ও বাড়ি বিলি-বন্দোবস্তও নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এসবের বিনিময়ে তিনি ঘুষ নিয়েছেন দু'হাতে। উপরন্তু ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির উপরও তিনি কর্তৃত্ব খাটিয়েছেন। মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন আইনের উর্ধ্বে।

ব্যাংক-এ ডাকাতি করে ডাকাতরা পালিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ গুলি ছুঁড়লো। দেখা গেলো, স্বয়ং মুজিবের বড় ছেলে কামাল আহতদের মধ্যে অন্যতম।

বিগত চার বছরে শেখ মুজিবের আপন ভাই শেখ আবু নাসের যতবার ঢাকা থেকে স্বীয় আদি ব্যবসা কেন্দ্র খুলনায় গিয়েছেন তাঁর চেয়ে বেশিবার লন্ডনে এসেছেন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সম্পাদক জিল্লুর রহমান লন্ডনে বেড়াতে আসেন। ফেরার সময় তিনি ১৩টি বড় বড় বাক্স বোঝাই করে সওদা নিয়ে গেছেন।" (সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন-আগস্ট ১৭, ১৯৭৫)

স্বৈরাচারী শাসনই দায়ী - লুই সিমনস্

"বাংলার জ্বলন্ত চুলায় হাত ঢোকাবার জন্য একদিন মিসেস গান্ধীকে অনুশোচনা করতে হবে"- গত বছর এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর এ ভবিষ্যৎবাণী যে এভাবে ফলে যাবে তা হয়তো স্বয়ং ভুট্টোও কল্পনা করেন নি।

হঠাৎ এ গতি পরিবর্তন শুধু মিসেস গান্ধিকে নয়;সৌভিয়েত ইউনিয়নকেও বিচলিত করতে বাধ্য। এতোদিন তাঁরা চীনকে আগলে রাখার প্রয়াসে বাংলাদেশেকে ব্যবহার করে এসেছিলেন।

যদিও এ অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে শেখ মুজিবের স্বৈরাচারী শাসন, তাঁর অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতাঁর কথা তুলে ধরা হয়েছে, তবু প্রথম থেকেই দিল্লি-মস্কোর সাথে বেশি মাখামাখির জন্য জনগণ মুজিবকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলো।

অতীতে যেমন দুঃখ-দুর্দশার জন্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পশ্চিম-পাকিস্তানকে দায়ী করেছে, তেমনি বাংলাদেশ সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থনৈতিক শোষণ চালু করার জন্য ভারত সরকার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে অভিযুক্ত করছে। পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে উদ্ভূত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে ঘাত-প্রতিঘাতের জন্ম দিয়েছে , তাঁরই ফল হচ্ছে শেখ মুজিবের পতন ও মৃত্যু।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংঘর্ষ মিসেস গান্ধিকে তাঁর বিবদমান প্রতিবেশীকে ঘায়েল করার এক মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছিল। সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধ লাগার আগে নয় মাস বাঙালি গেরিলারা সক্রিয় ছিলো বটে; কিন্তু ভারতই তাদের অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছে।"-(ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫)

www.pathagar.com

শেখের ট্রাজেডি-হার্ভে স্টকউইন

বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায়ই যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবার্তা বাংলাদেশের উপর আসে, শেখ মুজিব ছিলেন তাঁরই মানবীয় রূপ। রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর দীপ্ত পদচারণার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও আবেগের উচ্ছ্বাসে সবকিছু তলিয়ে গেলো। আজ মুজিব মঞ্চ থেকে চিরকালের মতো সরে গেছেন, কিন্তু দেশকে রেখে গেছেন রিক্ত, নিঃসহায় করে। তাঁর আমলে কি ক্ষতি সাধিত হয়েছে তাঁর চূড়ান্ত হিসাব কেবল এখনি শুরু হতে পারে।

মূলত শেখ ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি ঘটনাবলির পশ্চাতে এগিয়ে গেছেন। বিক্ষোভকারীর সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। বিক্ষোভকারীর ভূমিকা থেকে নিজেকে কখনো তিনি বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি এবং পরিণতিতে বিক্ষোভকারীর মৃত্যুকেই তিনি বরণ করে নিয়েছেন।

শেখের মধ্যে তাঁর গুরু সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সূক্ষ্মতা বা চাতুর্য ছিলো না। ১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্রের কথা তুলেছিলেন। ২৪বছর পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হলো। কিন্তু সারা জীবন নেতিবাচক রাজনীতি করার ফলে নতুন জাতিকে বাস্তব কিছু দেবার সামর্থ্য তাঁর হলো না। এ রায় কর্কশ শোনাবে। হয়তো আংশিকভাবে এই কঠোর মন্তব্যের উদ্ভব হয় ১৯৫৭ সালে যখন এক কাঁদানে গ্যাসসিক্ত পরিবেশে মুজিবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তিনি তখন পূর্ব-পাকিস্তান মন্ত্রিসভার সদস্য (আমার যদি ঠিক স্মরণ থাকে, তিনি তখন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী ছিলেন) আওয়ামী লীগ মোকাবিলা করার জন্য তখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি(ন্যাপ) গঠন করা হচ্ছিলো। সিন্ধু প্রদেশ থেকে আসলেন জি.এম. সাঈদ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আসলেন খান আব্দুল গফফার খান। ন্যাপের অপর একজন প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা ভাসানী। ভাসানীকে শেখ মুজিব বরাবরই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখেছেন।কেননা ভাসানীই ছিলেন তাঁর একমাত্র সমতুল্য গণবক্তা।

সকলেরই জানা ছিলো যে, ঢাকার ন্যাপের এই উদ্বোধনী সভা পন্ড করতে শেখ মুজিব মনস্থ করেছেন এবং ঠিকই, যেই মাত্র ন্যাপের উৎসাহী সমর্থকরা পল্টন ময়দানে জমায়েত হতে লাগলো, অমনি শেখের ভাড়াটিয়া গুন্ডারা গোলযোগ সৃষ্টি করতে শুরু করলো। মুহূর্তের মধ্যেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করে সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতে লাগলো।

১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ শেখকে জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতাঁর শীর্ষে পৌঁছে দিলো। কিন্তু যে আশা-আকাঙ্খা তিনি উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তা কার্যত পূরণ করার সামর্থ্য তাঁর ছিলো না। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন, তাঁরপর প্রধান মন্ত্রী এবং এ বছরের জানুয়ারি মাসে আবার প্রেসিডেন্ট হলেন। শেখ ক্ষমতা ও খেতাব নিয়ে খেলা করেছেন, বাংলাদেশের আর্থিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য আদৌ কিছু করেননি। বাহ্যত

www.pathagar.com

সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর কর্তৃত্ব ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিলো।

শেখ কেন কিছুই করতে পারলো না, তাঁর কয়েকটি কারণ রয়েছে প্রথমত, ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর অত্যধিক নিজস্ব মতবাদ ছিলো। দ্বিতীয়ত, তাঁর মধ্যে একটা গভীর হীনমন্যতাঁর ভাব (ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স) ছিলো, যা আংশিকভাবে তাঁর শিক্ষার অভাববোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তৃতীয়ত, শেখ কখনোই বাংলাদেশের সুশিক্ষিত তর্কপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের কিংবা বিজ্ঞ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। এর ফলে শেখ ও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ব্যবধান বিদ্যমান ছিলো। কোন পক্ষই তা দূর করার চেষ্টা করেন নি। বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন ছিলো শেখের, যেহেতু তাঁর বিপুল জনসমর্থন। আর শেখেরও প্রয়োজন ছিলো বুদ্ধিজীবীদের, কেননা একটা দেশের সমূহ সমস্যাবলী মোকাবিলা করার সাধ্য তাঁর ছিলো না। (ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিয়ু, আগস্ট-২৯, ১৯৭৫ ইং)

বিদেশী বিখ্যাত কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদক ও কলামিস্টদের লেখা থেকে শেখ মুজিবের পতন সম্পর্কে তাদের মতামত ও মন্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, মুজিব হত্যা মোটেই অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক ছিলো না। এ করুণ পরিণতির জন্য শেখ মুজিব স্বয়ং দায়ী। সামরিক বিপ্লব ছাড়া শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির আর কোন পথই ছিলো না। ঐসব লেখা থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর ঐ বিপ্লবকে একটি সফল বিপ্লব হিসেবেই গণ্য করেন। সর্বস্তরের জনগণ ঐ পট-পরিবর্তনকে তাদের জন্য কল্যাণকর হিসেবেই স্বাগত জানিয়েছেন।

সৌদি আরব ও চীনের স্বীকৃতি প্রদান

খন্দকার মুশতাঁর আহমদ প্রেসিডেন্ট হবার পর বিশ্বের সব রাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। সৌদি আরব ও চীন '৭৫এর পট পরিবর্তনের আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই। তাঁরাও বাংলাদেশ ও খন্দকার মুশতাকের সরকারকে স্বীকৃতি দিল।

নতুন সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করল তা মেজর ডালিমের বই থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে: 'রেডক্রস এর চেয়ারম্যান পদ থেকে কুখ্যাত গাজী গোলাম মোস্তফাকে অপসারিত করে বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকীকে তাঁর পদে নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোশতাঁর এক অধ্যাদেশ জারি করে একদলীয় বাকশালী শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করে দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। মুজিব কর্তৃক দেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করে গভর্নর নিয়োগের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। দেশের ১৯টি জেলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জেলা প্রশাসকের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেয়া হয়। দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি, মুজিব সরকারের ৬জন মন্ত্রী, ১০জন সংসদ সদস্য, ৪জন আমলা এবং ১২জন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতাঁর করা হয়। তাদের বিচারের জন্য দুটো

বিশেষ আদালত গঠিত হয়। সামরিক বাহিনীর ৩৬জন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। রাজবন্দীদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বিলুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সহযোগিতাঁর আবেদন জানানো হয়। সরকারি আদেশে মশিউর রহমান এবং অলি আহাদকে বিনা শর্তে মুক্তি দান করা হয় ২৫আগস্টে। একই দিনে জেনারেল ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির নয়া সামরিক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে জয়েন্ট চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে এবং মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর স্থানে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আর্মি চীফ অফ স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। বিমান বাহিনীর চীফ অফ স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত হন এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব।

দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকা দুইটি মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। ১৬ আগস্ট মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী নয়া সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এক বার্তা পাঠান। দেশের প্রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, নেতা এবং গণসংগঠনের সমর্থনও লাভ করতে সমর্থ হয় নতুন সরকার। তাঁরা সবাই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে তাদের সাহসী পদক্ষেপের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ৩রা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মোশতাঁর ঘোষণা করেন, '১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট হতে দেশে বহুদলীয় অবাধ রাজনীতি পুনরায় চালু করা হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত করা হবে।'

এভাবেই উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো নেবার ফলে দেশের সার্বিক অবস্থা অতি অল্প সময়ে শুধুমাত্র স্বাভাবিকই হয়ে উঠেছিল তাই নয়; দেশের আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং কলকারখানার উৎপাদনেও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। দেশে চুরি-ডাকাতি ও চোরাচালানের মাত্রা কমে যায় বহুলাংশে। দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে পূর্ণমাত্রায়।" (যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি- লেঃ কর্নেল (অবঃ) শরিফুল হক ডালিম বীর উত্তম, পৃ: নং-৪৯৫)

নতুন সমস্যা সৃষ্টি

উচ্চভিলাসী আর্মি অফিসারদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হল। কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদসহ সামরিক অভ্যুত্থানে প্রধান ভূমিকা পালনকারী অফিসারগণ প্রেসিডেন্ট ভবনে (বঙ্গভবন) অবস্থান নেন। তাঁরা সরকার পরিচালনায় বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন এবং বেসামরিক সরকার ও সামরিক অফিসারদের মধ্যে লিয়াঁজো করতেন। তাঁরা অভ্যুত্থানের সময় যে ট্যাংকগুলো সেনানিবাস থেকে বের করে এনেছিলেন, সেগুলো নিরাপত্তার খাতিরে বঙ্গভবনে রেখে দেন।

CGS (চীফ অব জেনারেল স্টাফ) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও ৪৬পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল, ফারুক রশিদ গংদের উপর খুবই ক্ষেপে যান, কারণ একেতো তাঁর উর্ধ্বতন অফিসারদের অলক্ষ্যে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন,

www.pathagar.com

অন্যদিকে তাঁরা খন্দকার মোশতাকের সরকার পরিচালনায় পরামর্শদাতাঁর ভূমিকা পালন করছেন। এছাড়া বেসামরিক প্রশাসন ও উর্ধ্ববতন আর্মি অফিসারদের মধ্যে লিয়াজোর দায়িত্ব পালন করেন কর্নেল রশিদ, খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিল। ফারুক রশিদ গংদের সেনানিবাসে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের সহায়তা না পাওয়ায় তাদেরকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না। ফলে তাঁরা দুজন খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। এবার তাঁরা আর্মি চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে চাপ দিলেন। জিয়াউর রহমান যদিও সেনাপ্রধান হওয়ায় খুশি হন কিন্তু তিনি সরকারের উপর নাখোশ ছিলেন। কারণ প্রেসিডেন্ট মোশতাঁর জেনারেল ওসমানীকে সামরিক উপদেষ্টা এবং মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে জয়েন্ট চীপ অব স্টাফ নিযুক্ত করে তাদেরকে জিয়াউর রহমানের উপর মর্যাদা দান করেন। খন্দকার মোশতাঁর সামরিক ব্যাপারে জিয়াউর রহমানের সাথে পরামর্শ না করে ওসমানী ও খলিলুর রহমানের সাথে পরামর্শ করে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।খন্দকার মোশতাঁর ও জিয়াউর রহমানের সাথে দেখাসাক্ষাৎ আলাপআলোচনার সুযোগ খুব কমই হত। কারণ জিয়াউর রহমানের অফিস থেকে ফাইল বগল দাবা করে প্রেসিডেন্ট দফতরে নিয়ে আসতেন কর্নেল রশিদ আবার তা ফিরতও নিয়ে যেতেন তিনি। এছাড়া নানা কারণে খন্দকার মুশতাঁর, উসমানী ও খলিলুর রহমানের উপর জিয়াউর রহমান ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিলকে ব্যবহার করে কিছু একটা করার চিন্তা করছিলেন।

খালেদ মোশাররফের স্কন্ধে উচ্চাভিলাষ ভর করল

খালেদ মোশাররফ প্রেসিডেন্টের অসহযোগিতাঁর কারণে আর্মির চেইন অব কমান্ড ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন না। এ ব্যাপারে তিনি জিয়াউর রহমানের সহানুভূতি পেলেন কিন্তু কাজ হল না। তিনি ভাবলেন জিয়াউর রহমান দ্বারা কিছু হবে না। তিনি আরো অবগত হলেন জিয়াউর রহমানের উপর মোশতাঁর, ওসমানী ও খলিলুর রহমান নাখোশ। তিনি শাফায়াত জামিল ও আরো কিছু বাছাই করা উর্ধ্বতন আর্মি অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়া অভ্যুত্থান কামিয়াব করা যাবে না ভেবে তিনি তাঁর ভাই আওয়ামী কৃষকলীগ প্রধান রাশেদ মোশাররফের মাধ্যমে জেলে আটক আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী ও আব্দুস সামাদ আযাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) এর সাথে তাঁর যোগাযোগ হল। 'র' এর মাধ্যমে তিনি ভারত ও রুশ সরকারের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালান।

জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে বঙ্গভবনে খালেদ মোশাররফের তৎপরতাঁর খবর পৌঁছল। সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে এর প্রতিকার চাওয়া হল। জিয়াউর রহমান এ ব্যাপারে গড়িমসি করলেন কারণ তাঁর মাথায় অন্য পরিকল্পনা ছিল। এদিকে

www.pathagar.com

জিয়াউর রহমান গোপনে সেনাপরিষদ ও অবসর প্রাপ্ত কর্নেল তাহেরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে জিয়াউর রহমান মাওলানা ভাসানী ও চীন পন্থী 'ন্যাপের' সমর্থক ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালে সেনাবাহিনীর কিছু তরুণ, উদ্যমী, চৌকষ, সমমনা মুক্তিযোদ্ধা অফিসার গোপনে 'সেনাপরিষদ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। তাদের মধ্যে গোপনে স্টাডি সার্কেল হত। স্টাডি সার্কেলে সরকারের নীতি ও কার্যক্রম, দেশে কি হচ্ছে, কি হওয়া উচিত, কি হওয়া উচিত নয়, জাতীয় সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হত। শেখ মুজিবুর রহমান যেসব সেনা অফিসারদেরকে চাকরিচ্যুত করেছিলেন, তাদের অনেকে সেনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। সেনা পরিষদ বেসামরিক আমলা, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বিভিন্ন সূত্রে গোপনে যোগাযোগ রাখত। '৭৫ এ দেশের পট পরিবর্তনে এ পরিষদ বিশেষ ভূমিকা রাখে। কর্নেল তাহের একজন মুক্তিযোদ্ধা, নিষ্ঠাবান সৈনিক ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি বাস্তব চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে এক পা হারানোর কারণে তাঁর প্রতি সবার সহানুভূতি ছিল। মুজিব আমলে তাঁকে অবসর প্রদান করা হয়। জিয়াউর রহমানের সাথে ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে সুবাদে তিনি সেনানিবাসে যেতেন এবং অফিসার ও সৈন্যদের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তিনি বাম চিন্তাধারার অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তুলেন। অন্যদিকে তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সামরিক Wing" NZ বাহিনীর' পরিচালক ছিলেন। কর্নেল তাহের ও জাসদ বিপ্লব ঘটিয়ে দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েম করার লক্ষ্যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ষড়যন্ত্রে খালেদ মোশাররফ এগিয়ে যান। তিনি ছলে বলে কৌশলে ঢাকায় অবস্থানরত অধিকাংশ আর্মি অফিসারদেরকে তাঁর দলে ভিড়িয়ে নেন। '৭৫ এর ২ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিল পাল্টা অভ্যুত্থানের গুটি চালান। বঙ্গভবনে ডিউটিরত প্রথম শিফটের সৈন্যরা চলে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় শিফটের সৈন্যরা ডিউটিতে আসল না। সেক্রেটারিয়েট সৈন্যদের দ্বারা ঘেরাও করা হল। রেডিও, টিভি স্টেশনে সৈন্য পাঠিয়ে সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হল।

সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দী করা হল। খালেদ মোশাররফের আদেশে ব্রিগেডিয়ার রউফ জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে জোরপূর্বক পদত্যাগপত্রে সই করিয়ে নিলেন।পরবর্তী পদক্ষেপ হল শক্তি প্রয়োগে বঙ্গভবন দখল। বঙ্গভবনে অবস্থানরত সবাই অবস্থা বেগতিক দেখে বিনা রক্তপাতে ফায়সালা করার জন্য আলোচনার প্রস্তাব দিলেন। বঙ্গভবন ও খালেদ মোশাররফ চক্রের সাথে আলোচনায় লিয়াঁজো করলেন মেজর ডালিম ও মেজর নূর। সিদ্ধান্ত হল:

১. খন্দকার মোশতাঁর প্রধান বিচারপতি সায়েমের হাতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নিবেন।
২. তিন বাহিনীর প্রধান বদলাতে হবে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেলে উন্নীত করে সেনা প্রধান করতে হবে।

www.pathagar.com

৩. সেনা বাহিনীতে Chain of Command পুন:স্থাপন করতে হবে। ১৫ আগস্টের বিপ্লবের সাথে জড়িত ফারুক, রশীদ সহ অন্যান্য অফিসারগণ দেশের বাইরে চলে যাবেন। তাদেরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. সংবিধান বাতিল করে সামরিক আইন জারী করতে হবে। ভবিষ্যৎ-এ বহু দলীয় গণতন্ত্র চালু করে নির্বাচনের মাধ্যমে গণপরিষদ গঠন করে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। এর আগ পর্যন্ত সামরিক আইন চালু থাকবে।

(তথ্য সূত্র: যা জেনেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি-মেজর ডালিম।)

এদিকে ৩ নভেম্বর রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আওয়ামী লীগের ৪ শীর্ষ নেতা তাজ উদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলী তাদের কক্ষে নিহত হন। ৪তারিখ খালেদ মোশাররফ দলবলসহ বঙ্গ ভবনে উপস্থিত হন। তাঁকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাপ্রধান করা হয়। তিনি বিদায়ী খন্দকার মোশতাঁর সরকারে কেবিনেট সদস্যদের সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে দেনদরবার করেন। অন্যদিকে নতুন সরকারের আইনগত ভিত্তি প্রদান এবং ভবিষ্যৎ সরকারের রূপরেখা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে আওয়ামী মহল ও সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা উল্লাস প্রকাশ করেন। তাঁরা ৪ নভেম্বর বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে মিছিল করে ৩২নং ধানমন্ডি শেখ মুজিবের বাড়িতে উপস্থিত হন এবং তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ মিছিলে খালেদ মোশাররফের ভাই আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদ মোশাররফ ও তাদের মা অংশ গ্রহণ করেন। মিছিলের ছবি ও খবর পরদিন জাতীয় পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়। ফলে সর্বত্র এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আওয়ামী বাকশালী চক্র ও তাদের দোসররা এ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। দেশ আবার আধিপত্যবাদী ভারত ও সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গেল। এতে জনসাধারণ ও সাধারণ সিপাহীদের মধ্যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল।

সিপাহী জনতাঁর বিপ্লব

জিয়াউর রহমান সাধারণ সিপাহীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। সিপাহীদের প্রায় সবাই আওয়ামী বাকশাল বিরোধি । আওয়ামী আমলে তাদের কি ভোগান্তি হয়েছিল তা তাদের স্মরণে ঝলমল করছিল। "জনপ্রিয় সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বন্দী করে আওয়ামী বাকশালীরা আবার ক্ষমতায় আসছে; যে কোন মুহূর্তে ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করবে।"- এ আশংঙ্কায় সিপাহীরা বিদ্রোহ করল। এ দিকে কর্নেল তাহেরের 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' ৫ তারিখ মাগরিবের পর থেকে সেনা ছাউনীতে মাইক যোগে প্রচার শুরু করল-'দেশ ভারতের দখলে গেল, ভারতীয় সৈন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।' তাঁরা সিপাহীদের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করল। প্রচারপত্রের উপসংহার ছিল-'খালেদ মোশাররফকে হঠাতে হবে, অফিসারদের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে হবে। সৈনিক সৈনিক

www.pathagar.com

ভাই ভাই অফিসারদের রক্ত চাই।' কর্নেল তাহেরের প্লান অনুযায়ী ৬ তারিখ দিবাগত রাত ঠিক বারটায় একটি নির্ধারিত সংকেত বাজানোর সাথে সাথে সিপাহীরা সামরিক অস্ত্রগার ভেঙে অস্ত্র লুট করল। তাঁরা চতুর্দিকে এক সাথে ফায়ারিং আরম্ভ করল। তাঁরা জিয়াউর রহমানকে বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করল। চতুর্দিকে স্লোগান উঠল-'জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ।' উম্মত্ত সৈন্যরা কর্নেল তাহেরের ইঙ্গিতে অফিসার নিধন শুরু করল।৭তারিখ সকাল ৭ টার সময় একজন তরুণ লেফটেনেন্ট এবং আরো কিছু সিপাহী একটি আর্মি ট্রাক সহ এসে জিয়াউর রহমানকে বলল –"Sir I have come to present you the dead body of Khaled Musarraf, Col.Huda & Haidar''দেখা গেল খালেদ মোশাররফ লাশ হয়ে ট্রাকে পড়ে আছেন। জিয়ার পরামর্শে কর্ণেল হামিদ লাশ গুলো CMH মর্গে পাঠিয়ে দিলেন। সাথে সাথে খালেদ মোশাররফের উত্থান কাহিনী পতন উপাখ্যানে পরিণত হল।

খালেদ মোশাররফ কিভাবে নিহত হলেন

ঐ পিরিয়ডে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন কমান্ডার ছিলেন কর্নেল হামিদ। তিনি 'তিন সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা প্রথমে নিরাপদেই তাঁর বিশ্বস্ত ইউনিটে আশ্রয় নেন। তখনো ওখানে বিপ্লবের কোন খবর হয়নি। কমান্ডিং অফিসার ছিলেন কর্নেল নওয়াজিশ। তাকে দেওয়া হয় খালেদের আগমনের সংবাদ। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে টু-ফিল্ডে সদ্যমুক্ত জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তাঁর ইউনিটে খালেদ মোশাররফের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেন। তখন ভোর প্রায় চারটা। জিয়ার সাথে ফোনে তাঁর কিছু আলাপ হয়। এরপর তিনি মেজর জলিলকে ফোন দিতে বলেন। জিয়ার সাথে মেজর জলিলের কিছু কথা হয়। তাদের মধ্যে কি কথা হয়, সঠিক কিছু বলা মুশকিল। তবে কর্নেল আমিনুল হক বলেছেন, তিনি ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং জিয়াকে বলতে শুনেছেন, যেন খালেদকে প্রাণে মারা না হয়। ঐসময় রুমে আমিও উপস্থিত ছিলাম। তবে টেলিফোনে কার সাথে তাঁর কথাবার্তা হচ্ছিলো, তা অনুধাবন করতে পারিনি।

' নামে একটি বই লিখেন। এ বইতে এ পিরিয়ডের ঘটনা সমূহের বিশদ বিবরণ আছে।ঐ বই থেকে এ সংক্রান্ত কিছু উদ্ধৃতি নিচে দেওয়া হল:

"৬ তারিখ রাত ১২টায় সিপাহী বিপ্লবের খবর পেয়ে জেনারেল খালেদ মোশাররফ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাইভেট কার নিয়ে বঙ্গভবন থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান। তিনি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলো কর্নেল হুদা ও হায়দার। তাঁরা দু'জন ঐদিনই ঢাকার বাইরে থেকে এসে খালেদের সাথে যোগ দেন।

খালেদ প্রথমে রক্ষীবাহিনীর প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের বাসায় যান। সেখানে তাঁর সাথে পরামর্শ করেন। নুরুজ্জামান তাকে খাকি ড্রেস পাল্টিয়ে নিতে অনুরোধ করে। সে তাঁর নিজের একটি প্যান্ট ও বুশসার্ট খালেদকে পরতে দেয়। ৪র্থ বেঙ্গলে সর্বশেষ ফোন করলে ডিউটি অফিসার লে.কামরুল ফোন ধরে। সে তাকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে।

এবার খালেদ বুঝতে পারেন অবস্থা খুবই নাজুক। তিনি অবস্থান পরিবর্তন করে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আশ্রয় গ্রহণ করতে যান। ১০ম বেঙ্গলকে বগুড়া থেকে তিনিই আনিয়েছিলেন তাঁর নিরাপত্তার জন্য।

যা হোক, ভোরবেলা দেখতে দেখতে সিপাহী বিদ্রোহের প্রবল ঢেউ ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে লাগতে শুরু করে। সিপাহীরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। পরিস্থিতি কর্ণেল নওয়াজিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাঁরা খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সহযোগীদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সিপাহীরা তাদের টেনে হিঁচড়ে বের করে। ইউনিটের অফিসার মেজর আসাদের বিবৃতি অনুসারে কর্নেল হুদা হায়দারকে তাঁর চোখের সামনে মেস থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে প্রকাশ্যে সৈনিকরা গুলি করে হত্যা করে। বাকি দু'জন উপরে ছিলেন তাদের কিভাবে মারা হয় সে দেখতে পায়নি। তবে জানা যায় হায়দার, খালেদ ও হুদা অফিসার মেসে বসে সকালের নাস্তা করছিলেন। কর্নেল হুদা ভীত হয়ে পড়লেও খালেদ ছিলেন ধীরস্থির, শান্ত। হুদাকে তিনি অস্থির হতে মানা করলেন এবং সান্ত্বনা দিলেন। জানা গেছে মেজর জলিল কয়েকজন উত্তেজিত সৈনিক নিয়ে মেসের ভেতরে প্রবেশ করে। তাঁর সাথে একজন বিপ্লবী হাবিলদারও ছিলো। সে চিৎকার দিয়ে জেনারেল খালেদকে বললো, 'আমরা তোমার বিচার চাই।' খালেদ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে তোমরা আমার বিচার করো। আমাকে জিয়ার কাছে নিয়ে চলো।'

স্বয়ংক্রিয় রাইফেল বাগিয়ে হাবিলদার চিৎকার করে বললো, 'আমরা এখানেই তোমার বিচার করবো।'খালেদ ধীরস্থির, বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা আমার বিচার করো।' খালেদ দু'হাত দিয়ে তাঁর মুখ ঢাকলেন।

ট্যা-র-র-র-র! একটি ব্রাশ ফায়ার! আগুনের ঝলক বেরিয়ে এলো বন্দুকের নল থেকে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী খালেদ মোশাররফ। সাঙ্গ হলো বিচার। শেষ হলো তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনেতিহাস।" (তিন সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা: পৃষ্ঠা নং-১৩৬-১৩৭)

সিপাহী জনতাঁর বিজয় মিছিল

খালেদ মোশাররফের পতন এবং জিয়াউর রহমানের ফের উথানের পর সিপাহী জনতা আনন্দে ফেটে পড়ল। ৭ নভেম্বর ছিল জুমাবার। ঐদিন ফজরের আজানের পর সিপাহীরা বিজয় উল্লাসে সেনাবাহিনীর ট্যাংক, জীপ, ট্রাক ইত্যাদি যানবাহন নিয়ে সেনানিবাস থেকে ঢাকা মহানগরীর দিকে অগ্রসর হল। তাদের মুখে শ্লোগান ছিল-"নারায়ে তাঁরবীর আল্লাহু আকবর, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ।" শ্লোগান শুনে আমজনতা ঘর থেকে বের হয়ে আসল। তাঁরা হাততালি দিয়ে সিপাহীদেরকে মোবারকবাদ জানাল। সিপাহীরা জনতাকে কাছে টেনে এনে মিছিলে শরীক করল। এবার আরো ১টি স্লোগান যোগ হল 'সিপাহী জনতা ভাই ভাই।' ঐদিনের একজন প্রত্যক্ষদর্শী

www.pathagar.com

জনাব আব্দুল মান্নান। তিনি বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট। এছাড়া তিনি ইতিহাস গবেষক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা, ঐ সময় তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অনার্সের ছাত্র ছিলেন। তাঁর সাথে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের এ সংক্রান্ত একটি ইন্টারভিউ হয়। এ সাক্ষাতকারে জনাব আব্দুল মান্নান ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতাঁর বিজয় উল্লাসের যে বর্ণনা দেন তা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

"৬ নভেম্বর দিবাগত শেষ রাতে গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলো। বাংলাবাজার নিজেদের বাড়িতেই ছিলাম। রেডিওতে জিয়ার কণ্ঠ শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। বের হয়ে দেখলাম রাস্তায় আরও লোক। এগুতে এগুতে বাহাদুর শাহ পার্কে এসে দেখি আর্মির একটা ট্রাকে সশস্ত্র সৈনিকরা শ্লোগান দিচ্ছে-নারায়ে তাঁরবীর আল্লাহু আকবার, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, সিপাহী জনতা ভাই ভাই।

কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, মাইক হতে একজন সৈনিক জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার আনন্দ প্রকাশ করে সিপাহীদের বিজয় ঘোষণা করছে। কথাগুলোতে উচ্ছাস থাকলেও আকর্ষণীয় ভাষায় বলতে পারছিলো না। ওরা তো আর বক্তা নয়! চারপাশে মানুষের ভিড় বেড়েই চলছে। মাইক আছে, বিরাট জমায়েত উপস্থিত। এ সময়ের উপযোগী বিপ্লবী ভাষা আমার মুখ থেকে উপচে পড়তে চায়। আর থাকতে পারলাম না। লাফ দিয়ে ট্রাকে উঠেই সৈনিকের হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলাম। উপস্থিত জনতা আমার প্রতিটি কথাকে হাততালি দিয়ে সমর্থন করতে লাগলো। স্লোগানে শরিক হয়ে বিশাল জনতা নেচে উঠলো। এতো লোক সমবেত হলো যে, মাইকের আওয়াজ হয়তো পৌঁছতে পারছে না, কিন্তু শ্লোগানে সবাই শরীক ।পনেরো বিশ মিনিট প্রাণ ভরে বক্তৃতা করে ট্রাক থেকে নেমে আসার উপক্রম করতেই সৈনিকরা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, "আপনাকে যেতে দেবো না, আমাদের সাথেই শহরে জনতাঁর সামনে বক্তৃতা করতে হবে। ট্রাক পুরোনো শহর ঘুরে দুপুর পর্যন্ত গুলিস্তান এলাকায় পৌঁছা পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫টি সমাবেশে বক্তৃতা করে জুমুআর নামাযের জন্য বাইতুল মুকাররমে চলে গেলাম। জুমুআর নামাযে এতো লোক ছিলো যে, নামাযের পর বিশাল মিছিলের আকার ধারণ করলো। মিছিলে নিজামী ভাই ও কামারুজ্জামান ভাইকে দেখলাম।" (জীবনে যা দেখলাম- ৪র্থ খণ্ড, অধ্যাপক গোলাম আযম,পৃ: ৩০১-৩০২)

উল্লেখ্য এ মিছিলের । মিছিলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বহু মাইকের ব্যবস্থা করা হয়। মিছিল থেকে একটি প্রচারপত্র ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়।প্রচারপত্রের শিরোনাম ছিল-" ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়।" এ প্রচারপত্রটি পরদিন জাতীয় পত্রিকা 'দৈনিক ইত্তেফাকে' খবর হিসেবে প্রকাশিত হয়। জানা যায় এ প্রচারপত্রটি ড্রাফট করেছিলেন অধ্যাপক আখতাঁর ফারুক।

কর্নেল তাহেরের ফাঁসি

৭ নভেম্বর সিপাহী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সেনাবাহিনী জিয়াউর রহমানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। জনগণ আশ্বস্ত হয়। জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে

www.pathagar.com

এবং সিপাহী বিপ্লব ঘটাতে কর্নেল তাহের বিরাট ভূমিকা রাখেন। এবার তিনি জিয়াউর রহমানকে নিয়ন্ত্রণ করে দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর কার্যক্রম শুরু করেন। হুশিয়ার জিয়া তাহেরের পাতানো ফাঁদে পা দিলেন না। ফলে জিয়াউর রহমান ও তাহেরের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল। তাহের অন্যপথ ধরলেন। তিনি সিপাহীদেরকে উসকানী দিয়ে বেশ কয়েকজন অফিসার হত্যা করালেন। জাসদের সামরিক Wing গণবাহিনীকে সশস্ত্র করে সেনানিবাসে প্রবেশ করিয়ে আরো একটি অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করলেন। জিয়াউর রহমান তাহেরের ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা আগে থেকে টের পেয়ে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে তাহেরকে পিছু হটতে হয়। কিন্তু তাহের দমবার পাত্র নন। তিনি পুনরায় ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেন। ২৮নভেম্বর অভ্যুত্থানের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়। হুশিয়ার জিয়ার কাছে ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে। ২৩নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউজ টিউটরের কোয়ার্টার থেকে গোপন বৈঠকরত অবস্থায় তাহের ধরা পড়েন। সামরিক আদালতে তাঁর বিচার করা হয়। বিচারে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। '৭৬ সালের ২১ জুলাই ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি প্রদানের মাধ্যমে তাঁর জীবনাবসান হয়।

জিয়াউর রহমান নিজের অবস্থান সুসংহত করলেন

খালেদ মোশাররফের পতনের এবং তাহের কারারুদ্ধ হবার পর জিয়াউর রহমান তাঁর নিজের অবস্থান সুসংহত করলেন । বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন। সংবিধান বাতিল না করে স্থগিত করা হল। জিয়া ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে দেশ পরিচালনা আরম্ভ করলেন। আরো কিছু দিন পর নিজের অবস্থানকে আরো নিরাপদ করে '৭৭ সালের ২১এপ্রিল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি সায়েমকে অপসারণ করে নিজে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। তিনি ২৩ এপ্রিল এক সামরিক ফরমান (Proclamation)-এর মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের ৫ম সংশোধনী ঘোষণা করেন। ৫ম সংশোধনীর কারণে ১৯৭২ সালের সংবিধানে নিম্নোক্ত মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়:

১. সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সংযোজন করা হয়।'৭২ সংবিধানে কোথাও আল্লাহর নাম ছিল না।

২. রাষ্ট্র পরিচালনায় মূলনীতি শিরোনামে সংবিধানের ৮(১) উপধারায় 'ধর্ম নিরপেক্ষবাদ' কথাটি বাদ দিয়ে এর স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' কথাটি সংযোজন করা হয়।

৩ বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ স্থান পায়।

৪. সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা হিসেবে লেখা হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার।

৫. ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করে যে ধারাটি ছিল তা বিলুপ্ত করা হয়।

৬. শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সব রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষণা করে কেবলমাত্র একটি দল 'বাকশাল' এর বৈধতা দান করেছিলেন। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ৪র্থ সংশোধনী বিলুপ্ত করা হয়।

www.pathagar.com

৫ম সংশোধনী জারী করার পর জিয়াউর রহমান ৩০মে রেফারেন্ডামের ব্যবস্থা করেন। রেফারেন্ডামের বিষয়ছিল :

১. প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমানের উপর জনগণের আস্থা আছে কি না।

২। সামরিক প্রশাসকের মাধ্যমে যত ফরমান (Proclamation) জারী করা হয়েছে জনগণ তা বৈধ মনে করে কি না।

গণভোটে জিয়াউর রহমান বিপুল হ্যাঁ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিজের আইনগত বৈধতা লাভ করলেন। এরই সংগে সামরিক প্রশাসকের সকল ফরমান আইন সিদ্ধ হয়ে গেল।

আইডিএল (IDL) গঠন

১৯৭৬ সালের ৪আগস্ট সামরিক আইন বলে PPR (Political parties Regulation) নামে একটি বিধি জারী করা হয়। এ বিধি বলে কতেক শর্ত আরোপ করে রাজনৈতিক দল গঠন করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করতে বলা হয়। PPR (Political Parties Regulation)এর বিধি মোতাবেক পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলো পুনরুজ্জীবিত হতে থাকে। ইসলাম পন্থীদলগুলোর নেতৃবৃন্দ '৭২ ও '৭৩ সালে জেলে আটক অবস্থায় ওয়াদা করেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ-এ সুযোগ সৃষ্টি হলে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে একটি দল গঠন করবেন। পূর্বের সিদ্ধান্ত তোয়াক্কা না করে সবুর খানের নেতৃত্বে 'মুসলিম লীগ' একাই পুনরুজ্জীবিত হয়ে গেল। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী, নেয়ামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পিডিপি ইসলামিক পার্টি, ইমারত পার্টি ও বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি, এ সাতটি দল মিলে সম্মিলিত ভাবে আইডিএল (ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ) নামে ১৯৭৬ সালের ২৪ আগস্ট একটি দল গঠন করা হল। দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন নেযামে ইসলামের মাওলানা সিদ্দিক আহমদ আর সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হলেন পিডিপির এডভোকেট শফিকুর রহমান । জামায়াতের মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এবং মাওলানা আব্দুস সুবহান ও এডভোকেট ছাদ আহমদকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়। আইডিএল গঠিত হল ঠিকই কিন্তু চেয়ারম্যান কিংবা সেক্রেটারী জেনারেলের পক্ষ থেকে সংগঠন সম্প্রসারণের কোন উদ্যোগ বা তৎপরতা পরিলক্ষিত হল না। ফলে সংগঠন স্থবির হয়ে পড়ল। এ ব্যাপারে জামায়াতের লোকজন বারবার চাপ সৃষ্টি করার পরও কোন লাভ হল না। ফলে হতাশ হয়ে প্রায় এক বছর পর বাধ্য হয়ে দলের কাউন্সিল মিটিং আহবান করার জন্য রিকিউজিশন দেওয়া হল। ১৯৭৭ সালের ২৩ আগস্ট ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউটে রিকিউজিশন মিটিং অনুষ্ঠিত হল। মিটিং এ মাওলানা আব্দুর রহীমকে চেয়ারম্যান এবং মাওলানা আব্দুস সুবহানকে সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত করা হল। এবার সাংগঠনিক তৎপরতা আশানুরূপ বৃদ্ধি পেল। সারাদেশে আইডিএল এর বিস্তার লাভ করল। বৃহত্তর সিলেট জেলার আইডিএল এর সভাপতি হলেন এডভোকেট লুৎফুর রহমান জায়গিরদার আর সেক্রেটারী হলেন জনাব সিরাজুল ইসলাম।

আইডিএল এর মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ

১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন। জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হল '৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি। এ সময় PPR (Political parties Regulation) অনুমোদিত সকল দল সম্মিলিতভাবে দাবি উত্থাপন করল PPR (Political Parties Regulation) তুলে দিতে হবে অন্যথায় কোন দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না।দাবির যথার্থতা অনুধাবন করে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান '৭৮ সালের ১৭নভেম্বর PPR (Political parties Regulation) প্রত্যাহার করলেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি যথারীতি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। আইডিএল ও মুসলিম লীগ সমঝোতাঁর মাধ্যমে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল। মুসলিম লীগ ২২৮টি আসনে এবং আইডি এল ৭২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সমঝোতা হল। জাতীয় সংসদে আইডিএল এর ৬জন এমপি নির্বাচিত হলেন। এরা হলেন:

১. পিরোজপুর জেলা থেকে মাওলানা আব্দুর রহীম।

২. লক্ষ্মীপুর থেকে মাস্টার মুহাম্মদ শফীক উল্লাহ।

৩. ঝিনাইদহ থেকে মাওলানা নূরুন্নবী ছামদানী।

৪. গাইবান্দা থেকে অধ্যাপক রেজাউল করীম।

৫. ঝিকরগাছা, যশোর থেকে মাস্টার মকবুল আহমদ।

৬. কুড়িগ্রাম থকে অধ্যাপক সিরাজুল হক।

'৭৯ সালে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আইডিএল-এর প্রার্থী হয়ে সিলেট জেলা থেকে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাঁরা হলেন:

১. জনাব সামসুল হক।

২. এডভোকেট আব্দুল মুকিত।

৩. মৌলভী ফজলুর রহমান।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ

'৭৯ সালের নির্বাচনে সব দলই স্বনামে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল। কেবল মাত্র জামায়াতে ইসলামীই আইডিএল এর নামে নির্বাচন করল। আইডিএলকে পরিচিত করতে বেগ পেতে হল। জনগণকে বুঝাতে হল পুরাতন জামায়াতে ইসলামী আইডিএল নামে নির্বাচন করছে। নির্বাচন সমাপ্ত হবার পর বিভিন্ন দিক থেকে দাবি উথাপিত হল 'জামায়াতে ইসলামীকে তাঁর নিজস্ব নামে জনসম্মুখে আত্মপ্রকাশের ব্যবস্থা করা হউক।' এছাড়া আইডিএল এর কর্মসূচি জামায়াতে ইসলামীর শুধু মাত্র ৪র্থ দফা রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। জামায়াতে ইসলামী শুধু রাজনৈতিক দলই নয়। জামায়াতে ইসলামী একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আদর্শবাদী আন্দোলন। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (রঃ) একজন বিশ্ব পরিচিত ব্যক্তিত্ব। জামায়াতের নামের সাথে আছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। জামায়াতের রয়েছে সমৃদ্ধ ইসলামী সাহিত্য। জামায়াতকে স্বনামে আত্মপ্রকাশের দাবি ক্রমশঃ জোরদার হল। ফলে এ ব্যাপারে একটি সম্মেলন আহবানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। পরামর্শক্রমে জনাব আব্বাস আলী খানকে আহবায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হল। তাকে সহযোগিতা করলেন জনাব সামসুর রহমান, জনাব আব্দুল খালেক ও মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ। ১৯৭৯ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ মে ঢাকার হোটেল ইডেনে সম্মেলন আহবান করা হল। '৭১ সালে পূর্বপাকিস্তান জামায়াতের প্রায় সাড়ে চারশ রুকন ছিলেন। তাদের মধ্যে যারা বাংলাদেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওয়াদাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত তাঁরা সম্মেলনে ডেলিগেট হিসেবে উপস্থিত হন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্বাস আলী খান। অধ্যাপক গোলাম আযম তখন দেশে অবস্থান করছিলেন কিন্তু তখন তাহার নাগরিকত্ব ছিল না, তাই তিনি প্রতিদিন সম্মেলন স্থলে অবস্থান না করে কেবলমাত্র শেষ অধিবেশনে যোগদান করেন এবং "বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মনীতি ও কর্মসূচি" শিরোনামে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর "জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ" এ নামে প্রকাশ্যে কাজ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে সংগঠনের 'গঠনতন্ত্র' অনুমোদিত হয়। অধ্যাপক গোলাম আযমকে আমীরে জামায়াত নির্বাচিত করা হয়। যেহেতু বাংলাদেশ সরকার তাঁর নাগরিকত্বের স্বীকৃতি দান করে নাই, তাই সিনিয়ওর নায়েবে আমীর জনাব আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দান করা হয়। সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন জনাব সামসুর রহমান।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সিলেট জেলা শাখা

১৯৭৯ সালে সিলেট সদর, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার মহকুমার সমন্বয়ে ছিল সিলেট জেলা। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর সিলেট জেলার প্রথম আমীর নিযুক্ত হন জনাব সামসুল হক। তিনি '৮১ সালের প্রথমার্ধে দাওয়াতুল ইসলামের

www.pathagar.com

আহবানে সে সংগঠনে কাজ করার জন্য বিলাত গমন করেন। তখন থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক ফজলুর রহমান। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৃহত্তর সিলেট জেলা দুটি সাংগঠনিক জেলায় রূপান্তরিত হয়। সিলেট ও সুনামগঞ্জের সমন্বয়ে একটি জেলা যার দায়িত্বে থাকেন অধ্যাপক ফজলুর রহমান। হবিগঞ্জ ও মৌলভী বাজারের সমন্বয়ে অপর জেলার আমীর নিযুক্ত হন জনাব দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব। ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসে হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার আলাদা সাংগঠ নিক জেলা হয়ে যায়। মৌলভী বাজারের জেলা আমীর থাকেন জনাব দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব আর হবিগঞ্জের আমীর নিযুক্ত হন মাওলানা সাইদুর রহমান। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে সুনামগঞ্জ সিলেট থেকে আলাদা হয়ে সাংগঠনিক জেলায় রূপান্তরিত হয়। জেলা আমীর নিযুক্ত হন মাওলানা আহমদ হোসাইন। ১৯৮৮ সালের শেষদিকে অধ্যাপক ফজলুর রহমান কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তখন থেকে ১৯৯০সাল পর্যন্ত জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা ফরিদ উদ্দীন চৌধুরী।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৮এর এপ্রিল পর্যন্ত সিলেটের জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন ডা. শফিকুর রহমান। এ সময় মাওলনা ফরিদ উদ্দীন চৌধুরী কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৯৮ সালের মে মাসে সিলেট জেলা ভাগ হয়ে ৩টি সাংগঠনিক জেলায় রূপান্তরিত হয়। বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা, বিশ্বনাথ, উসমানী নগর ও বালাগঞ্জ এসব উপজেলার সমন্বয়ে সিলেট দক্ষিণ জেলা গঠিত হয়। জেলা আমীর নিযুক্ত হন মাওলানা হাবিবুর রহমান। জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট, কোম্পানিগঞ্জ ও সদর উত্তরের সমন্বয়ে গঠিত হয় সিলেট উত্তর জেলা। জেলা আমীর নিযুক্ত হন জনাব আজিজুর রশীদ চৌধুরী। সিলেট মহানগরীর আমীর নিযুক্ত হন ডা. শফিকুর রহমান। ২০০৮ সালে মহানগর আমীর নিযুক্ত হন এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

সিলেট অঞ্চল (সাংগঠনিক)

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সংগঠন গোটা দেশের সাংগঠনিক কাজ সুষ্ঠু তদারকীর উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশকে ১৯৯৫ সালে দশটি অঞ্চলে ভাগ করে। সুনামগঞ্জ, সিলেট মহানগরী, জেলা উত্তর, জেলা দক্ষিণ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ সাংগঠনিক জেলা নিয়ে গঠিত হয় সিলেট অঞ্চল।

এ অঞ্চলের তদারককারী হিসেবে প্রথম আঞ্চলিক দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মরহুম মাস্টার শফিকুল্লাহ (সাবেক এম.পি.)। তিনি ১৯৯৮সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব প্রতিপালন করেন। এরপর সিলেট অঞ্চলের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন ডা.শফিকুর রহমান। তিনি ১৯৯৮ সালে থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সাল থেকে '০৪ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী

www.pathagar.com

জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ। ২০০৫ সালে আঞ্চলিক দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন অধ্যাপক ফজলুর রহমান। অতঃপর মাওলানা ফরীদ উদ্দীন চৌধুরী (সাবেক এম. পি.) ২০০৫ সালের ১০ সেপ্টম্বর থেকে ২০০৮ সালের ১৯মে পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। ২০মে থেকে আঞ্চলিক দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন ডা.শফিকুর রহমান। এ তারিখ থেকে তিনি সিলেট মহানগর থেকে কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হন। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলের মহিলা বিভাগ তদারকি করার জন্য ডা.আমেনা শফিক (সাবেক এম.পি) ১৯৯৭সাল থেকে আজ পর্যন্ত এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন ২০০৫ ইং
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
সিলেট অঞ্চল

প্রতিনিধি সম্মেলন ২০০৫

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় বার্ষিক পরিকল্পনা '০৫এর সিদ্ধান্ত অনুসারে সারা দেশে ১০টি আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৪ মার্চ '০৫ ঐতিহাসিক সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা ময়দানে। এতে সভাপতিত্ব করেন সিলেট অঞ্চলের দায়িত্বশীল ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব অধ্যাপক ফজলুর রহমান। এতে অংশ গ্রহণ করেন সিলেট মহানগর, সিলেট জেলা দক্ষিণ, সিলেট জেলা উত্তর, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার সকল রুকন, কর্মী ও উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

১১ মার্চ '০৫ কুমিল্লা টাউন হল ময়দানে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব আবু নাসেরমোহাম্মদ আব্দুজ্জাহের সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ২য় আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন। প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা শহর উত্তর, কুমিল্লা শহর দক্ষিণ, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরের প্রতিনিধিবৃন্দ।

৩য় আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৮ই মার্চ '০৫ বন্দর নগরী খুলনা স্টেডিয়ামে। এতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মকবুল আহমদ। উক্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন খুলনা মহানগরী, খুলনা উত্তর, খুলনা দক্ষিণ বাগেরহাট, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা মেহেরপুর, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও নড়াইল জেলার সকল রুকন, কর্মী এবং উপজেলা থানা, পৌর সভা/ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

১ এপ্রিল '০৫ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর ৪র্থ আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহ স্টেডিয়ামে। বিশাল এই প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা জেলার সকল রুকন, কর্মী এবং উপজেলা, থানা, পৌরসভা/ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

www.pathagar.com

দিনাজপুরের বিশাল ময়দানে জনাব এ.টি.এম. আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে ৮এপ্রিল '০৫ইং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর ৫ম আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি সম্মেলনে ৮টি জেলার সকল রুকন ও কর্মী এবং বিভিন্ন উপজেলা, থানা, পৌরসভা/ ইউনিয়ন , পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। জেলাগুলো হলো : দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট।

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে ১৫এপ্রিল '০৫ জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর ৬ষ্ঠ আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কর্ম পরিষদ সদস্য জনাব মীর কাশেম আলী। উক্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরী, চট্টগ্রাম উত্তর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, খাঘড়াছড়ি, বান্দরবন ও ফেনী জেলার সকল রুকন ও কর্মীসহ সকল উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

২২ এপ্রিল '০৫ ফরিদপুর ময়েজ উদ্দীন হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামীর ৭ম আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন। উক্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা। প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুরের সকল রুকন ও কর্মীসহ সকল উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

৮ম প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৯ এপ্রিল '০৫ ঢাকা পল্টন ময়দানে। এতে সভাপতিত্ব করেন মাওলানা রফি উদ্দীন আহমদ। প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন ঢাকা মহানগরী, ঢাকা মহানগরী উত্তর, মহানগরী দক্ষিণ, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নরসিংদি, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর , টাঙ্গাইল এবং শরিয়তপুর জেলার সকল রুকন ও কর্মীসহ সকল উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

৬ মে '০৫ বরিশাল স্টেডিয়ামে অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় জামায়াতে ইসলামির ৯ম আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন বরিশাল মহানগরী, বরিশাল পশ্চিম, বরিশাল পূর্ব, ভোলা বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলার সকল রুকন ও কর্মীসহ সকল উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

বছরের শেষ প্রতিনিধি সম্মেলন হয় ১৩ মে '০৫রাজশাহীতে। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজ কল্যাণমন্ত্রী জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মোজাহিদ। কিন্তু মাননীয় সেক্রেটারী জেনারেল অসুস্থ থাকার দরুন উক্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী মহানগর আমীর জনাব আতাউর রহমান। প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী পশ্চিম, রাজশাহী

www.pathagar.com

পূর্ব, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, পাবনা, শিবগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলার সকল রুকন ও কর্মী এবং বিভিন্ন উপজেলা, থানা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ।

দেশব্যাপী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয় রাজনৈতিক সহনশীলতাঁর সূতিকাগার হিসেবে খ্যাত দুটিপাতা একটি কুঁড়ির সুন্দরতম শ্যামল ভূমি প্রকৃতির অপরূপ শ্যামলিমা খচিত বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেট থেকে। ৪মার্চ ২০০৫ রোজ শুক্রবার ঐতিহাসিক সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা ময়দানে দশ হাজারেরও অধিক ডেলিগেটের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় এই আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মুহতাঁরাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর মুহতাঁরাম মকবুল আহমদ, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মোজাহিদ। সম্মেলনকে ঘিরে নগরীতে সাজসাজ রব, কর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। সম্মেলন পূর্ব বেশ কয়েকদিন ধরে নগরীতে রং-বেরঙের পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুনে ছেয়ে যায় নগরীর অলিগলি এ যেন এক উৎসবের আমেজ। সিলেটের ঐতিহাসিক সরকারি আলীয়া মাদরাসা ময়দানে তৈরি করা হয় প্রায় পনের হাজার প্রতিনিধিদের জন্য সুবিশাল এক আকর্ষণীয় প্যান্ডেল। সম্মেলনে মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য পর্দাঘেরা আলাদাভাবে বসার ব্যবস্থা করা হয়। বিশাল মঞ্চে অতিথিবৃন্দের বসার নজরকাড়া সৌন্দর্য্য এবং ব্যবস্থাপনা ছিল দেখার মত। সিলেটের রাজনৈতিক সভা সমাবেশ ও বিভিন্ন সম্মেলনের ইতিহাসে জামায়াতে ইসলামীর মত এত সুন্দর ও বিশাল নজর কাড়া আয়োজন আর কখনো কেউ করেনি। প্রতিনিধি সম্মেলন দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। সকাল ১০টায় আমন্ত্রিত অতিথিসহ ডেলিগেট-বৃন্দের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট অঞ্চলের দায়িত্বশীল জনাব অধ্যাপক ফজলুর রহমান। সম্মেলন স্থলেই পবিত্র জুমার নামায এবং খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। নামায ও খাবারের বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়।

প্রথম অধিবেশন :

সকাল ৯টা থেকেই বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ নারায়ে তাঁরবির আল্লাহু আকবর ধব্বনিতে মিছিল সহকারে সম্মেলনে আসতে থাকে। সকাল ১০টার ভিতরেই আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং নেতা-কর্মীরা প্যান্ডেলে অবস্থান নেন। ১০টায় আলেমে দ্বীন ও জামায়াতে ইসলামী সিলেট মহানগরীর সাংগাঠনিক ১নং থানা সেক্রেটারী জনাব মুফতি মাওলানা ক্বারী আলী হায়দারের সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধনী পর্বের সূচনা হয়। প্রতিনিধি

www.pathagar.com

সম্মেলনের আহবায়ক ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অন্যতম সদস্য ও সিলেট অঞ্চলের সম্মানিত দায়িত্বশীল জনাব অধ্যাপক ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ও সিলেট মহানগরীর সম্মানিত আমীর জনাব ডা.শফিকুর রহমানের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, সিলেট জেলা বিএনপির তৎকালীন আহবায়ক এম ইলিয়াস আলী এম.পি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সিলেট-৫ আসনের সম্মানিত এম.পি মাওলানা ফরীদ উদ্দীন চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী জনাব ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় পার্টির সিলেট জেলা আহবায়ক এডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ূম ও মহানগর বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বদরুজ্জামান সেলিম।

দ্বিতীয় অধিবেশন

দ্বিতীয় অধিবেশনে অতিথিবৃন্দের পাশাপাশি সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধিদের বক্তব্যে তাঁরা জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রমকে সংগঠনের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন গণমুখী কর্মসূচির মাধ্যমে দলীয় নেতাঁরর্মীকে আরো সক্রিয়ভাবে জনগণের কাছে পৌঁছা প্রয়োজন। প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১নং ওয়ার্ডের কমিশনার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক আজিজুল হক মানিক, জয়নাল আবেদীন, সাবেক শিবির নেতা মুহাম্মদ আব্দুর রব, ফজলুল হক, মাস্টার ফরীদ উদ্দীন, মাওলানা মোস্তফা উদ্দীন, ওমর ফারুক, সাইদুল ইসলাম, হাবিবুল্লাহ বাহার, ফজলুল হক, ফয়জুল ইসলাম মানিক সহ ২০ জন মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রতিনিধি সম্মেলনে আমীরে জামায়াত

আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, এম.পি. বলেন যারা বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র বলে প্রমান করতে উঠে পরে লেগেছে তাঁরাই তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠির জন্ম দিয়েছে। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা বাস্তবায়নের জন্যই তাঁরা এদেশে জঙ্গীবাদ আবিষ্কার করেছে। এদেশের মানুষের কাছে, সুপরিচিত ইসলামী আন্দোলনের সাথে, প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের কারো সাথে এ ধরনের তথাকথিত জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্কই নেই। আর এদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই উঠেনা। আমীরে জামায়াত বলেন-মুসলিম উম্মাহর জন্যএখন দুর্দিন, চর্তুমুখী চক্রান্ত চলছে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে। ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যদি অটুট থাকে, অক্ষুণ্ন থাকে, বাংলাদেশ যদি অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভরতা ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়

www.pathagar.com

তাহলে অনেকেই মনে মনে ব্যথা পান। তাঁরা এদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি দেখতে পছন্দ করেন না। কারণ এতে তাদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি বাধাগ্রস্থ হওয়ার আশংকা থাকে। তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশকে তাঁরা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। আর এই অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে এখানে খুন-খারাবী, বোমাবাজ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে হবে। তিনি বলেন এভাবে বোমাবাজি করে, নৈরাজ্য সৃষ্টি করে এর দায়-দায়িত্ব সরকার ও সরকারের শরীক কোন দলের উপর চাপিয়ে দিয়ে সরকারকে বিব্রত করতে হবে। আমীরে জামায়াত এ ধরনের ষড়যন্ত্রের ব্যপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহবান জানান। তিনি বলেন, এদেশের রাজনীতি চলবে এদেশেরই জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে। এদেশের সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তন হবে জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে। বাইরের কোন চাপের কাছে নত হয়ে নয়।

প্রথম অধিবেশনে আঞ্চলিক দায়িত্বশীলদের বক্তব্য

আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে আঞ্চলিক দায়িত্বশীল জনাব অধ্যাপক ফজলুর রহমান। দুটিপাতা একটি কুঁড়ির দেশ বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেট মহানগরীতে আগত ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত কর্মী ভাইবোনদের স্বাগত জানিয়ে বলেন সুখী, সমৃদ্ধ ও ইনসাফপূর্ণ একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন ইতিহাসের পাতায় মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

সম্মেলনে প্রশাসনের সহযোগিতা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলনকে ঘিরে সিলেটের প্রশাসন দুর্ভেদ্য ও সর্তকতা অবলম্বন করে। নেতৃবৃন্দের পরামর্শ এবং প্রশাসনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গোটা সম্মেলনের নিরাপত্তায় অত্যন্ত সুন্দর ও সফল দায়িত্ব পালন করে। সম্মেলনের প্রবেশের প্রতিটি গেট এবং সম্মেলন স্থলের আশপাশে পুলিশ প্রশাসন সহ সরকারের সবকয়টি দায়িত্বশীল সংস্থা সতর্কতাঁর সাথে দায়িত্ব পালন করে। তাদের সার্বিক দায়িত্বশীলতা সম্মেলনের সৌন্দর্যকে একধাপ বাড়িয়ে দেয়।

যেসব পত্রপত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে

আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলন উপলক্ষে সিলেটের স্থানীয় ও জাতীয় প্রতিটি সংবাদপত্র সম্মেলনের কয়েক দিন পূর্ব থেকেই সম্মেলনের প্রস্তুতির ব্যাপারে সংবাদ প্রচার করতে থাকে। সিলেটের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা যেমন দৈনিক সিলেটের ডাক, দৈনিক জালালাবাদ, দৈনিক শ্যামল সিলেট, দৈনিক সিলেট বাণী, দৈনিক জৈন্তাবার্তা, দৈনিক যুগভেরী, দৈনিক কাজীর বাজার এবং জাতীয় দৈনিকগুলোর মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক খবরপত্র, দৈনিক মানব জমিন, দৈনিক ভোরের কাগজ এবং ব্রিটেনের ইউরো বাংলা, নতুন দিন পত্রিকায় আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলনের সংবাদ ব্যাপকভাবে

www.pathagar.com

প্রচার করে। এছাড়াও বিটিভি, এটিএন বাংলা, এনটিভি, চ্যানেল আই ও ব্রিটেনের জনপ্রিয় বাংলা টিভি চ্যানেল S ও বাংলা টিভিতে সংবাদ প্রচারিত হয়।

সম্মেলনে আগত মেহমানবৃন্দ

তিহাসিক আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্মেলনে আগত দেশী বিদেশী মেহমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেহমান ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এম.পি. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মোজাদি, কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমদ, সংসদীয় উপনেতা ও প্রখ্যাত মোফাস্‌সীর কুরআন আল্লামা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী এম.পি. সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা, জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম, বিশিষ্ট আইনজীবী ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মাস্টার সফিকুল্লাহ, আবু নাসের মুহাম্মদ আব্দুজ্জাহের, প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জনাব অধ্যাপক তাসনিম আলম। এছাড়াও দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে আমীর জনাব মাহমুদুল হাসান খান, ইসালামিক ফোরাম ইউরোপের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব দেলওয়ার হোসাইন খান, দিনাজপুর জেলা আমীর জনাব আফতাব উদ্দীন মোল্লা, জয়পুরহাট জেলা আমীর জনাব আব্দুল ওয়াদুদ, মাদারীপুরের প্রাক্তন আমীর জনাব ফরিদ উদ্দীন আহমদ খান।

মহিলা অংগনে জামায়াতের কাজ

পাকিস্তান পিরিয়ডে পূর্ব পাকিস্তানে মহিলা অংগনে কোন কাজ ছিল না। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর মহিলা অঙ্গনে কাজ শুরু হয়। প্রথম মহিলা রুকন হন মরহুমা সাইয়েদা মুনীরা . . . . .সাল . .

কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগে প্রথম মহিলা দায়িত্বশীলা নিযুক্ত হন হাফেজা আসমা খাতুন। সিলেটে মহিলা অংগনে প্রথম ইসলামী কাজের তৎপরতা শুরু হয় আঞ্জুমানে খেদমতে কোরআনের মাধ্যমে।

৭৫/৭৬ সালে সর্বপ্রথম মহিলাদের মধ্যে কুরআনের তাফসীর মাহফিল শুরু হয় নয়াসড়ক মানিকপীর রোডে অধ্যাপক ফজলুর রহমানের বাসভবনে (দার আল খায়ের)। তাফসীর পেশ করতেন জামায়াতের সাবেক মৌলভীবাজার মহকুমার আমীর এডভোকেট আব্দুল জালাল চৌধুরী। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনি সিলেট জেলা উকিল বারে যোগদান করেন। তিনি নয়াসড়কে অবস্থান করতেন। দার আল খায়েরে প্রতি সপ্তাহে তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলারা উক্ত মাহফিলে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

করতেন। তাফসীর মাহফিলে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং যানবাহন সংকটের কারণে আরো কয়েক জায়গায় তাফসীর মাহফিল শুরু হয়। এ জায়গাগুলো হল মীরের ময়দান মোহতাঁরামা বেগম নাসির বখত এর বাসা, আম্বরখানা হাউজিং ইস্টেটে এডভোকেট লুৎফর রহমান জায়গীরদার সাহেবের বাসা, দরগা মহল্লার ডা.মালেকা বেগম ও ডা.শাহ মাহবুবুস সামাদ সাহেবের বাসা। মাঝে মধ্যে আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরীর হাউজিং এস্টেটের বাসায়ও তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হত। এ মাহফিল সমূহে তাফসীর পেশ করতেন মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী, মাওলানা আনওয়ার উদ্দীন ও জনাব আজির উদ্দীন আহমদ।

'৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের দায়িত্বশীলা হাফেজা আসমা খাতুন ঢাকা থেকে সাংগঠনিক সফরে সিলেট আসেন। প্রথমে তিনি আঞ্জুমানে খেদমতে কোরআনের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (স) উপলক্ষে এক বিরাট মহিলা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর তিনি নয়াসড়ক দার আল খায়েরে বাছাই করা কয়েকজন মহিলাদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন। বৈঠকে বক্তব্য প্রদানের পর তিনি শ্রোতাদের জামায়াতে যোগদান করার জন্য আহবান জানান। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বেগম ফখরে জাহান খায়রুন্নেছা খাতুন, ডা.মালেকা বেগম, সৈয়দা মমতাজ বেগম, হাসনা বেগম ও বেগম হাসনে আরা প্রমুখ জামায়াতে যোগদান করেন। লুৎফর রহমান জায়গীরদার সাহেবের স্ত্রী বেগম ফখরে জাহানকে আহবায়িকা করে জামায়াতে ইসলামীর একটি স্থানীয় কমিটি গঠন করা হয়। প্রথমদিকে প্রতি সপ্তাহে বৈঠক হত। নয়াসড়ক দার আল খায়েরে। সবার সুবিধার্থে মাসের ৪র্থ সপ্তাহে ৪জায়গায় বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকের স্থানগুলো হল ১. নয়াসড়ক দার আল খায়ের ২. আম্বরখানায় লুৎফর রহমান জায়গীরদার সাহেবের বাসভবন ৩. মেডিকেল কলোনীতে ডা.হাবিবুর রহমান সাহেবের বাসা ও ৪. দরগা মহল্লার ডা.সামাদ সাহেবের বাসা।সময়ের ব্যাবধানে ৪স্থানে ৪টি পৃথক ইউনিট গঠিত হয়। এ সময় বেগম নুরুননেছা হক, দিলারা ওহাব, জাহেদা বেগম প্রমূখ জামায়াতের সক্রিয় কর্মী হন। আস্তে আস্তে ইউনিট সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১. যতরপুরে জনাব সিরাজুল ইসলামের বাসভবনে বেগম হাসনে আরার নেতৃত্বে ২. খাদিম এলাকায় জনাব জিয়াউদ্দীন নাদিরের বাসভবনে তাঁর শ্রদ্ধেয় আম্মা বিলকিস বেগমের নেতৃত্বে ৩. ভার্থ খলায় দিলারা ওহাবের নেতৃত্বে, ৪. শেখ ঘাট কলোনীতে মাস্টার মাহবুবুর রহমান সাহেবের বাসায় তাঁর স্ত্রী হাসনা বেগমের নেতৃত্বে ৫. বনকলাপাড়ায় জনাব আজীজুর রশীদ চৌধুরীর বাসায় তাঁর প্রথমা স্ত্রী জাহেদা বেগমের মেহমানদারীতে শাহীদা বেগমের নেতৃত্বে ৬. আম্বরখানা কলবাখানিতে মাস্টার আব্দুল লতিফের বাসভবনে নুরুন্নাহার লতিফের নেতৃত্বে ৭. রায়নগর দপ্তরী পাড়ায় জনাব আব্দুর রহীম আম্বিয়ার বাসভবনে আছিয়া বেগমের নেতৃত্বে ৮. মধুশহীদ মুহাম্মদ রুকন মিয়ার বাসভবনে সৈয়দা মমতাজ বেগমের তদারকীতে ইউনিট গঠিত হয়।

এছাড়া ডা.মালেকা বেগমের তদারকীতে চৌকিদেখী, বেগম নুরুন্নেছা হকের তদারকীতে ঝেরঝেরীপাড়ার অধ্যাপক ফজলুর রহমানের বোনের বাসভবনে খায়রুন্নেছা খাতুনের তদারকীতে জল্লারপার মরহুম ওসমান খানের বাসভবনে সাপ্তাহিক ইউনিট বৈঠক আরম্ভ

www.pathagar.com

হয়। তবে শেষ পর্যন্ত এ স্থানগুলোতে ইউনিটগুলো স্থায়ী হয়নি। বেগম ফখরে জাহান অসুস্থ হওয়ায় ৮৩ সালের দিকে সিলেট শহরের দায়িত্ব অর্পিত হয় ডা.মালেকা বেগমের উপর। ১৯৮৩ সালে ঢাকায় কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের উদ্যোগে প্রথম বারের মত ৩দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এ শিক্ষা শিবিরে সিলেট থেকে যোগদান করেন ডা.মালেকা বেগম ও সৈয়দা মমতাজ বেগম। প্রশিক্ষণ শিবির থেকে হাতে-কলমে শিক্ষা নিয়ে আসার পর সংগঠন পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করে কাজ আরম্ভ হয়। এ সময় মহিলা দায়িত্বশীলাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে দরগামহল্লার মরহুম ইসহাক আলী মনির মহিলা সংগঠনকে একটি রিক্সা দান করেন। ১৯৮৬ সালে সিলেট অঞ্চলে প্রথম মহিলা রুকন হন ডা.মালেকা বেগম। ১৯৮৭ সালে ২য় রুকন হন সৈয়দা মমতাজ বেগম। ১৯৮৮ সালে ৩য় রুকন হন খায়রুন্নেছা খাতুন। ৩জন মহিলা রুকন হওয়ায় এ সময় মহিলা রুকন ইউনিট চালু হয়। ১৯৯২ সালে বৃহত্তর সিলেটে কাজ করার জন্য দায়িত্বশীলা নিযুক্ত হন ডা.মালেকা বেগম। ঐ সময় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে একটি সফর টীম গঠন করা হয়। ডা.মালেকা বেগম এ টীমের সদস্য হন। ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সিলেট অঞ্চলের দায়িত্বশীলা ছিলেন ডা.আমেনা বেগম। ছাত্রজীবন শেষ হবার পর তিনি জামায়াতে যোগদান করেন। ১৯৯২ সালে রুকন হন বিলকিস বেগম, হাসনা বেগম, ডা.আমেনা বেগম, জাহানারা বেগম, অধ্যাপিকা মাহফুজা সিদ্দিকা ও আফিয়া শিকদার হেপী। ১৯৯৩ সালে রুকন হন ডা. রাজিয়া সুলতানা। ১৯৯৪ সালে রুকন হন বেগম রহিমুন নেছা ও বেগম আঞ্জুমান আরা। ১৯৯৫ সালে রুকন হন নুরুন নাহার লস্কর, শাহিদা বেগম ও বেগম হাসনে আরা। ইতোমধ্যে সিলেট জামায়াতের মহিলা বিভাগ একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, ডা.মালেকা বেগম ডি.ভি. প্রাপ্ত হয়ে '৯৭ সালের জুন মাসে গোটা পরিবারসহ আমেরিকায় চলে যান। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক অংগনে ইসলামী আন্দোলনে দায়িত্বাশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জে জামায়াতের সূচনালগ্নের কার্যক্রম

মৌলভীবাজার

১৯৫৫ সালে মৌলভীবাজার জামায়াতের কার্যক্রম শুরু হয়। সে সময় মৌলভীবাজার উপজেলার সম্পাসি গ্রাম নিবাসী সাইয়েদ মোদাব্বির হোসেইন(বর্তমান বয়স-৭২) টাইপ ও শর্ট হ্যান্ড প্রশিক্ষণের জন্য জিন্দাবাজার গুপ্ত কমার্শিয়াল কলেজে তিনমাসের কোর্সে ভর্তি হন। তখন জিন্দাবাজারে জামায়াতের অফিস ও পাঠাগার ছিল। তিনি সেখানে যেতেন ও পড়াশুনা করতেন এবং ঘরে পড়ার জন্য বইও নিয়ে আসতেন। এই পাঠাগারের পরিচালক ছিলেন মাওলানা মোকররম আলী সাহেব। জনাব সামসুল হক পাঠাগারে বসে জামায়াতের কাজ করতেন। জনাব সাইয়েদ মোদাব্বির হোসাইন জনাব সামসুল হকের প্রচেষ্টায় জামায়াতের মোত্তাফিক হন।

জনাব সাইয়েদ মোদাব্বির হোসেইনের প্রশিক্ষণ শেষে সেখান থেকে ১৮/২০টি বই নিয়ে বাড়িতে আসেন এবং মৌলভীবাজার শহরে বসবাসরত কুলাউড়ার কানিহাটি-হাজিপুর নিবাসী জনাব আব্দুল জালাল চৌধুরী এডভোকেট, লংলার সুলতানপুর গ্রাম নিবাসী জনাব আনিছুর রহমান খাঁন মোক্তার ও মৌলভীবাজার ধরকাপন নিবাসী জনাব আব্দুস সত্তার ঐ সমস্ত বইপত্র পড়াশুনা করেন। পরে তাঁদের উৎসাহে মৌলভীবাজার কোর্ট রোডস্থ চৌমোহনা দেওয়ানী মসজিদের রাস্তার পূর্ব পাশে একটি লম্বা টিনের ঘরের একটি রুমে ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত করা হয়। রুমের ভাড়া ছিল ১২টাকা। দেওয়ান আব্দুল বাসিত সাহেব (পরবর্তী সময়ে মন্ত্রী) দিতেন ৫টাকা এবং জনাব আব্দুল জালাল চৌধুরী দিতেন ৭টাকা। এভাবে পাঠাগার চলতে থাকে। এই পাঠাগারে জনাব সাইয়েদ সামসুল ইসলাম কিছু বই দান করেন।

অতঃপর জনাব আব্দুল জালাল চৌধুরী এডভোকেট, জনাব আনিছুর রহমান খান ও জনাব আব্দুস সত্তার জামায়াতের মোত্তাফিক হন। তখন জনাব সাইয়েদ মোদাব্বির হোসাইনকে নাজিম করে প্রথম জামায়াতের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিছুদিন পর সিলেট থেকে জনাব সামসুল হক মৌলভীবাজার সফরে আসেন এবং জনাব আব্দুল জালাল চৌধুরীর বাসায় জামায়াতের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে জনাব আনিসুর রহমান খান মোক্তার সাহেবের উপর জামায়াতের দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন মৌলভী বাজারে আশিয়া গ্রামের কুরুরী বাড়ি মসজিদে ইমামতি করতেন সিলেটের মাওলানা বুরহান উদ্দীন খান। তিনি তমদ্দুন মজলিশের কাজ করতেন। জনাব সাইয়েদ মোদাব্বির হোসাইনের প্রচেষ্টায় তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।

www.pathagar.com

এভাবে জামায়াতের কাজ চলতে থাকে। পরে জনাব আনিছুর রহমান খাঁন মোক্তার, জনাব আব্দুল জালাল চৌধুরী এডভোকেট ও মাওলানা বুরহান উদ্দিন খান জামায়াতের রুকন হন। জনাব আনিছুর রহমান খানের পরে জনাব মাওলানা বুরহান উদ্দিন খান দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে জনাব আব্দুল জালাল চৌধুরী জামায়াতের দায়িত্বশীল হন।

১৯৫৬ সালে জনাব ডা. সাইয়েদ আফছার মাহমুদ এল.এম.এফ. পাস করে মৌলভীবাজার চিকিৎসা পেশা আরম্ভ করেন। তিনি সিলেট মেডিকেল স্কুলে অধ্যয়নরত অবনস্থায় স্কুলের শিক্ষক জৈন্তা নিবাসী ডা.কুদরত উল্লাহ সাহেবের নিকট হতে জামায়াতের দাওয়াত পান। তাঁর ক্লাসমেট জনাব ডা. আব্দুন নুরও তখন জামায়াতের প্রোগ্রামে মাঝে মধ্যে বসতেন।

বি:দ্র: মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের সংগঠনের তথ্যাদি সংগ্রহ করেন সিলেট অঞ্চলের টিম সদস্য জনাব সিরাজুল ইসলাম মতলিব।

পাকিস্তান আমলে মৌলভীবাজার জামায়াতের কাজ করেন সাজিউরীর জনাব মনির উদ্দিন। তিনি এডভোকেট জালাল উদ্দিন চৌধুরীর মুহরী ছিলেন। পতন গ্রামের জনাব আব্দুল হান্নান, কুইসার গ্রামের গোলাম রশিদ, কদমহাটা গ্রামের সাইয়েদ মুমীনুল হক ও সাইয়েদ মাহমুদ আলী, সিংকাপনের জনাব বদরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব আব্দুল হামিদ চৌধুরী, মোস্তফাপুরের মাওলানা আব্দুল গফফার, হিলালপুরের জনাব আনকার মিয়া, আকবর পুরের জনাব ইসমাইল মোক্তার, কুইসারের জনাব সাইয়েদ আব্দুস সালাম, বাহারমর্দানের জনাব আলতাফুল ওয়াহেদ (সাচ্চু মিয়া) ও জনাব আব্দুল বাসিত, নাদামপুরের জনাব আজাদুর রহমান চৌধুরী, ধরকাপনের ডা.সাইয়েদ আব্দুল কুদ্দুছ, বর্তমান বর্ষিজুড়া নিবাসী জনাব সুলেমান খান ও জনাব আব্দুল খালিক, উত্তর মুলাইম নিবাসী লন্ডন প্রবাসী জনাব মাসুক মিয়া, জকিগঞ্জ নিবাসী মাওলানা হাফিজ আহমদ মোহাদ্দেস, একাটুনা নিবাসী ভেটেরিনারী ডাক্তার জনাব ছমির উদ্দীন। তখনকার সিনিয়র মাদরাসার ছাত্র জকিগঞ্জ নিবাসী দাওয়াতুল ইসলাম ইউ. কে. -এর সাবেক আমীর জনাব মাওলানা আব্দুল কাদের শরীফ, মৌলভীবাজার সিলেট বাসস্ট্যান্ড মসজিদের সাবেক ইমাম জনাব হাফিজ মাওলানা আব্দুল খালিক মরহুম ও সেরপুর নিবাসী জনাব আব্দর রাজ্জাক চৌধুরী জামায়াতে ইসলামীতে কাজ করেন। সিলেট নিবাসী মাওলানা আব্দুন নুর সাহেবও কিছুদিন মৌলভীবাজার থেকে জামায়াতের কাজ করেন।

জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক ইউসুফ আলী (মরহুম) ১৯৬৫ সালে মৌলভীবাজার কলেজে অর্থনীতি বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন এবং এখানে সংগঠনের কাজে বেশ সময় দেন। জনাব আব্দুল জালাল চৌধুরীর বড় ভাই জনাব আব্দুল্লাহ চৌধুরীও জামায়াতের কাজে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন।

বড়লেখায় কাজ করতেন জনাব মাস্টার বশীর উদ্দিন (হিনাইনগর), মাস্টার মোস্তফা উদ্দিন আহমাদ (শিমুলিয়া কাঁঠালতলী), জনাব মুহিবুল ইসলাম (সুনাধন মিয়া)

www.pathagar.com

সুজানগর, আজিমপুর) ও জনাব ইব্রাহিম জওহার, মাস্টার আব্দুর রহীম (বারৈ গ্রাম) মাস্টার সাজ্জাদ আলী (বারৈগ্রাম), জনাব মোস্তফা উদ্দিন (সুড়িকান্দি), জনাব আজিজুর রহমান ও জনাব খলিলুর রহমান (সুড়ি কান্দি), জনাব মাস্টার আব্দুল মান্নান (মুড়িরগুল) ও জনাব শহীদ নূরুল ইসলাম (হিনাই নগর, বড়লেখা) প্রমুখ।

১৯৫৯ সালে রাজনগর উপজেলার খাঁরপাড়া গ্রামের জনাব মোমিত বক্স জামায়াতে যোগদান করার পর তখন রাজনগরে জামায়াতের সাংগাঠনিক কাজ আরম্ভ হয়।পরবর্তীতে জামায়াতের কাজ করেন, ঘরগাঁওর জনাব হাজি খলিলুর রহমান, রাজনগর ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান মহাসহস্রের জনাব সাজিদ মিয়া, জনাব দেওয়ান মো.আব্দুর রব, পদিনাপুরের জনাব মো. আব্দুল গফুর, জনাব আলকাছ মিয়া মাস্টার এবং পাঠানটুলার জনাব শমসের মাস্টার, বড়দল গ্রামের জনাব শাহ আমজদ আলী ও শাহ গৌছ আলী, মুন্সীবাজার ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব মো. রফিক মিয়া, মেদিনীমহলের ডা.জয়নাল আবেদীন, রাজনগর পোর্টিয়াস উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেওবন্দ মাদরাসার স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বিশিষ্ট আলেম জনাব মাওলানা আব্দুল লতিফ কোরেশী, জামুরা জামে মসজিদের ইমাম কিশোরগঞ্জ নিবাসী জনাব মাওলানা জালাল উদ্দিন, মুশুরিয়ার জনাব ফজির মিয়া, জনাব রফিক মিয়া, জনাব আব্দুর রকিব প্রমূখ।

শ্রীমঙ্গলে কাজ করেছেন আলহাজ্ব আসদ্দর আলী সাইয়েদ মতিউর রহমান ইঞ্জিনিয়ার, জনাব ডা.আব্দুল কাইয়ূম, জনাব আব্দুল খালিক (খাসগাঁও) প্রমুখ। কুলাউড়ায় জনাব আতিক হোসাইন চৌধুরী ও জনাব আব্দুল বারী মাস্টার। কমলগঞ্জের জনাব ইমদাদুর রহমান চৌধুরী (শসসের নগর) , জনাব ডা.আব্দুল কাদির (হোমিও)।

পাকিস্তান আমলে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা জনাব মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ মৌলভীবাজার সফল করেন। ১৯৬৬ সালে মনু প্রজেক্টের ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জনাব খুররম মুরাদও মৌলভীবাজার আসেন।

১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের আমলে জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। তখনও ইসলামের কাজ থেমে থাকেনি।সারাদেশের মত মৌলভীবাজারেও সরকারি হাইস্কুল মাঠে তিনদিন ব্যাপী ইসলামী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব, অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব, জনাব আব্দুল খালিক, জনাব মাওলানা ছিফাতুল্লাহ, জনাব নুরুল ইসলাম ও জনাব সামসুল হকসহ দেশের প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জনাব শামসুল হক সিলেট জেলার দায়িত্বশীল হিসেবে মৌলভীবাজার উপজেলার ঘনঘন সফর করতেন। তখন সিলেটের পর মৌলভীবাজারের কাজই বেশি অগ্রসর ছিল। তাই তখনকার প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ অধ্যাপক গোলাম আযম ও আব্দুল খালিক সাহেব বেশি সফর করতেন।

তখন মসজিদে ও বাসায় বাসায় কোরআনের তাফসীর বেশি হতো। তাফসীর করতেন জনাব মাওলানা বুরহান উদ্দিন খান ও জনাব আব্দুল জালাল চৌধুরী এডভোকেট। মেহমান এলেও যথাসম্ভব তাফসিরের ব্যবস্থা করা হতো। তখন জামায়াতের শিক্ষাশিবির ও সুধি সমাবেশই বেশি হতো।

www.pathagar.com

স্বাধীনতাঁর পর মৌলভীবাজার মহকুমা জামায়াতের যাবতীয় যোগাযোগের মাধ্যমে ছিলেন শহরস্থ ধরকাপনের অধিবাসী শহরের মধ্যপাড়া নিবাসী চৌমুহনাস্ত ইসলামীয়া লাইব্রেরির মালিক জনাব আব্দুস সত্তার । কেন্দ্র থেকে শুরু করে অন্যান্য সমস্ত মেহমানদের মেহমানদারী স্থান ছিল তাঁর বাসা। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী শামসুন্নাহার আক্তার ও মেয়ে সেলিনা আক্তার মণি জামায়াতের রুকন। একমাত্র আব্দুস সত্তারই তখন সংগঠনকে ধরে রাখেন । পরবর্তীতে ছাত্র জীবন শেষে দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব ঢাকা থেকে মুহতাঁরাম আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের নির্দেশে মৌলভীবাজার চলে আসেন। তখন জনাব আব্দুস সত্তারকে মৌলভীবাজার মহকুমা নাযেম ও দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিবকে মহকুমা সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয়।১৯৮১ সালের ২৮ জুলাই থেকে জামায়াতের কাজ নিয়ম তান্ত্রিকভাবে আরম্ভ হয়। স্থানে স্থানে ইউনিট গঠনের পর ক্রমান্বয়ে থানা সংগঠন গড়ে ওঠে। তখন সংগঠনের কাজে যারা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন: জনাব ছালিক আহমদ (শমসের নগর), জনাব আব্দুল খালিক (শ্রীমঙ্গল), জনাব আব্দুন নূর ও মোহাম্মদ মুজাহিদ (মনুমুখ) জনাব শেখ আব্দুল গফফার (শ্রীমঙ্গল) মৌলভীবাজারের জনাব ডা.সাইয়্যেদ আফছার মাহমুদ, মাওলানা হাফিজ আহমদ, সাইয়্যেদ রুহুল আমীন, জনাব মুহাম্মদ ফারুক, মাওলানা আব্দুল হকজ(সাতগাও), দেওয়ান মিছবাহুল মজিদ কালাম (রাজনগর), কাজী মছদ্দর আলী (ভানুগাছ), মাওল্যনা মোবারক হোসাইন (নবীগঞ্জ), জনাব মো.আলফু চৌধুরী (শ্রীমঙ্গল), দেওয়ান কামরুল ইসলাম ও কাজী ওয়াজিদুর রহমান (মোহামদপুর) ও জনাব আব্দুল মালিক (মারকুনা)

দেশের মহকুমাগুলো যখন সরকারিভাবে জেলায় পরিণত হয় তখন কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলাকে নিয়ে জামায়াতের সাংগঠনিক জেলা গঠন করা হয় । ১৯৮৩ সালের ১১ডিসেম্বর শ্রীমঙ্গল কলেজ রোডস্থ দেওয়ান মঞ্জিলে সিলেটের জেলা আমীর জনাব অধ্যাপক ফজলুর রহমান হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার রুকন বৈঠকে সাংগঠনিক জেলার আমীর হিসেবে জনাব সিরাজুল ইসলামকে শপথ বাক্য পাঠ করান।সেই বৈঠকে মোট ৬জন রুকনের সবাই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন : দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব, মাওলানা সাইদুর রহমান, আব্দুল মন্নান (বড়লেখা) সিদ্দিকুর রহমান (মাধবপুর), ডা.হিফজুর রহমান ও ফখরুল ইসলাম (বড়লেখা)।

তখন সাংগঠনিক জেলাকে ৬টি জোনে ভাগ করে দায়িত্ব দেয়া হয় এবং থানা দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়। তখন সাংগঠনিক জেলার জেলাকেন্দ্র ছিল দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব-এর লন্ডন প্রবাসী বড় ভাই দেওয়ান শামসুল ইসলাম চৌধুরীর শ্রীমঙ্গলের কলেজ রোডস্থ বাসভবন দেওয়ান মঞ্জিলে। পরবর্তীতে জেলা আমীর মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গলের মাঝামাঝি ভৈরবগঞ্জ বাজারের বাসভবনে স্থানান্তরিত হলে ওখানেই জেলার যোগাযোগ ও সাংগঠনিক প্রোগ্রামের কেন্দ্র পরিণত হয়।

www.pathagar.com

১৯৮৫ সালে ৪ঠা অক্টোবর মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ সাংগঠনিক জেলা আলাদা হয়ে যায়। তখন মৌলভীবাজার জেলার জেলা আমির হিসেবে দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব এবং হবিগঞ্জ জেলা আমীর জনাব মাওলানা সাইদুর রহমান দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। দেওয়ান সিরাজুল ১৯৮৪ও ১৯৮৫ দুই বছর সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব এবং ১৯৮৬ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৮টি বছর মৌলভীবাজার জেলার দায়িত্ব পালন করেন। তখন ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত মৌলভীবাজারের জগন্নাথপুর গ্রাম নিবাসী জনাব মোহাম্মদ ফারুক ৩বছর, ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সিলেটের কানাইঘাট নিবাসী হাফিজ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন খান প্রায় দশ বছর এবং এরপর থেকে ২০০৩সাল পর্যন্ত রাজনগরের জনাব আব্দুল মান্নান প্রায় পাঁচ বছর জেলা সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। জেলা নায়েবে আমীরের দায়িত্ব কয়েক বছর পর পালন করেন জনাব ডা. আব্দুন নুর ও জনাব মুহাম্মদ ফারুক।২০০৪ সাল থেকে মৌলভীবাজার জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন রাজনগরের জনাব আব্দুল মান্নান। ২০০৪ এবং ২০০৫ সেশনে জেলার ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন কুলাউড়ার জনাব খন্দকার আব্দুস সোবহান এবং ২০০৬ সাল থেকে জেলা সেক্রেটারীর হিসেবে জনাব ইঞ্জিনিয়ার শাহেদ আলী দায়িত্ব পালন করছেন।

জামায়াতের জেলা অফিস প্রথম কয়েকবছর ছিল বর্তমান সাইফুর রহমান রোডস্থ পশ্চিম বাজারের একটি বিল্ডিং-এর দোতালায়। এরপর প্রায় দশ বারো বছর শহরের শাহ মোস্তফা রোডস্থ জেলা আমীর সাহেবের বাসভবন দেওয়ান মঞ্জিলে। ১৯৯৯সাল থেকে ২০০৬ সালের ৮ জুলাই পর্যন্ত কুসুমবাগ এলাকায় জনাব আব্দুল করিম চৌধুরীর বিল্ডিং-এ। বর্তমানে জেলা অফিস কোর্ট রোডস্থ চৌমোহনা জামে মসজিদের পূর্বপাশে একটি দোতলায় অবস্থিত।

১৯৯৯ সালে ৭ই মার্চ মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে ছাত্র সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে মৌলভীবাজার দেওয়ান মঞ্জিল কম্পাউন্ডে অবস্থিত ডি.এম. কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত এক মিটিং-এ পুলিশ অভিযান চালিয়ে জামায়াতের জেলা আমীর দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব, জেলা সেক্রেটারী জনাব আব্দুল মান্নান ও শিবিরের তৎকালীন জেলা সভাপতি জনাব সেলিম উদ্দিনসহ ৩৬ জনকে গ্রেফতাঁর করেন। সবার উপর মামলা দেওয়া হয়। ২০০২ সালে সেই মামলায় মাননীয় জেলা জজ সকলকে নির্দোষ হিসেবে রায় দেন।

১৯৯৮এর আগে বিভিন্ন থানায় যারা দায়িত্বপালন করছিলেন তাঁরা হলেন:

মৌলভীবাজার সদর

১৯৮৮-১৯৮৯ জনাব মুহাম্মদ ফারুক

মৌলভীবাজার পৌরসভা

১৯৮৫ এডভোকেট জনাব সাইয়েদ আবুল হাসনাত

www.pathagar.com

১৯৮৬-৮৭ জনাব সাইফুল ইসলাম
১৯৮৮-৮৯ জনাব মোহাম্মদ ফারুক
১৯৯০ জনাব ডা. আব্দুন নূর

রাজনগর উপজেলা

জনাব আব্দুল মুকিত
জনাব আব্দুল মান্নান

কুলাউড়া উপজেলা

জনাব আতিকুল হোসাইন চৌধুরী
জনাব খন্দকার আব্দুস সোবহান

বড়লেখা উপজেলা

জনাব মাস্টার বশির উদ্দিন
জনাব আব্দুল মান্নান মাস্টার

শ্রীমঙ্গল উপজেলা

জনাব আছদ্দর আলী
জনাব সাইয়েদ মতিউর রহমান
জনাব ডা.আব্দুল কাইয়ূম
জনাব আব্দুল খালিক
জনাব শেখ আব্দুল গফফার
জনাব মাওলানা ইসমাইল হোসাইন
জনাব আব্দুল বাছিত হেলাল
জনাব মাওলানা ইসমাইল হোসাইন

কমলগঞ্জ উপজেলা

জনাব কাজী মছদ্দর আলী
জনাব আবুল কালাম
জনাব সাইয়েদ শফিকুর রহমান
জনাব আব্দুল গণি তরফদার

মৌলভীবাজার মহিলা বিভাগের কাজ

১৯৬৬ সালে মৌলভী বাজারে মহিলাদের মধ্যে দ্বীনের কাজের জন্য জামায়াতের উদ্যোগে মুসলিম মহিলা মহফিল নামে মহিলাদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার সভানেত্রী শাসছুন্নাহার চৌধুরী। তিনি এডভোকেট আব্দুল জালাল চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী, সেক্রেটারী রওশন আরা আজিজ। তিনি আব্দুল্লাহ মোক্তার সাহেবের স্ত্রী এবং কোষাধক্ষ্য সামাছুন্নাহার আক্তার আব্দুস সত্তার সাহেবের স্ত্রীসহ মোট ৫জনকে দিয়ে কমিটি গঠিত

www.pathagar.com

হয়। এতে সাপ্তাহিক বৈঠকে কুরআন, হাদীসের দারস, মাসআলা মাসায়েল ও ঈমানের বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা হত। মাইক দ্বারা আলাদা বসে কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব আলোচনা পেশ করতেন এবং মহিলাদের নিজেদের মধ্যেও আলোচনা হত। এভাবে কাজ চলতে থাকে। কিছুদিন পর মহিলাদের মধ্যে জামায়াতের সাংগঠনিক কাজ আরম্ভ হয় এবং মাহফিলের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ চলতে থাকে। ১৯৮৭ সালে জামায়াতের রুকন হন শামছুন্নাহার আক্তার ও জাহানারা নূর। পরে রুকন হন সাহানা চৌধুরী, আমিরুন্নেছা চৌধুরী এবং দিল আফরোজ শহীদ। জেলার দায়িত্ব পালন করেন শামছুন নাহার আক্তার এবং জাহানারা নূর । বর্তমানে নাজমুন নাহার নাসরিন দায়িত্বআঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

হবিগঞ্জ জেলা

হবিগঞ্জের কাজের সূচনা : হবিগঞ্জ জেলায় অনেক পূর্ব থেকেই জামায়াতে ইসলামীর কাজ থাকলেও সংঘটিত ভাবে কাজের সূচনা হয় ১৯৬৯ সালে। হবিগঞ্জ বৃন্দাবন সরকারি কলেজে শিক্ষক জনাব সাইয়্যেদ ইকরামুল হক সাহেবের উপর মহকুমার দায়িত্ব দেয়া হয়। যার বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার সৈয়দপুরে। যাদেরকে সহযোগী হিসেবে তিনি পান, তাঁরা হলেন জে.কে. এন্ড এইচ কে হাই স্কুলের তৎকালীন সহকারী প্রধান শিক্ষক জনাব সাইয়্যেদ জহুর আলী। লস্করপুর ইউনিয়নের কূট আন্দর গ্রামের এডভোকেট তাজুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন : ১৯৭০ সালে পূর্ব পাক-প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ৩টি আসনে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে নমিনেশন দেয়া হয়, তাঁরা হলেন : বানিয়াচং-আজমিরিগঞ্জ এলাকার মৌলভী আব্দুল্লাহ বানিয়াচংগী, চুনারুঘাট-বাহুবল এলাকার জনাব এডভোকেট তাজুল ইসলাম। নবীগঞ্জ এলাকায়া জনাব মাওলানা ইসমাইল রাইয়াপুরী।

জাতীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম আরো জোরদার হয়। ১৯৭০ সালের পর জে. কে. এন্ড এইচ কে হাই স্কুলের শিক্ষক নবীগঞ্জের দিনারপুর নিবাসী জনাব ছানাওয়ার আলী খান সংগঠনে যোগদান করেন।

১৯৭৫ সালে মো.আব্দুস শহীদ এডভোকেট হবিগঞ্জ বার-এ যোগদান করেন এবং জামায়াতের কাজ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৬ সনে জনাব সৈয়দ শাহ আলম হোসাইন এডভোকেট, জনাব মরহুম গোলাম রহমান চৌধুরী, জনাব মো.নুরুল হোসেন এডভোকেট সংগঠনে যোগ দান করেন এবং কাজ জোরদার হয়।

১৯...সনে হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজার সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব পালন করেন ১৯.... সন পর্যন্ত দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব। সেক্রেটারী ছিলেন জনাব . . . ..

পরবর্তীতে ১৯৮৫সনের ৪অক্টোবর হবিগঞ্জ জেলাকে আলাদা করা হয় ও জেলা আমীরের দায়িত্ব দেয়া হয় জনাব মাওলানা সাঈদুর রহমানকে। তবে তিনি ১৯৮৯ সন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৯ সনের ১০ই নভেম্বর সংগঠন থেকে বহিস্কৃত হন।

www.pathagar.com

এরপর থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন জনাব সৈয়দ শাহআলম সোসাইন এডভোকেট। তখন সেক্রেটারী ছিলেন জনাব আবু সাকী ও মাওলানা নোমান বিন আযীম।

তখন জেলা মজলিশে শুরা ও কর্মপরিষদে যারা দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা হলেন:

১. মাওলানা আবু তৈয়ব মো.নজীব
২. আবু সালেহ মো.শফিকুর রহমান
৩. মাওলানা আশরাফ উদ্দিন নজমী
৪ গোলাম রহমান চৌধুরী এডভোকেট
৫. জনাব আব্দুস শহীদ এডভোকেট
৬ সৈয়দ জে শাহ আলাম হোসাইন
৭. ডা. মো.ইয়াকুব
৮. ডা. শাহ আহমদ নুরানী
৯. মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান
১০. ডা.মো.আব্দুল ওয়াদুদ
১১. মাওলানা আব্দুল জলিল
১২. মো. আব্দুল বারী ঘোরী
১৩. মাওলানা আলা উদ্দিন ভূইয়া
১৪. সৈয়দ সালেহ আহমদ
১৫. মাওলানা মোবাশ্বির আহমদ
১৬. মো. আব্দুর রহমান
১৭. মাওলানা মখলিছুর রহমান
১৮. মাওলানা আব্দুস সহীদ

১৯৯১ সনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য যাদের নমিনী ঠিক করা হয় :

হবিগঞ্জ-লাখাই নির্বাচনী এলাকায় জনাব সৈয়দ জে শাহ আলম হোসাইন এডভোকেট।

চুনারুঘাট-মাধবপুর এলাকায় জনাব মো. আব্দুস শহীদ এডভোকেট।

নবীগঞ্জ - বাহুবল এলাকায় জনাব আবু তৈয়ব মো. নজীব ।

বানিয়াচং- আজমিরীগঞ্জ এলাকায় জনাব মাওলানা ফজলুল করিম আযাদ। তকে উক্ত সনে হবিগঞ্জ লাখাই ও বানিয়াচং আজমিরিগঞ্জ এ দুটি আসনেই নির্বাচন করা হয়।

১৯৯৬ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত জেলা আমীরের দায়িত্বে ছিলেন জনাব মাওলানা মখলিছুর রহমান, সেক্রেটারী ছিলেন জনাব মাওলানা নুমান বিন আযীম, জনাব মো.আব্দুস শহীদ এডভোকেট ও জনাব মো.আলী আজম সিদ্দিকী।

www.pathagar.com

১৯৯৬সনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হবিগঞ্জের ৪টি আসনেই অংশগ্রহণ করা হয়।

হবিগঞ্জ লাখাই নির্বাচনী এলাকায় নমিনী ছিলেন জনাব সৈয়দ জে শাহ আলম হোসাইন বানিয়াচং -আজমিরিগঞ্জ নির্বচনী এলাকায় জনাব অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ উদ্দিন নবীগঞ্জ- বাহুবল নির্বাচনী এলাকায় জনাব গোলাম রহমান চৌধুরী এডভোকেট।

চুনারুঘাট মাধবপুর নির্বচনী এলাকায় জনাব মাওলানা মখলিছুর রহমান ২০০৪ থেকে জেলা আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ উদ্দিন, জেলা সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন আলী আজম সিদ্দিকী।

যতটুকু জানা যায় থানা পর্যায়ে যারা শুরুর দিকে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন:

মাধবপুর উপজেলা	:	মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান।
বানিয়াচং উপজেলা	:	মৌলভী আব্দুল্লাহ বানিয়াচংগী।
চুনারুঘাট উপজেলা	:	আব্দু সালেহ মো.শফিকুর রহমান।
নবীগঞ্জ উপজেলা	:	ডা.মুজাদ্দিক বখত চৌধুরী
বাহুবল উপজেলা	:	মাওলানা আবু তৈয়ব মো.নজীব
হবিগঞ্জ উপজেল	:	জনাব আবু নাঈম।
আজমিরিগঞ্জ উপজেলা	:	নাসিরউদ্দিন মঞ্জিল
লাখাই উপজেলা	:	মাওলানা আবু বকর

বর্তমানে যারা জেলা মজলিশে শুরার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তাঁরা হলেন:

১. আলী আজম সিদ্দিকী
২. মো.আ.রহমান
৩. মাওলানা আব্দুস শহীদ
৪. সৈয়দ জে শাহ আলম হোসাইন এডভোকেট
৫. মা.আব্দুস শহীদ এডভোকেট
৬. মো.মোশাহিদ আলী
৭. মাওলানা আলা উদ্দিন ভূঁইয়া
৮. ডা.সিফাত আলী
৯. আবু সাকী।

কাজের শুরুতে জামায়াতের সুধী হিসেবে যারা সহযোগিতা করেছেন :

১. জনাব আবুল হাশিম চেয়ারম্যান (মরহুম)
২. জনাব শাহাব উদ্দিন আহম মোক্তার
৩. জনাব ডা.সিরাজুল ইসলাম
৪. জনাব আব্দুল গফুর মোক্তার
৫. জনাব মাওলানা সৈয়দ আব্দুল হক (হক জনাব)

www.pathagar.com

৬. জনাব আব্দুল বারী মোক্তার (প্রাক্তন পার্লামেন্ট সেক্রেটারী)
৭. জনাব হাফেজ সাব (বড় বহুলা)
৮. জনাব মাওলানা রায়হান উদ্দিন
৯. জনাব মাস্টার নূরুল ইসলাম (কায়িদ স্যার)
১০. জনাব আব্দুল গফুর (বাস মালিক মরহুম)
১১. জনাব শাহ আলম শেঠ
১২. জনাব অধ্যাপক মহিনুর রেজা চৌধুরী
১৩. মাওলানা কে বি হায়দার (প্রধান শিক্ষক মরহুম)
১৪. জনাব মাওলানা ইরফান আলী
১৫. জনাব সৈয়দ তৌহিদ আলী
১৬. জনাব মাওলানা মমতাজুল ইসলাম -লাখাই
১৭. জনাব মুসলেম উদ্দিন
১৮. জনাব মাওলানা আশরাফ আলী (আলুগড়াই শায়েস্তাগঞ্জ)

মহিলা বিভাগ

২০০২এর পূর্ব পর্যন্ত হবিগঞ্জ জেলায় মহিলা বিভাগের কাজ হবিগঞ্জ শহরকেন্দ্রিক ছিল। তখনও জেলা সেক্রেটারী বা জেলা দায়িত্বশীলা ফর্মাল নিয়োগ দেওয়া হয় নি। ৯০ এর দশকে মহিলা বিভাগের কাজ শুরু হয় এবং তা ছিল জেলা শহরকেন্দ্রিক। তখন দায়িত্বশীলা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোসাম্মৎ শিরিন আক্তার । এর কেন্দ্রের নির্দেশ ক্রমে জেলা মহিলা বিভাগ সেক্রেটারী নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তিনি হলেন মুহতাঁরামা শামসুন নাহার শাহানা। উল্লেখ্য যে, হবিগঞ্জে এর পূর্বে কোন মহিলা রুকন শপথ গ্রহণ হয় নি। ২০০২ এর ১৬ অক্টোবর একজন মহিলা রুকন হয়, ২০০৩সনে আরো একজন, ২০০৪সনে ৩জন মহিলা রুকন হন। বর্তমানে ৪জন মহিলা রুকন আছেন । অন্যদিকে একজন ছাড়পত্র নিয়ে ঢাকায় কাজ করেন। মহিলা অংগনে যারা শুরু থেকে কাজ করতেন তাঁরা হলেন: গোলশান আরা চৌধুরী, আয়শা আক্তার, শিরিন আক্তার, খালেদা খানম, আছম খানম, ছালেহা খানম, উম্মে আত্তার, উম্মে খোনক প্রমুখ। বর্তমানে সবগুলো উপজেলায় মহিলা বিভাগের কাজ আছে। প্রত্যেক থানায় তাদের রয়েছে আলাদা কমিটি। বিভিন্ন সমস্যার কারণে হবিগঞ্জ মহিলা বিভাগের কাজ অগ্রসর হচ্ছে না। এর মধ্যে অন্যতম দায়িত্বশীল ভাইদের পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধের অভাব।

সুনামগঞ্জ

পাকিস্তান আমলে প্রথমে সুনাগঞ্জের আলীমাবাগের জনাব জিয়াউদ্দিন আহমদ 'জাহানে নও' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির এজেন্সি আনেন। তিনি সুনামগঞ্জে কৃতি ভ্রাতৃদ্বয় জনাব মনোওর আলী ও জনাব মাহমুদ আলী (সাবেক মন্ত্রিদ্বয়) এর আত্মীয় ছিলেন। সুনাগঞ্জ

www.pathagar.com

কলেজের তৎকালীন ভাই প্রিন্সিপাল জনাব মাওলানা নাজির উদ্দিন সাহেব ও 'জাহানে নও' পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। পাকিস্তান আমলে জামায়াতের প্রাথমিক স্থর ছিল সহযোগী সংগঠন (মুত্তাফিক সংগঠন) এবং এর নিচের স্তর ছিল সমর্থক (মুতায়াসসির সংগঠন) প্রথমে সুনামগঞ্জে মুতায়াসসির সংগঠনের মত কিছু একটা ছিল। ভাইস প্রিন্সিপাল নাজির উদ্দিন সাহেব পরবর্তীতে তাবলীগ জামায়াতের সাথে কাজ করেন। জিয়া উদ্দিন আহমদ সাহেবও নিস্ক্রিয় হয়ে যান। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁর শাসনামলে পূর্বে লক্ষ্মণশ্রীর জনাব আখলাক হোসেন পীর যিনি মন্যা পীর নামে পরিচিত-তিনি প্রথমে জনাব অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের সুনামগঞ্জ সফরের ব্যবস্থা করেন।পাবলিক লাইব্রেরীতে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এটা খুব সম্ভব '৫৭-'৫৮ সালের দিকে হবে। জনাব গোলাম আযম সাহেব সুধী সমাবেশে খুব সুন্দর বক্তব্য রাখেন। সুধীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তখনও সুনামগঞ্জে সংগঠন কায়েম হয়নি। আইয়ুব খাঁর শাসনামলে জনাব অধ্যাপক গোলাম সাহেব আবার সুনামগঞ্জ সফর করেন। জনাব গোলাম আযম সাহেবের এ সফর উপলক্ষেও পাবলিক লাইব্রেরিতে সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ঐ সময় জনাব গোলাম আযম সাহেবের বক্তব্য শোনার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল দল ও মতের সুধীজন খুবই আগ্রহী ছিলেন। গোলাম আযম সাহেবের ঐ সফরের সময়ই সুধী সমাবেশের পর স্থানীয় কোর্ট মসজিদে একটি দাওয়াতী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী পাঠাগার নামে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়। এই পাঠাগারে সর্বাধিক বই দান করেন জনাব ডা.করম আলী। এই পাঠাগারকে কেন্দ্র করেই প্রথমে সুনামগঞ্জে জামায়াতে ইসলামীর কার্যক্রম শুরু হয়। ঐ সময় সুনামগঞ্জের সরকারি জুবিলী হাই স্কুলে ঢাকার জনাব মাওলানা নুরুল ইসলাম শিক্ষকতা করতেন, জনাব সিরাজুল ইসলামের সাথে মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেবের পরিচয় হয় নি। মাওলানা নুরুল ইসলাম, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম এবং মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেব এক সংগে চলাফেরা করতেন। জনাব ডা. করম আলীও তাদের সংগে জড়িত ছিলেন। ইসলামী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পর পাঠাগারের নাজিমের দায়িত্ব দেয়া হয় জনাব এডভোকেট আব্দুল মতিন সাহেরেব উপর। ডা.করম আলীকে সহকারী নাজিমের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। পাঠাগারকে ভিত্তি করে যে কাজ শুরু হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তা ছিল জামায়াতে ইসলামীরই কাজ। সামরিক শাসন উঠানোর পর সুনামগঞ্জে মুত্তাফিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুত্তাফিক সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় জনাব এডভোকেট আব্দুল মতিনের উপর। কিছু দিন পর মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাহেব রুকনিয়াতের শপথ নেন। এরপর জনাব ডা.করম আলী এবং অবসর প্রাপ্ত নাজির জনাব আজির উদ্দিন রুকন প্রার্থী হন এবং কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষ থেকে তাদের সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন জনাব আব্দুল খালিক। সিলেটের সাবেক জিন্নাহ হলের ডা. করম আলী ও আজির উদ্দিন সাহেব রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করেন। ঐ সময় এডভোকেট মফিজ চৌধুরীও মুসলিম লীগ থেকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। উল্লেখ্য জনাব মফিজ চৌধুরী আসাম

www.pathagar.com

প্রাদেশিক পরিষদ ও পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি মহকুমা বার এসোসিয়েশন এবং সুনামগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যানও ছিলেন। কিছুদিন তাঁর এ বাসভবন জামায়াতের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনি সংগঠন পরিচালনায় নানা পন্থায় সহযোগিতা প্রদান করেন। শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রহীম, হাফিজ আব্দুল করিম, ষোলঘরের শফিকুর রহমান, মোশাররফ হোসেন বালিকা বিদ্যালয়ের মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব সাহেব, মোয়াজ্জিন মোজাফফর আলী প্রমুখ এবং লক্ষণশ্রীর আরও কয়েকজন জামায়াতে ইসলামীর সাথে শামিল হন এসময়। জনাব ডা. করম আলী ও জনাব আজির উদ্দিনের রুকনিয়াতের শপথের পর পরামর্শের ভিত্তিতে জনাব আজির উদ্দিন সাহেবের উপর মাকামী জামায়াতের দায়িত্ব দেয়া হয়। পরবর্তীতে জনাব এডভোকেট আব্দুল মতিন রুকন হলে রুকনদের মতামত যাচাইয়ের ভোট গ্রহণের মাধ্যমে এডভোকেট আব্দুল মতিন সাহেরকে আমীর নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পর্যন্ত এডভোকেট আব্দুল মতিন সাহেব আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭০এর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে সুনামগঞ্জের আসন থেকে জনাব মরুহুম কামরুল ইসলাম এবং ছাতক থেকে জনাব এডভোকেট আব্দুল মতিন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

১৯৬৯এর গণ আন্দোলনে সুনামগঞ্জে জামায়াতে ইসলামী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কুখ্যাত ডা.ফজলুর রহমান রচিত'ইসলাম' বই এর বিরুদ্ধেও জামায়াতে ইসলামী সুনামগঞ্জে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সুনামগঞ্জ জেলার মহিলা বিভাগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সুনামগঞ্জে জামায়াতের মহিলা বিভাগের কাজ শুরু হয় '৮৩ সালের শেষ দিকে, তৎকালীন জেলা সংগঠক মাওলানা আহমদ হোসাইনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তখন দাওয়াতী কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কাজেরসূচনা হয় ১৯৮৫ সালে ১৩জুন রোজ বৃহস্পতিবার (২৩শে রমজান) ১০জন মহিলা সদস্যের উপস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সুনামগঞ্জ শহর মহিলা শাখা গঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলা মুহতাঁরামা হাফেজা আসমা খাতুন সাবেক এম.পি। নবগঠিত শহর কমিটিতে সভানেত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয় আলীপাড়া নিবাসী মুহতাঁরামা ফাতেমা খানমকে। ফাতেমা খানম সুনামগঞ্জ জেলার প্রথম মহিলা রুকন হিসেবে শপথ নেন ২৪ডিসেম্বর ১৯৯০ইং তারিখে। এভাবে ১৯৯৬ পর্যন্ত সুনামগঞ্জ শহরসহ ছাতক দোয়ারা ও সদরে মহিলা বিভাগের কাজ সরাসরি জেলা জামায়াতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ১৯৯৭ইং থেকে সুনামগঞ্জে জেলা মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী নিয়োগের মাধ্যমে জেলা কেন্দ্রিক সুপরিকল্পিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ১৯৯৭ সালে ১ম জেলা মহিলা বিভাগীয় সেক্রেটারী নিযুক্ত হন মুহতাঁরামা রাবেয়া খাতুন। তিনি ইসলামী ছাত্রী সংস্থার কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে

www.pathagar.com

ইতোপূর্বে দায়িত্ব পালন করেন। সুনামগঞ্জে এ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলাদের মধ্যে একাধিকবার সফর করেন মুহতাঁরামা ডা.আমেনা শফিক সাবেক এম.পি, মুহতাঁরামা রোকেয়া আনসার সাবেক এম.পি, মুহতাঁরামা শামসুন্নাহার নিজামী প্রমুখ।

নিচে শুরু থেকে এ পর্যন্ত শহর ও জেলার দায়িত্বশীলাদের তালিকা দেওয়া হল।

দায়িত্বশীলাদের তালিকা

সেশন	সভানেত্রী	সেক্রেটারী	মন্তব্য
১৯৮৫-'৯০	ফাতেমা খানম	আসমা রাজ্জাক	শহর শাখা
১৯৯১-'৯৬	আয়েশা সিদ্দীকা	ইসমত আরা	শহর শাখা
এরপর থেকে জেলা মহিলা বিভাগ চালু হয়।			
১৯৯৭-'০২	রাবিয়া খাতুন		জেলা শাখা
২০০২-'০৩	রাবিয়া খাতুন	রাহেলা খাতুন	জেলা শাখা
২০০৩-'০৫ ১২ জুলাই	রাবিয়া খাতুন		জেলা শাখা
২০০৫-'০৮	আয়েশা খাতুন		জেলা শাখা

থানা দায়িত্বশীলাদের তালিকা

সেশন	সভানেত্রী	সেক্রেটারী	মন্তব্য
২০০৭	রাহেলা খাতুন	ফাতেমা তাজ দিলওয়ারা	সুনামগঞ্জ পৌরসভা
২০০৭	রোহেলা আক্তার পিয়ারা		সুনামগঞ্জ সদর
২০০৭	নার্গিস আক্তার	জাহেদা আক্তার	বিশ্বম্ভরপুর
২০০৭	ডা.ইসমত আরা ইউসুফ	আলেয়া খাতুন	ছাতক পৌরসভা
২০০৭	আনোয়ারা বেগম		দোয়ারাবাজার
২০০৭	সৈয়দা শামীম রব্বানী		জগন্নাথপুর
২০০৭	নিলুফার চৌধুরী		ধর্মপাশা
২০০৭	আঞ্জুমান আরা বেগম		তাহিরপুর
২০০৭	রহিমা বেগম		ছাতক

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়
নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে জামায়াতে ইসলামীর কর্মসূচি ছিল ৩টি। যথা:

১. দাওয়াত ও তাবলীগ।
২. সংগঠন ও প্রশিক্ষণ।
৩. সমাজ সেবা ও সমাজ সংস্কার।

জামায়াতে ইসলামী হিন্দ আজ পর্যন্ত এ তিনটি কর্মসূচির উপর বহাল আছে।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ১৯৫৪ সালের ১০ নভেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত রুকন সম্মেলনে আরো এক দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ৪র্থ দফা কর্মসূচির হল : ইসলাহে হুকুমত অর্থাৎ রাষ্ট্রের সংস্কার ও সরকারের সংশোধন। এ কর্মসূচি গ্রহণের পর সর্ব পর্যায়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী পর্যায়ে জামায়াতের দায়িত্বশীলদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। বিষয়টি কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার বৈঠকে উত্থাপিত হয়।বৈঠকে শুরার দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে এবং এক তৃতীয়াংশ এ মুহূর্তে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে।

আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদুদী অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন । কিন্তু তিনি তা না করে এ ব্যাপারে রুকনদের মতামত জরুরি মনে করে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তকারী সংস্থা রুকন সম্মেলন আহবান করেন। ১৯৫৭ সালের ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের বাহওয়ালপুরের মাছিগোট নামক স্থানে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার কথা আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদুদীর। যেহেতু তিনি এক মতের সমর্থক তাই তিনি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে রুকনদেরকে প্রভাবিত করেছেন কেউ যাতে এ অভিযোগ করার সুযোগ না পায় সে জন্য আমীরে জামায়াতের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং করাচী জামায়াতের আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদকে ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত করেন। চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদের সভাপতিত্বে রুকন সম্মেলন আরম্ভ হয়। করাচী জামায়াতের রুকন এবং ইসলামী জমিয়তে তোলাবা (ইসলামী ছাত্র সংঘের) সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা.আসরার আহমদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বিপক্ষে দুই দফায় ৬ ঘন্টা বক্তব্য রাখেন। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীও নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বিপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

বিপক্ষের সকলের বক্তব্য শেষ হবার পর মাওলানা মওদুদী নির্বাচনে অংশ গ্রহণের পক্ষে মতামত প্রকাশ করে দীর্ঘ ৬ ঘন্টা বক্তব্য রাখেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শেষ হবার পর সভাপতি অধিবেশন মূলতবী করে পরদিন অধিবেশন আহবান করেন। তিনি রুকনদের

www.pathagar.com

প্রতি তাদের সুচিন্তিত রায় প্রদানের আহবান জানান। তখন পর্যন্ত সারা দেশে সর্বমোট রুকন ছিলেন ১২৭২ জন। তম্মধ্যে ৯৪৫জন রুকন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত রুকনদের মধ্যে মাত্র ১৫জন নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বিপক্ষে মতামত প্রদান করেন আর বাকি সবাই পক্ষে রায় প্রদান দেন। এ মতামতই গৃহীত হয়। সম্মেলন শেষে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর নেতৃত্বে ১৫জন রুকন জামায়াতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

সম্মেলনে যে প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় সে প্রস্তাবটি নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা হল ঃ

আজ থেকে পনেরো বছর [৫] আগে যে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং যে মূলনীতি সমূহ মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করে জামায়াতে ইসলামী তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলো, আজ পর্যন্ত সে সেই সব মূলনীতি অনুসরণ করে, সেই মনজিলে মকছুদের দিকেই এগিয়ে চলছে-এজন্যে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া আদায় করছে। এই দীর্ঘ এবং কঠিন সফরকালে যদি তাঁর দ্বারা দ্বীন-ইসলামের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো খেদমত হয়ে থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণত আল্লাহ তায়ালারই করুণা মাত্র এবং এজন্যেও সে আপন প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞ তা প্রকাশ করছে। আর যদি তাঁর দ্বারা কোনো অক্ষমতা ও ভুলক্রটি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে তা নিজেরই অন্যায়ের ফল এবং অধিকতর হেদায়েত ও তওফীকের জন্যে দোয়া করছে। জামায়াতে ইসলামী এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, ১৯৫১ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াত সদস্যদের সাধারণ সম্মেলনে আমীরে জামায়াত মজলিশে শুরার পরামর্শক্রমে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে যে কর্মসূচি পেশ করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ এবং সঠিক ভারসাম্য সহকারে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে-তাঁর সমস্ত আদর্শিক ও বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করছে এবং ভবিষ্যতেও তা-ই এ আন্দোলনের কর্মসূচি থাকা উচিত।

উক্ত কর্মসূচির প্রথম তিনটি অংশ (অর্থাৎ চিন্তার পরিশুদ্ধি ও পুনর্গঠন; সৎ ব্যক্তিদের সন্ধান, সংগঠন ও ট্রেনিং দান এবং সামাজিক সংশোধনের প্রচেষ্টা) তো জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনের প্রথম দিন থেকেই তাঁর কর্মসূচিতে আবশ্যিক অংশ হিসেবে শামিল রয়েছে। অবশ্য পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জামায়াতের উপায় উকরণ অনুসারে ঐগুলো কার্যকরী করার পন্থা পরিবর্তিত হয়ে আসছে। ঐ অংশগুলো সম্পর্কে জামায়াত বর্তমান এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে যে, ভবিষ্যতে অন্য কোনো জামায়াতী ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত ঐ তিনটি অংশকে এই প্রস্তাবনার সাথে পরিশিষ্ট হিসেবে সংযোজিত প্রোগ্রাম অনুসারে কার্যকরী করতে হবে। পরন্তু জামায়াতের এই সাধারণ সম্মেলন মজলিসে শুরা এবং সমস্ত আঞ্চলিক জেলাওয়ারী ও স্থানীয় জামায়াতকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, তাঁরা যেনো ঐ প্রোগ্রামের ওপর এতোখানি গুরুত্ব প্রদান করে, যাতে করে কর্মসূচির চতুর্থ অংশের সাথে জামায়াতের গোটা কার্যাবলির সুষ্ঠু ভারসাম্য স্থাপিত হয় এবং তা স্থাপিত থাকে।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধন সম্পর্কিত এই কর্মসূচির চতুর্থ অংশটিও প্রকৃতপক্ষে শুরু থেকেই জামায়াতের বুনিয়াদী উদ্দেশ্যের মধ্যে শামিল রয়েছে। জামায়াত এ প্রশ্নটিকে হামেশাই জীবনের বাস্তব সমস্যাবলির মধ্যে সবচাইতে গুরুত্ব পূর্ণ এবং চূড়ান্ত প্রশ্ন বলে বিবেচনা করেছে যে, জীবন ব্যবস্থার চাবিকাঠি কি সৎলোকদের হাতে ন্যস্ত, না ফাসেক লোকদের হাতে? দুনিয়ার জীবনে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মর্যাদায় কি খোদার অনুগত লোকেরা অভিষিক্ত না তাঁর আনুগত্য-বিমুখ লোকেরা? বস্তুতশুরু থেকেই জামায়াতের এই দৃষ্টিভংগী রয়েছে যে, যে পর্যন্ত ক্ষমতাঁর চাবিকাঠির ওপর দ্বীন ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হবে, সে পর্যন্ত দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আদৌ পূর্ণ হতে পারে না। পরন্ত এ নিগূঢ় সত্যকেও জামায়াত শুরু থেকেই সামনে রেখেছে যে, দ্বীন-ইসালামের এই প্রাধান্য কখনো রাতাঁরাতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরং এ হচ্ছে একটি ক্রমিক কাজ যা লা-দ্বীনী জীবন ব্যবস্থার মুকাবেলায় দ্বীনী ব্যবস্থাকামীদের ক্রমাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ধাপে ধাপে অগ্রগতির মাধ্যমেই পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। এই উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী ভারত বিভাগের পূর্বে কার্যত কোনো পদক্ষেপ না করে থাকলে তাঁর প্রধান কারণ ছিলো সুযোগ-সুবিধা ও উপায় উপকরণের অভাব।পরন্তু তখনকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ উদ্দেশ্যে কাজ করার পথে শরয়ী বিধিনিষেধও ছিলো একটি অন্যতম কারণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যখন আল্লাহ তায়ালা সুযোগ সুবিধা ও উপায় উপকরণ উভয়েরই ব্যবস্থা করে দিলেন এবং শরয়ী বিধিনিষেধও দূরীভূত হবার সম্ভাবনা দেখা গেলো, তখন জামায়াত তাঁর কর্মসূচির ভেতর এই চতুর্থ অংশটিও যা তাঁর মূল উদ্দেশ্যের এক অপরিহার্য দাবি ছিলো-শামিল করে নিলো। এ ক্ষেত্রে দশ বছরের চেষ্টা-সাধনার পর এখন লা-দ্বীনী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমর্থক শক্তিগুলোর মুকাবেলায় দ্বীনী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমর্থকদের অগ্রগতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপনিত হয়েছে। দেশের শাসনতন্ত্রেও দ্বীনী রাষ্ট্রব্যবস্থার বুনিয়াদী নীতিসমূহ দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় কার্যতচালু করা নেতৃত্বের পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ে একটি সৎ নেতৃত্বকে ক্ষমতাসীন করার সঠিক কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, এই কর্মসূচির চারটি অংশেই ভারসাম্যের সাথে এমনিভাবে কাজ করে যেতে হবে, যাতে করে প্রত্যেক অংশের কাজই অপর অংশের জন্যে পরিপূরক ও প্রেরণাদায়ক হয় এবং প্রথম তিন অংশে পরিমাণ কাজ হবে সেই অনুপাতে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় দ্বীনী ব্যবস্থাপনার সমর্থকদের প্রভাব ও অনুপ্রবেশও কার্যত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু একথা স্পষ্টত: মনে রাখতে হবে যে, ভারসাম্য বজায় না থাকাকে কোনো অবস্থায়ই এই কর্মসূচির কোনো অংশকে নাকচ, নিষ্ক্রীয় বা মুলতবী করার দলীল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

উপরন্ত জামায়াতে ইসলামী তাঁর গঠনতন্ত্র অনুসারে যাবতীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্যে গণতান্ত্রিক পন্থায়ই কাজ করতে বাধ্য। আর পাকিস্তানে এই সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্যে একটি মাত্র নিয়মতান্ত্রিক পথই খোলা রয়েছে, তা হচ্ছে নির্বাচনের পথ। এ জন্যেই জামায়াতে ইসলামী দেশের নির্বাচনের সাথে একেবারে সম্পর্কহীন

থাকতে পারে না- তাতে সে প্রত্যক্ষভাবে হোক, কি পরোক্ষভাবে অথবা উভয় পন্থায় অংশ গ্রহণ করুক না কেন। এখন নির্বাচনে ঐ তিন পন্থার মধ্যে কখন কোন পন্থায় অংশ গ্রহণ করা হবে, বাকি থাকলো শুধু এই প্রশ্ন। একে জামায়াত তাঁর মজলিসে শুরার ওপর ছেড়ে দিচ্ছে, যাতে করে প্রত্যেক নির্বাচনকালে সমসাময়িক অবস্থা পর্যালোচনা করে মজলিস এ ব্যাপারে কোনো ফায়সালা করতে পারে।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ১-৫)

প্রস্তাবে আরো পয়েন্ট ছিল।পয়েন্টগুলো নিম্নরূপ: " প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাবনা দশটি ধারা সমন্বিত:

প্রথমত : যে মহান উদ্দেশ্যে এই জামায়াত গঠিত হয়েছিলো এবং যে মূলনীতি গুলো সে মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করেছিলো, আজ পর্যন্ত সে সেই লক্ষ্য পথেই, সেই সব মূলনীতি মেনে নিয়েই এগিয়ে চলছে।

দ্বিতীয়ত: ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত করাচী সম্মেলনে এই আন্দোলনের জন্যে যে কর্মসূচি পেশ করা হয়েছিলো, তা পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে যাবতীয় আদর্শিক ও বাস্তব প্রয়োজন পূরণ করছে। সুতরাং ভবিষ্যতেও তা-ই এ আন্দোলনের কর্মসূচি থাকা উচিত।

তৃতীয়ত : সেই কর্মসূচির প্রথম তিনটি অংশ কোনো নতুন জিনিস নয়, বরং আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই তা এর কর্মসূচির আবশ্যিক অংশ হিসেবে রয়েছে।

চতুর্থত : এই প্রস্তাবনার সংগে যে প্রোগ্রাম পেশ করা হচ্ছে, আপাতত ঐ অংশত্রয়ের বাস্তবায়নের জন্যে তা-ই যথেষ্ট এবং উপযোগী।

পঞ্চমত : এই কর্মসূচির চতুর্থ অংশটিও শুরু থেকেই জামায়াতের বুনিয়াদী উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তবে দেশভাগের আগে শুধু সময় সুযোগ ও উপায় উপকরণের অভাবে এবং শরয়ী নিষেধাজ্ঞার কারণেই কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

ষষ্ঠত : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যেমন সুযোগ সুবিধা ও উপায় উপকরণের ব্যবস্থা হয়েছে তেমনি শরয়ী নিষেধাজ্ঞাও দূরীভূত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই জামায়াত ঠিক উপযুক্ত সময়েই তাঁর বাস্তব প্রোগ্রামের মধ্যে ঐ অংশটিকে শামিল করে নিয়েছে।

সপ্তমত : দশ বছর যাবত চেষ্টা সাধনার পর যে ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে, তা এই কর্মসূচিতে কোনো রদবদলের প্রয়োজন নির্দেশ করেনা, বরং তা শুধু চারটি অংশে সঠিক ভারসাম্য সহ কারে, সমানভাবে কাজ করারই দাবি জানায়।

অষ্টমত : এই কর্মসূচির ভিত্তিতে কাজ করার ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন; কিন্তু ভারসাম্যহীনতাকে কখনো এর কোনো অংশকে বাতিল, নিষ্ক্রিয় বা মুলতবী করার প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

নবমত : নির্বাচনের সাথে আমরা আদৌ সম্পর্কহীন থাকতে পারি না তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করি আর পরোক্ষভাবে কিংবা উভয় পদ্ধতিতে।

www.pathagar.com

দশমত : উল্লেখিত তিন পদ্ধতির মধ্যে আমরা কোন পদ্ধতিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবো, তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব জামায়াতের মজলিশে শুরার ওপরই ন্যস্ত করা উচিত।

(ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ১৯-২১)

মাওলানা মওদুদী রুকন সম্মেলনে ৬ঘন্টা ব্যাপী যে বক্তব্য রাখেন তা বই আকারে পরে প্রকাশিত হয়। বইয়ের নাম "ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি" ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে মাওলানা ভাষণের ছিটে ফোঁটা অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হল:

"আজ থেকে পনেরো বছর আগে জামায়াতে ইসলামী গঠনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিলো তাঁর পঠভুমি ছিলো এই তখন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে যে আন্দোলন ও দলগুলো কাজ করেছিলো, তাঁরা হয় ইসলামের মূল উদ্দেশ্যকে উপলব্ধিই করতে পারেনি, নতুবা তাকে উপলব্ধি করা এবং নিজেদের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও এমন সব পথে অগ্রসর হচ্ছিলো, যা কিছুতেই সে লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হচ্ছিলো না।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ২৪-২৫)

"বস্তুত মানব জাতির কর্তৃত্বের চাবিকাঠি কার হাতে নিবদ্ধ, এই প্রশ্নের ওপরই গোটা মানব সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভাঙন-বিপর্যয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা নির্ভরশীল। একথা সর্বজনবিদিত যে, ড্রাইভার যে দিকে চালিত করে, গাড়ি হামেশা সেদিকেই ছুটতে থাকে। আর গাড়ি যেদিকে চলে, তাঁর যাত্রীদেরকেও-ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় হোক বাধ্য হয়ে সেদিকেই যেতে হয়।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং - ৪৪)

"ইংরেজদের হাতে কর্তৃত্বের চাবিকাঠি চলে যাবার পর মাত্র এক শতকের মধ্যে কিভাবে তাঁরা গোটা দেশের নৈতিক চরিত্র, মানসিকতা, মনস্তত্ত্ব, আচার-ব্যবহার এবং সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা বদলে ফেলেছে। মোট কথা গোটা মানব জীবনে তাঁর এমনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেছে যে, কোনো একটি জিনিসও তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী : পৃষ্ঠা নং ৪৬)

"আমরা বিশ্বাস করি যে, সংশোধনের অন্যান্য প্রচেষ্টার সাথে রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধনের চেষ্টা করা না হলে জীবনের বর্তমান ভাঙন ও বিপর্যয়ের প্রতিকার করার কোনো প্রচেষ্টাই কামিয়াব হতে পারে না। কারণ শিক্ষাদীক্ষা, আইন কানুন, শাসন-শৃংখলা এবং রেজেকের বিলি-বন্টনের সাহায্যে যে বিরাট বিপর্যয় প্রভাব বিস্তার করে চলছে, তাঁর মুকাবিলায় শুধু ওয়াজ নছিহত, ও মৌখিক প্রচার উপদেশ ভিত্তিক সংগঠন প্রচেষ্টা কখনই কার্যকরী হতে পারে না। কাজেই আমরা যদি যথার্থই নিজ দেশের গোটা জীবন ব্যবস্থাকে ফাসেকী ও ভ্রষ্টতাঁর পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে সত্য দ্বীনের সহজ সরল পথে চালাতে চাই, তবে শাসন ক্ষমতা থেকে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তিকে অভিষিক্ত করার জন্য সরাসরি চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ৬০)

www.pathagar.com

"এই বিরাট পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব হতে পারে? একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এর জন্যে একটি মাত্র পথই খোলা রয়েছে; আর তা হচ্ছে নির্বাচনী প্রয়াস প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনমতকে ট্রেনিং দেয়া, জনগণের নির্বাচন মানকে পরিবর্তিত করা এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংশোধন করা। একমাত্র এইভাবেই দেশের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে খালেছ ইসলামী ভিত্তির ওপর পুনর্গঠন করতে ইচ্ছুক ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে শাসন ক্ষমতায় আসীন করা যেতে পারে।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ৬১)

"দুনিয়ায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করার জন্যে যে আন্তর্জাতিক দলটির অভ্যুদয় ঘটেছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁরই নাম হচ্ছে মুসলমান। আর বাতিল রাষ্ট্র শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে খোদায়ী হুকুম প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই কর্তব্য কিছুতেই পালন করা যেতে পারে না।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়, তাঁর দার্শনিক ভিত্তি ও স্বাভাবিক দাবিগুলো বিবৃত করে বলা হয়েছে যে, এ একটি ব্যাপকতর সভ্যতা; দুনিয়াবী জীবনের সমগ্র বুকে ছড়িয়ে পড়ার যোগ্যতাই এর রয়েছে।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ৮৬-৮৭)

১৯৩৭ থেকে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আন্দোলন এমন এক চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে, যার ফলে এ আন্দোলনের প্রভাব শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলে প্রায় নিশ্চিত মনে হয়। আর এই জয়লাভ না জানি ভারতের মুসলমানদেরকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায় এবং যে নগণ্য পুঁজিটুকু এদেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্যে সহায়ক হতে পারে, তাও বুঝি শেষ হয়ে যায় এ সময় এটাই ছিলো সবচাইতে বড়ো আশংকা। ঐ সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কামীয়াবীর ফলে বিচ্ছিন্ন ও অসংঘবদ্ধ মুসলমানরা কিরূপ প্রভাবিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো এবং তাদের সেই ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অংশগুলোকে নিজেদের ভেতর গ্রাস করে নেবার জন্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা দৃশ্যত গণ সংযোগ (Mass Contact) এবং গোপনে যে শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেছিলো, তা এই উপমহাদেশে ইসলামের ভবিষ্যতের জন্যে এক কঠিন বিপদের আলামত ছিলো ।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ৮৮)

"ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এদেশের সকল বাসিন্দাকে 'এক জাতি' আখ্যা দিয়ে ধর্মহীনতা ও গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে তাদের একটি মাত্র জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে সমগ্র শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলো। দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম সমাজের বড়ো বড়ো ধর্মীয় নেতা পর্যন্ত এই মতবাদটির বুনিয়াদী ত্রুটি এবং এর অনিবার্য পরিণামকে উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। এ কারণেই তাঁরা মুসলমানদেরকে এ ধরনের জাতীয়তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার শুধু পরার্মশই দিচ্ছিলেন না, বরং এ ব্যাপারে ইসলামের দিক দিয়ে কোনো আপত্তি নেই বলে প্রমাণ করতেও চাইছিলেন।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ৯১-৯২)

www.pathagar.com

"১৯২৪ সালের পর (খেলাফত আন্দোলনের অবসানের পর) ভারতে এমন একটি যুগের সূচনা হলো যে, একদিকে এ উপমহাদেশের মুসলনামনগণ অনৈক্য, চিন্তার বিভ্রান্তি ও আত্মঘাতি কার্যে লিপ্ত হতে লাগলো, অন্যদিকে গান্ধিজীর নেতৃত্বে হিন্দু-জাতীয়তা দিন দিন এক প্রচন্ড শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে ইংরেজ শাসক শক্তির মধ্যকার পার্থক্য দিন দিন প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। এমন কি, পনেরো বছর পর অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে এর পরিণতি একটি প্রচন্ড বিস্ফোরণের ন্যায় প্রকাশ পেলো: অর্থাৎ ভারতের এক বিরাট অংশে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। তখনই একথা স্পষ্টরূপে মনে হতে লাগলো যে, ইংরেজ শাসকশক্তি এর মোকাবেলায় আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারবেনা এই পরিস্থিতি দেখে মুসলমানরা শুয়ে পড়তে পড়তেই আবার ধড়মড়িয়ে উঠলো। তাদের ভেতর এক নয়া জাতীয় আলোড়নের সৃষ্টি হলো।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ৯৫-৯৬)

"সেই যুগে মুসলমানদের ভেতরকার আর একটি শক্তিশালী দল বলতো যে, আমরাও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা চাই, কিন্তু সে জন্যে প্রথম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে যোগদান করে ইংরেজ শাসক শক্তির কাছ থেকে আজাদী লাভ করতে হবে, অতঃপর স্বাধীন ভারতে সেই উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে-এই হচ্ছে তাঁর পথ! এই দলটিতে দেশের খ্যাতনামা ও সম্মানিত আলেমদের উপস্থিতি লোকদের পক্ষে এক মারাত্মক ধোঁকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

তখন আরো একটি আন্দোলন বড়ো জোরেশোরে চলছিলো এটিও ইসলামী রাষ্ট্রকেই নিজেদের চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করতো, কিন্তু সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে ফৌজী সংগঠন কেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করতো। এক বিরাট অংশ এই দলের প্লাটফর্মেও সমবেত হয়েছিলো।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ৯৭-৯৮)

"দেশ বিভাগ যখন কার্যকরী হলো, তখন একে একে এমন সব পরিবর্তন সূচিত হলো, যা পূর্বে কেউ কল্পনাও করেনি। আর এই সব পরিবর্তন দেখতে না দেখতে সমস্ত পরিকল্পনাই বদলে ফেললো।

সর্বপ্রথম পরিবর্তন ছিলো এই যে, পাঞ্জাব, বাংলাদেশ ও আসাম বিভাগ কার্যকরী হলো। এর ফলে পাকিস্তান তাঁর প্রাথমিক পরিকল্পনার তুলনায় অনেক বেশি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো।

এরপর ঠিক বিভাগকালে এর চাইতেও বড়ো এবং সুদুর প্রসারী পরিবর্তন এই দেখা দিলো যে, পর্যায়ক্রমে বাধ্যতামূলক লোক বিনিময় কার্যকরী হলো। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তান শতকরা ৯৮ভাগ এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রায় ৮০ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হলো।"(ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ১২২-২৩)

www.pathagar.com

"বস্তুত কোনো দেশে এক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীর বর্তমান ইসলামী-রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বপক্ষে জনমত তৈরির সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধার সদ্ব্যবহার না করা এবং তাতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা সাধনার সম্ভাব্য খোলা পথকে বন্ধ মনে করা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই কাজ হতে পারে না।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ১২৪)

"বিভাগ পূর্বকালে মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে যে আন্দোলনটি এদেশের জনমানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, তা আপন লক্ষ্যস্থল পাকিস্তানে পৌছেই সহসা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ বিভাগ উত্তরকালেও মুসলিম জনসাধারণকে নিজের সংগে সম্পৃক্ত রাখতে পারে, এমন কোনো ইতিবাচক ব্যবস্থা বা প্রোগ্রাম সে উদ্ভাবন করতে পারে নি। পরন্তু এই আন্দোলনের নিশানবাহী দলটি দেশ বিভাগ এবং তাঁর পরবর্তীকালে যে চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, তা কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর মর্যাদা ও নৈতিক প্রভাবের গগনচুম্বী প্রাসাদকে ধূল্যবলুন্ঠিত করে দেয়।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ১২৯)

"যুগের দাবিকে উপলব্ধি করে ঠিক সময় মতোই আমরা সিদ্ধান্ত করি যে, সংগ্রামের সূচনা করার জন্যে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবির চাইতে অধিকতর উপযোগী আর কোনো জিনিস নেই। এই একটি মাত্র জিনিসকে সংগ্রামের উপলক্ষ বানিয়েই আমরা নিজেদের লক্ষ্যপানে অগ্রসর হবার পথ খুঁজে পাবার বিভিন্ন কারণে আমাদের আন্দোলনের অনুকূলে সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা থেকে উপকৃত হবার এবং নতুন পরিবেশে আমাদের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে উত্থিত তামাম সম্ভাব্য বিপদের মোকাবিলা করতে সমর্থ হই।"

(ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ১৮৯-৫০)

"যেখানে ধর্মীয় চেতনা জাতিগত, ধর্মীয় সংস্থা শক্তিশালী এবং ধর্মের শিকড় উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত এ মাঠিতে তাঁর শিকড় পুরোপুরি প্রসারিত হতে পারে না বলে ধর্মহীন রাষ্ট্র উপলব্ধি করে, সেখানে সে ধর্মের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলার জন্যে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করে থাকে। পাকিস্তানের অবস্থা ঠিক এমনি ধরনের বলেই আমার ধারণা। এই কারণেই এদেশে কোনো ধর্মহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে ধর্মের চূড়ান্ত বিনাশের পরই তাঁর সংগঠন সম্ভব পর হবে। এমন কি কামাল আতাতুর্ক ও তাঁর সংগী সাথীরা যেমন তুরস্ক থেকে ধর্মের নিদর্শনাদি খতম করে দিয়েছিলো, তেমনি এদেশের ধর্মহীন নেতৃবৃন্দও এখান থেকে তামাম ধর্মীয় নাম নিশানা মুছে ফেলতে সচেষ্ট হবে।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং - ১৬১)

"সারা দুনিয়ার মুসলিম দেশসমূহে আমাদের আন্দোলন বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের পুস্তকাদি শুধু তাদের চিন্তাধারার ওপরই প্রভাব বিস্তার করেনি, তাদের আন্দোলন-গুলোকেও কার্যত প্রভাবিত করেছে। এম্নিভাবে সদ্য আজাদী প্রাপ্ত মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার দাবিকে জোরদার করে তুলেছে।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ১৬৯)

www.pathagar.com

"আপনাদের দৃষ্টিতে এই চারটি কাজেরই (৪দফা কর্মসূচি) সমান গুরুত্ব থাকা উচিত। এর কোনোটিকে অপর কোনোটির ওপর অগ্রাধিকার দেবার ভ্রান্ত ধারণা থেকে আপনাদের মন-মগজকে মুক্ত রাখা উচিত। এর কোনোটির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে আপনাদের বিরত থাকা উচিত। নিজেদের কর্মশক্তিকে যথা সম্ভব সমান অনুপাতে ঐ চারটি কাজের মধ্যে ভাগ করে দেয়ার মতো বুদ্ধিমত্তা আপনাদের মধ্যে থাকা দরকার। কোনো বিশেষ কাজের প্রতি অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়ার ফলে অন্য কাজ ব্যহত বা দুর্বল হয়ে পড়ছে কিনা, মাঝে মাঝে তা-ও যাচাই পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। এমি বিচার বুদ্ধি ভারসাম্যমূলক চিন্তা আর সমানুপাতিক কাজের মাধ্যমেই আপনারা আপনাদের নির্ধারিত জীবন লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ২০৬)

"প্রথমত, আপনারা এ দেশে ইসলামী জীবনর পদ্ধতি কায়েম করতে ইচ্ছুক এবং তাঁর জন্যে নেতৃত্বের পরিবর্তন অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত, আপনারা যে দেশে কাজ করছেন, সেখানে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।আর সে ব্যবস্থায় নেতৃত্বের পরিবর্তন একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন।

তৃতীয়ত, একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বসবাস করে নেতৃত্বের পরিবর্তনের জন্যে কোনো অনিয়মতান্ত্রিকপন্থা অবলম্বন করা শরীয়াত অনুযায়ী আপনাদের পক্ষে নাজায়েজ। আর এজন্যেই জামায়াতের গঠনতন্ত্র আপনাদের ঈপ্সিত সংশোধন ও বিপ্লবের জন্যে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করা আপনাদের প্রতি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ২১২)

"লোকদের নামাযী, পরহেজগার, ঈমানদা ও সংশোধনকামী হওয়া এক কথা আর চূড়ান্ত ফায়সালার সময় বিদ্বেষ, প্রলোভন, ভয়-ভীতি ও প্রতাঁরণা থেকে মুক্ত হয়ে কার্যত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পাল্লাকে ভারী করার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা কথা। প্রথম শ্রেণীর সাধারণ সংশোধনের কাজ আপনারা যতো খুশি এবং যতো ব্যাপক ভিত্তিতে চান, করতে থাকুন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কতো লোক এই চূড়ান্ত পর্যায়ের সংশোধনকে কবুল করেছে, তা শুধু ফায়সালার সময়ই জানা যেতে পারে। আর সে ফায়সালার সময় আসে নির্বাচনেরই মওসুমে। এই মানদন্ডই কয়েক বছর অন্তত সমাজের মনোভংগী ও নৈতিকতাঁর প্রকৃত অবস্থা এবং তাঁর ভাল-মন্দের প্রতিটি দিক মেপে জুখে দেখিয়ে দেয়। এ এক ধরণের আদমশুমারী আপনাদের সমাজে কয়জন ভোট বিক্রয়কারী রয়েছে, ক'জন চাপের সামনে নতিস্বীকার করেছে, কয়জন প্রতাঁরণার স্বীকার হয়েছে, কয়জন বিদ্বেষে লিপ্ত, ক'জন অনৈসলামী মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত, কি পরিমান দুর্নীতি এখানে প্রচলিত এবং এদের মধ্যে ক'জনকে আপনারা প্রকৃত ইসলামী

www.pathagar.com

রাষ্ট্রব্যবস্থার সহায়তাঁর জন্যে তৈরি করতে পেরেছেন এর প্রতিটি বিষয়ই এ আদমশুমারী হিসেব করে বাতলে দেয়।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ২২০)

আমাদের দেশে জামায়াতে ইসলামীর বাইরেও ধর্মহীনতাঁর বিরোধি ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সমর্থক ব্যক্তি এবং দলের অস্তিত্ব রয়েছে। ধর্মহীন শক্তিগুলোর মুকাবেলায় এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যাতে ঐক্য ও পারস্পরিক সহযোগিতাঁর মনোভাব গড়ে উঠে এবং তাদের শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধাচারণে ব্যয়িত হয়ে ইসলাম বিরোধি শক্তিগুলোর জন্যে সহায়ক না হয় তাঁর আকাংখা ও প্রচেষ্টা পূর্বের ন্যায় আজো আমাদের মধ্যে থাকা উচিত। বিশেষত ভাবী পরিষদসমূহে আমাদের পার্লামেন্টারী পার্টিকে একাকীই যাতে ইসালামী দৃষ্টিভংগীর প্রতি সমর্থন দান করতে না হয়, বরং এই কাজে তাঁর সহায়তা করার জন্যে বাইরের যথেষ্ট সংখ্যক লোক সেখানে বর্তমান থাকে তজ্জন্যে আসন্ন নির্বাচনেও আমাদের এই ঐক্য ও সহযোগিতাঁর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এ জন্যেই যেসব আসনে আমরা সরাসরি নির্বাচনী প্রতিদ্বিসিন্দ্বতায় অংশগ্রহণ করছি না, সেখানে আমাদের শক্তির অপচয় হবার পরিবর্তে কোনো ইসলাম পন্থী ব্যক্তি বা দলের স্বপক্ষে ব্যয়িত হোক, এটাই আমরা মনে প্রাণে কামনা করবো। শুধু তাই নয়, সেখানে ব্যক্তিগতভাবে কোনো সৎ এবং উপযুক্ত লোককে দাঁড়াবার জন্যে আমরা পরামর্শ দোবো এবং নিজেদের সাহায্যসমর্থন দ্বারা তাকে পাশ করিয়ে নেবারও চেষ্টা করবো। এজন্যে শুধু শর্ত থাকবে এই যে, সংশ্লিষ্ট আসনে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে এবং তাঁর নির্বাচনী প্রচেষ্টার সমস্ত বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপানো যাবে না।" (ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ২৪৩)

"আমার মতে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে সমসাম য়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের কর্মনীতিতে প্রয়োজনীয় রদবদল না করা পর্যন্ত কোনো দল বা জামায়াত শুধু এ যুগে নয়, কোনো যুগেই জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযোগী হতে পারে না। "ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচি-আবুল আলা মওদুদী: পৃষ্ঠা নং ২৪৪

নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ফলাফল

রুকন সম্মেলনে সর্ব পর্যায়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করার পরের বছর '৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারী হয়। ফলে ১৯৫৯ সালে দেশব্যাপী জনগণের ভোটে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন বানচাল হয়ে যায়। আইয়ুব খান 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে এক অদ্ভুত গণতন্ত্র চালু করেন। তিনি ১৯৬২ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ঘোষণা দেন। তিনি জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকার হরণ করে কেবলমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারদের ভোটাধিকার প্রদান করেন। তিনি তাদের নাম দেন B.D অর্থাৎ (Basic Democrat) ঐ সালে B.D (Basic Democrat) সিস্টেমে

www.pathagar.com

জামায়াতের কয়েকজন নেতৃবৃন্দ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। তম্মধ্যে নিম্নোক্ত চারজন M.N.A (Member of National Assembly) নির্বাচিত হন।

১. জনাব আব্বাস আলী খান- বগুড়া।

২. জনাব সামসুর রহমান - খুলনা।

৩. মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ- বাগেরহাট।

৪. ব্যারিষ্টার আখতাঁর উদ্দিন - ঝালকাঠি।

ঐ বছর দুইজন M.P.A (Member of Provincial Assembly) নির্বাচিত হন।

১. মাওলানা আব্দুল আলী - ফরিদপুর।

২. মাওলানা আব্দুস সোবহান- পাবনা।

তাঁরপর জনগণের ভোটে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অখণ্ড পাকিস্তানের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের বিবরণ আগে প্রদান করা হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ও জামায়াতের অংশ গ্রহণ

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর '৭২ সালে সংবিধান রচিত হয়। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ইসলামের নামে রাজনৈতিক দল গঠন করা আইন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। যেহেতু এ সময় জামায়াত বেআইনী ছিল তাই নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। '৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান সামরিক ফরমান (Proclamation) বলে ৫ম সংশোধানী জারী করেন । অতঃপর গণভোটের মাধ্যমে এ সংশোধনী অনুমোদিত হয়। সংশোধনী গৃহীত হবার পর ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন করার নিষেধাজ্ঞা ওঠে যায়। তখন সাবেক জামায়াত নেতৃবৃন্দ সমমনা লোকদের সাথে একত্রিত হয়ে IDL (Islamic Democratic League) গঠন করেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ৩য় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আইডিএল, মুসলিম লীগের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে আইডিএল-এর হয়ে জামায়াত নেতৃবৃন্দ যারা জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন:

১. মাওলানা আব্দুর রহীম - বরিশাল।

২. মাস্টার মো.শফিকুল্লাহ - লক্ষ্মীপুর।

৩. অধ্যাপক সিরাজুল হক - কুড়িগ্রাম।

৪. অধ্যাপক রেজাউল করীম - গাইবান্ধা।

৫. মাওলানা নুরুন্নবী ছামদানী - ঝিনাইদহ।

৬. এ.এস.এম মোজাম্মেল হক - ঝিনাইদহ।

এ সময় সিলেটে আইডিএল-এর প্রার্থী হয়ে নিম্নোক্ত জামায়াত নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন:

১. জনাব সামসুল হক- কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ।

২. এডভোকেট আব্দুল মুকিত - সিলেট সদর।

৩. মৌলভী ফজলুর রহমান - বালাগঞ্জ ও বিশ্বনাথ।

www.pathagar.com

৪র্থ জাতীয় সংসদ

৪র্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ৭ মে। নির্বাচনের আগে '৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ স্বনামে আত্মপ্রকাশ করে। এ নির্বাচনে জামায়াত অংশ গ্রহণ করে। ৪র্থ জাতীয় সংসদে জামায়াতের নমিনী যারা এম.পি নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন:

১. অধ্যাপক মুজিবুর রহমান - রাজশাহী -১
২. জনাব কাজী সামসুর রহমান - সাতক্ষীরা-২
৩. জনাব জবান উদ্দিন আহমদ- নীলফামারী -৩
৪. মাওলানা আব্দুর রহমান ফকীর - বগুড়া-৬
৫. জনাব মীম ওবায়েদ উল্লাহ - নবাবগঞ্জ-২
৬. জনাব লতিফুর রহমান - নবাবগঞ্জ-৩
৭. জনাব আব্দুল ওয়াহেদ - কুষ্টিয়া -২
৮. জনাব এ.এস.এম মোজাম্মেল হক -ঝিনাইদহ-৩
৯. এডভোকেট নূর হোসাইন - যশোর -১
১০. জনাব মকবুল হোসাইন - যশোর

১০জন এম.পি. নির্বাচিত হওয়ায় জামায়াত জাতীয় সংসদে পার্লামেন্টারী গ্রুপের মর্যাদা লাভ করে। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান পার্লামেন্টারী গ্রুপের লিডার নির্বাচিত হন।

এ নির্বাচনে সিলেট অঞ্চল থেকে যারা জামায়াতের নমিনী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁরা হলেন:

১. অধ্যাপক ফজলুর রহমান - সিলেট-৬, বিয়ানী বাজার ও গোলাপগঞ্জ।
২. মাওলানা ফরীদ উদ্দিন চৌধুরী-সিলেট-৫, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ।
৩. জনাব সিরাজুল ইসলাম মতলিব-মৌলভীবাজার-৪ শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ।
৪. জনাব মাস্টার আব্দুল মান্নান - মৌলভীবাজার-১, বড়লেখা।

৫ম জাতীয় সংসদ

৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯১ সালে। এ নির্বাচনে জামায়াতের নমিনী হিসেবে যারা এম.পি. নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন:

১. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী- পাবনা-১
২. মাওলানা আব্দুস সোবহান - পাবনা-৫
৩.মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী -দিনাজপুর-৬
৪. মাওলানা শাহাদাতুজ্জামান -বগুড়া-২
৫. মাওলানা নাসির উদ্দিন - নওগা -৪
৬. মাওলানা আবু বকর শেরকলী - নাটোর -৩

www.pathagar.com

৭. জনাব লতিফুর রহমান - নবাবগঞ্জ -৩

৮. মাওলানা হাবিবুর রহমান -চুয়াডাঙ্গা-২

৯. মাওলানা শাখাওয়াত হোসাইন - যশোহর - ৪

১০. মুফতী মাওলানা আব্দুস সাত্তার - বাগেরহাট-৪

১১. অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস -খুলনা -৬

১২. এডভোকেট শেখ আনসার আলী -সাতক্ষীরা -১

১৩. জনাব কাজী সামসুর রহমান সাতক্ষীরা -২

১৪. মাওলানা এ.এস.এম রিয়াছত আলী -সাতক্ষীরা-৩

১৫. জনাব গাজী নজরুল ইসলাম -সাতক্ষীরা-৫

১৬. ডা.এ.কে.এম আমজাদ - রাজবাড়ি -২

১৭. জনাব শাহজাহান চৌধুরী - চট্টগ্রাম-১৪

১৮. জনাব এনামুল হক - কক্সবাজার-১

** এখানে উল্লেখ্য যে, মাওলানা শাখাওয়াত হোসাইন এম.পি. পরবর্তীতে জামায়াত ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগদান করেন।**

এ সংসদে পুরুষ এম.পিদের ভোটে জামায়াতের দু'জন মহিলা এম.পি. নির্বাচিত হন।

১. হাফেজা আসমা খাতুন।

২. বেগম খন্দকার রাশেদা খাতুন।

৫ম সংসদে জামায়াতের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এম.পি.। জামায়াতের এম.পিদের লিখিত সমর্থন লাভ করে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি সাহাব উদ্দীন আহমদ বেগম খালেদা জিয়াকে সরকার গঠনের আহবান জানান।

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট অঞ্চলে জামায়াতের পক্ষ থেকে যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁরা হলেন:

১. অধ্যাপক ফজলুর রহমান- সিলেট-৬ (বিয়ানী বাজার ও গোলাপগঞ্জ)।

২. মাওলানা ফরীদ উদ্দিন চৌধুরী-সিলেট-৫ (কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ)।

৩. জনাব আব্দুল বাসিত -সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা ও ফেঞ্চুগঞ্জ)।

৪. 'এডভোকেট লুৎফুর রহমান জায়গীরদার-সিলেট-২ (বালাগঞ্জ ও বিশ্বনাথ)।

৫. জনাব ডা.শফিকুর রহমান - সিলেট-১ (সদর ও কোম্পানি গঞ্জ)।

৬. দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব - মৌলভীবাজার-৪ (শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ)।

৭. জনাব আব্দুল মালিক -মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা)।

৮. সৈয়দ জে শাহ আলম হোসাইন এডভোকেট - হবিগঞ্জ-৩ (সদর ও লাখাই)।

www.pathagar.com

৯. মাওলানা ফজলুল করীম আযাদ -হবিগঞ্জ-২ (আজমিরিগঞ্জ ও বানিয়াচং)।
১০. মাওলানা সিরাজ উদ্দিন - সুনামগঞ্জ-৫ (ছাতক ও দোয়ারা)।
১১. মাওলানা সাজিদুর রহমান-সুনামগঞ্জ-৪ (সদর উত্তর ও বিশ্বম্ভরপুর)।
১২. মাওলানা মোসলেহ উদ্দিন -সুনামগঞ্জ-১
(জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, ধর্মপাশা ও মধ্যনগর)

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ

৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামীসহ সকল বিরোধিদল এ নির্বাচনে বয়কট করে। এ সংসদ খুবই স্বল্প স্থায়ী হয়। সংসদে কেয়ার টেকার সরকার বিল পাস করে মন্ত্রীসভা গঠনের ১৩দিন পর সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৭ম জাতীয় সংসদ

৭ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালের জুন মাসে। এ সংসদের জামায়াতের নমিনী হিসেবে যারা এম.পি. নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন:

১. মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী-পিরোজপুর-১।
২. জনাব কাজী সামসুর রহমান-সাতক্ষীরা -২।
৩. জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী-নিলফামারী-৩।

নির্বাচনের পর জাতীয় পার্টির সমর্থন লাভ করে শেখ হাসিনার সরকার গঠন করেন।

এ নির্বাচনে সিলেট অঞ্চলে জামায়াতের পক্ষ থেকে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

১. মাওলানা হাবিবুর রহমান-সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ)
২. মাওলানা ফরীদ উদ্দিন চৌধুরী-সিলেট-৫ (কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ)।
৩. মাস্টার আব্দুল মান্নান-সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুর)
৪. জনাব আব্দুল বাসিত -সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা ও ফেঞ্চুগঞ্জ)।
৫. জনাব আব্দুল হান্নান-সিলেট-২ (বালাগঞ্জ ও বিশ্বনাথ)।
৬. জনাব ডা.শফিকুর রহমান - সিলেট-১ (সদর ও কোম্পানিগঞ্জ)
৭. জনাব আব্দুল মালিক -মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা)।
৮. জনাব খন্দকার আব্দুস সোবহান-মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া)।
৯. দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব -মৌলভীবাজার-৩
(মৌলভীবাজার ও রাজনগর)
১০. জনাব আব্দুল গনি তরফদার -মৌলভীবাজার-৪ (শ্রীমঙ্গল ও কমলগঞ্জ)।
১১. গোলাম রহমান চৌধুরী এডভোকেট-হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ ও বাহুবল)
১২. অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ উদ্দিন -হবিগঞ্জ-২ (আজমিরীগঞ্জ ও বানিয়াচং)
১৩. সৈয়দ জে শাহ আলম হোসাইন এডভোকেট-হবিগঞ্জ-৩ (সদর ও লাখাই)।
১৪. মাওলানা মখলিসুর রহমান -হবিগঞ্জ-৪ (চুনারুঘাট ও মাধবপুর)।
১৫. মাওলানা মোসলেহ উদ্দিন -সুনামগঞ্জ-১

www.pathagar.com

(জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, ধর্মপাশা ও মধ্যনগর)।

১৬. জনাব আব্দুল মান্নান -সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই ও শাল্লা)।

১৭. মাওলানা সৈয়দ সালেহ আহমদ-সুনামগঞ্জ-৩ (জগন্নাথপুর ও সদর দক্ষিণ)।

১৮. জনাব হাতিমুর রহমান - সুনামগঞ্জ-৪ (সদর উত্তর ও বিশ্বম্ভরপুর)।

১৯. জনাব আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সালেহ - সুনামগঞ্জ-৫ (ছাতক ও দোয়ারা)।

মাওলানা ফরীদ উদ্দিন চৌধুরী কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ আসন থেকে প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিজয় হাইজ্যাক করা হয়। প্রথমে রেডিও বাংলাদেশ থেকে সিলেট-৫ আসন থেকে মাওলান ফরীদ উদ্দিন চৌধুরীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। পরদিন আওয়মী লীগ প্রার্থী হাফিজ আহমদ মজুমদারকে রেডিও টেলিভিশন থেকে ফলাফল পাল্টিয়ে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনী ফলাফল শীটে ঘষামাজা করে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে হাফিজ আহমদ মজুমদারের বাড়ির নির্বাচনী কেন্দ্রে সমস্যা সৃষ্টি করে ঐ কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত করা হয়। পরে ঐ কেন্দ্রে অন্যান্য প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদেরকে বাহির করে একচেটিয়া ভোট প্রদান করে হাফিজ আহমদ মজুমদারকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। পরে মাওলানা ফরীদ উদ্দিন চৌধুরীর পক্ষ থেকে নির্বাচনী ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করা হয়। যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল তাই তাঁরা নানা টালবাহানা করে মামলার নিস্পত্তি না করে মেয়াদ পার করে দেয়।

৮ম জাতীয় সংসদ

৮ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর। এ নির্বাচনে জামায়াত জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে। জোটে যারা ছিলেন তাঁরা হলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি নাজিউর গ্রুপ ও ইসলামী ঐক্যজোট। এ নির্বাচনে জামায়াতের নমিনী যারা নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন:

১. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী- পাবনা-১।

২. মাওলানা আব্দুস সোবহান-পাবনা-৫।

৩. অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল কাফি-দিনাজপুর-১।

৪. মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী -দিনাজপুর-৬।

৫. জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী- নীলফামারী -৩।

৬. মাওলানা আব্দুল আজীজ-গাইবান্দা-১।

৭. মাওলানা এ.এস.এম শাহাদাত হোসাইন-যশোর-২।

৮. মুফতী মাওলানা আব্দুস সাত্তার-বাগেরহাট-৪।

৯. অধ্যাপক মিয়া গোলাপ পরওয়ার -খুলনা -৫।

১০. অধ্যক্ষ শাহ মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস -খুলনা-৬।

১১. অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক -সাতক্ষীরা-২।

১২. মাওলানা এ.এস.এম রিয়াছত আলী-সাতক্ষীরা - ৩।

www.pathagar.com

১৩. গাজী নজরুল ইসলাম-সাতক্ষীরা-৫।

১৪. মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী-পিরোজপুর-১।

১৫. মাওলানা ফরীদ উদ্দিন চৌধুরী-সিলেট-৫।

১৬. ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের-কুমিল্লা-১২।

১৭. শাহজাহান চৌধুরী- চট্টগ্রাম-১৪।

জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ৪জন মহিলা এম.পি হলেন :

১৮. ডা.আমিনা শফিক-সিলেট।

১৯. সুলতানা রাজিয়া-জামালপুর।

২০. শাহানা বেগম-রাজশাহী।

২১. বেগম রোকেয়া আনসার-সাতক্ষীরা।

নির্বাচনের পর বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪দলীয় জোট সরকার গঠিত হয় আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুজাহিদ কেবিনেট মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

এ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীকে সিলেট অঞ্চলে মাত্র দুটি আসন দেওয়া হয়। একটি হল সিলেট-৫ (কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ) । এ আসনে মাওলানা ফরীদ উদ্দিন চৌধুরী বিপুল ভোটে বিজয়ী হন। অন্য আসন ছিল মৌলভীবাজার -২ (কুলাউড়া)। এ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ডা.শফিকুর রহমান। অবশ্য এ আসনে বিজয় লাভ করা সম্ভব হয় নি।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয় ২২ জানুয়ারি ২০০৭. নির্বাচনের প্রাক্কালে সংবিধান মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার সৃষ্টির সুযোগ করে দেবার জন্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৭ অক্টোবর'০৭ রাতে জাতীর উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনে একযোগে বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেন। পরদিন ২৮ অক্টোবর ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। নির্বাচনের আগে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪দলীয় জোট এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট গঠিত হয়।

বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষের দলগুলো হল :

১. বিএনপি

২. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

৩. জাতীয় পার্টি (নাজিউর ও মতিন গ্রুপ)

৪. ইসলামী ঐক্যজোট (মাওলানা ফজলুল হক আমিনী ও মাওলানা ইসহাক গ্রুপ)

অন্যদিকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোটের দলগুলো হল :

১. আওয়ামী লীগ।

২. ১১দলীয় বাম জোট।

www.pathagar.com

৩. এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পার্টি।
৪. ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও অলি আহাদের নেতৃত্বাধীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি।
৫. ড.কামাল হোসেনের গণফোরাম।
৬. মাওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যজোট।
৭. নজিবুল বাশার মাইজভান্ডারীর নেতৃত্বে তরিকত ফেডারেশন।

শেখ হাসিনা উপলব্ধি করেন তাঁর নেতৃত্বাধীন মহাজোট নির্বাচনে জিততে পারবে না। জনমত যাচাইর বিভিন্ন জরিপ এবং প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের মাধ্যমে তাঁর এ উপলব্ধি হয়। ফলে তিনি দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্টের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে শেখ হাসিনার সমর্থক জোট দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে। ২৭ তারিখ বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর বিদায়ী ভাষণ শেষ হবার সাথে সাথে পরিকল্পিত বিক্ষোভ, অগ্নি সংযোগ, ভাঙ্গচুর ও লুটতরাজ আরম্ভ হয়। লগি বৈঠা, বোমা ও ককটেল ইত্যাদি সংযোগে রাস্তায় অবস্থান করে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। ২৮ তারিখ বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেইটে জামায়াত শিবিরের ৫জন নিরস্ত্র কর্মীকে রাস্তায় পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ দৃশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া প্রদর্শন করে। দেশে বিদেশে সর্বত্র ধিক্কার জানানো হয়। এমনকি জাতিসংঘের বিদায়ী সেক্রেটারী জেনারেল কফি আনান এ দৃশ্য দেখে বিচলিত হন। তিনি বিবৃতির মাধ্যমে এ বর্বরতাঁর নিন্দা করেন এবং সংযম অবলম্বনের আহবান জানান । তাঁরপরও অরাজকতা চলতে থাকে। ২৭অক্টোবর থেকে ২নভেম্বর পর্যন্ত কেবল মাত্র জামায়াত শিবিরের ১৩ জন কর্মীকে শহীদ করা হয়। হরতাল অবরোধ চলতে থাকে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও সীমান্তবর্তী স্থল বন্দরসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিরোধিতাঁর মুখে সংবিধান অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কে.এম. হাসান দায়িত্ব গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম.এ আজিজ ৩মাসের ছুটি নিতে বাধ্য হন। উভয় জোটের সম্মত ব্যক্তি না পেয়ে প্রেসিডেন্ট নিজেই সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শেখ হাসিনা প্রথমে তাঁকে সমর্থন জানান । পরে তাঁর কথামত সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় দেশের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলন চালিয়ে যান। প্রেসিডেন্ট ভবন ঘেরাও করে রাখা হয়। শেখ হাসিনার সহযোগিতায় কয়েকটি এনজিও এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূত বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার রাষ্ট্রদূতগণ ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেন। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার ইশারায় জাতিসংঘের নতুন সেক্রেটারী জেনারেল বান কি মুন নির্বাচন স্থগিতের আহবান জানিয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। প্রেসিডেন্ট পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিন বাহিনীর প্রধানের সাথে পরামর্শ করে নির্বাচন বাতিল করেন এবং দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। তিনি বিশ্বব্যাংকের সাবেক আমলা ড. ফখরউদ্দিন আহমদকে প্রধান উপদেষ্টা করে নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। বস্তুত সৌভিয়েত রাশিয়া ভেঙে

www.pathagar.com

যাবার পর ইসলাম ও মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি ভাবতে শুরু করে। ইহুদি ও খ্রিস্টবাদী শক্তি ইসলামকে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বিভিন্ন লেবেল লাগিয়ে তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে চলছে। ইদানিং তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ব্রাহ্মণবাদী গোষ্ঠি। এই জোট মুসলিম দেশ গুলোর অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতা বিনষ্টের এবং ঐ সমস্ত দেশের আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ লুট করার চক্রান্ত ঐক্যবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তাঁরা মুসলিম দেশসমূহের অভ্যন্তরে এনজিও, মিডিয়া, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাদের এজেন্ট তৈরি করছে। বাংলাদেশে এক শ্রেণীর পরজীবী, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী মিডিয়া, এনজিও তাদের বিদেশী প্রভুদের ইশারায় দেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উস্কানীতে দেশে অরাজক পরিস্থিতি ও আইন অমান্য আন্দোলন বেগবান হয়। তাদের প্ররোচনায় শেখ হাসিনা সংবিধান বহির্ভূত বক্তব্য দিতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, "৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচন বাধ্যতামূলক নয়। জনগণের জন্য সংবিধান। সংবিধানের জন্য জনগণ নয়।" বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থের ধারক ও বাহক ড.কামাল হোসেন ও তাঁর হুকুম তামিলকারী আইনজীবীগণ শেখ হাসিনার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন শুরু করে দেন। ফলে দেশের সংবিধান বহির্ভূত বক্তব্য ও প্রচলিত আইন বিরোধি আন্দোলনের মাধ্যমে পরিকল্পিত পন্থায় দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা হয় এবং অর্থনীতি পঙ্গু হবার উপক্রম হয়। যার ফলশ্রুতিতে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল হয়ে যায় এবং দেশে জরুরী অবস্থা জারি হয়।

একনজরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিবৃন্দ

নং	নাম	মেয়াদকাল	মন্তব্য
০১	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	১৭ জুলাই '৭১-৯ জানুয়ারি-১৯৭২	ভারপ্রাপ্ত
০২	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১২ জানুয়ারি '৭২-২৩ ডিসেম্বর-১৯৭৩	
০৩	মোহাম্মদ উল্লাহ	২৩ডিসেম্বর '৭২-২৫ জানুযারি-১৯৭৫	
০৪	শেখ মুজিবুর রহমান	২৫ জানু '৭৫-১৫ আগস্ট -১৯৭৫	
০৫	খন্দকার মোশতাঁর আহমেদ	১৬ আগস্ট' ৭৫-৫ নভেম্বর-১৯৭৫	
০৬	বিচারপতি এ.এস.এম সায়েম	৬ নভেম্বর '৭৫-২০ এপ্রিল-১৯৭৭	

www.pathagar.com

০৭	লে.জেনারেল জিয়াউর রহমান	২০ এপ্রিল '৭৭-৩০ মে-১৯৮১	
০৮	বিচারপতি আব্দুস সাত্তার	৩০ মে '৮১-২০ নভেম্বর-১৯৮১	অস্থায়ী
০৯	বিচারপতি আব্দুস সাত্তার	২০ নভেম্বর '৮১-২৩ মার্চ-১৯৮২	নির্বাচিত
১০	বিচারপতি এ.এফ.এম আহসান উদ্দিন চৌধুরী	২৪ মার্চ '৮২-১০ ডিসেম্বর - ১৯৮৩	
১১	লে.জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ	১০ ডিসেম্বর '৮৩-৬ ডিসেম্বর-১৯৯০	
১২	বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ	৬ ডিসেম্বর '৯০-৮ অক্টোবর-১৯৯১	অস্থায়ী
১৩	আব্দুর রহমান বিশ্বাস	৮ অক্টোবর '৯১-৮ অক্টোবর-১৯৯৬	
১৪	বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ	৮ অক্টোবর '৯৬-১৪ নভেম্বর-২০০১	
১৫	অধ্যাপক ডা. এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৫ নভেম্বর '০১-২১ জুনযারি-২০০১	
১৬	ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার	২১ জুন '০২-৫ সেপ্টেম্বর-২০০২	ভারপ্রাপ্ত
১৭	অধ্যাপক ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমদ	৬ সেপ্টেম্বর -২০০২-	

একনজরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীবৃন্দ

নং	নাম	মেয়াদকাল	মন্তব্য
০১	তাজ উদ্দিন আহমদ	১০ এপ্রিল '৭১-১২ জানুয়ারি-১৯৭২	
০২	শেখ মুজিবুর রহমান	১২ জানু '৭২-২৫ জানুয়ারি-১৯৭৫	
০৩	এম মনসুর আলী	২৫ জানু '৭৫-১৫ আগস্ট - ১৯৭৫	
০৪	লে.জেনারেল জিয়াউর রহমান		প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক
০৫	শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান	১৫ এপ্রিল '৭৯-২৩ মার্চ - ১৯৮২	

০৬	লে.জে.হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ		প্রধান সামরিক প্রশাসক
০৭	আতাউর রহমান খান	৩০ মার্চ '৮৪-১৫ জানুয়ারি-১৯৮৫	
০৮	ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	২৭ মার্চ '৮৮-১২ আগস্ট-১৯৮৯	
০৯	কাজী জাফর আহমদ	১২ আগস্ট '৮৯-৬ ডিসেম্বর-১৯৯০	
১০	বিচারপতি শাহাব উদ্দিন আহমদ		প্রধান উপদেষ্টা অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার
১১	বেগম খালেদা জিয়া	২০ মার্চ '৯১-৩০ মার্চ ১৯৯৬	
১২	বিচারপতি হাবিবুর রহমান		প্রধান উপদেস্টা, তত্ত্বধায়ক সরকার।
১৩	শেখ হাসিনা	২৩ জুন '৯৬-১৪ জুলাই-২০০১	
১৪	বিচারপতি লতিফুর রহমান		প্রধান উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার
১৫	বেগম খালেদা জিয়া	১০ অক্টোবর ০১-২৮অক্টোবর-২০০৬	
১৬	অধ্যাপক ড.ইয়াজ উদ্দিন আহমদ	২৯ অক্টোবর '০৬ থেকে ১০জানুয়ারি ২০০৭	প্রধান উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার
১৭	ড.ফখর উদ্দিন আহমদ	১১জানুয়ারি ২০০৭-	প্রধান উদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার

www.pathagar.com

উপজেলা নির্বাচন

জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা এবং বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সশস্ত্র বাহিনী প্রধান লে.জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ হ্যাঁ, না ভোটের প্রহসনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর ১৯৮৪ সালে সব মহকুমাগুলো জেলায় এবং সব থানাগুলোকে উপজেলায় রূপান্তরিত করেন। ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদের মাঝখানে উপজেলা পরিষদ নামে স্থানীয় সরকারের নতুন একটি স্তর তৈরি করেন। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ঐ উপজেলার প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হবার বিধান রাখা হয়। . . . . সালে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জামায়াত সিলেট অঞ্চলে বালাগঞ্জ উপজেলায় জামায়াত কর্মী মৌলভী ফজলুর রহমান উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বড়লেখা উপজেলার জনাব আব্দুল মাজেদ চৌধুরী উপজেলা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। তবে তিনি বিজয় লাভ করতে সমর্থ হন নাই।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার নির্বাচন

২০০৩ সালে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১নং ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াত কর্মী জনাব আজিজুল হক মানিক। মৌলভীবাজার পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন জামায়াত কমী জনাব সারমাজ হাবীব চৌধুরী (মুক্তি)। ছাতক পৌরসভার একজন জামায়াত কমিশনার পদে নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি হলেন মো.ফয়জুর রহমান। ২০০৮ সালের সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ১ নং ওয়াডে আজিজুল হক মানিক, ২ নং ওয়ার্ডে রাজিক আহম্মেদ, ২৭ নং ওয়ার্ডে আব্দুল জলিল নজরুল কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। গোলাপগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে কাউন্সিলার নির্বাচিত হন জামাতের কর্মী মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ও জালাল আহম্মেদ। শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভার কমিশনার হিসেবে নির্বাচিত হন মাওলানা আবু তাহরে ও আ.স.ম. আফজল আলী।

ইউনিয়ন নির্বাচন

ইউনিয়ন নির্বাচনে সিলেট অঞ্চলে সর্বপ্রথম যিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিশেষ অবদান রেখে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করেন তিনি হলেন মরহুম সামসুল হক। তিনি ১৯৬০সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কানাইঘাট থানার ঝিঙ্গাবাড়ী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। আজ পর্যন্ত সিলেট অঞ্চলে জামায়াতের কর্মী হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন যারা তাঁরা হলেন :

নং	নাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	মন্তব্য
০১	জনাব সামসুল হক	ঝিঙ্গাবাড়ি	কানাইঘাট	
০২	মৌলভী ফজলুর রহমান	দয়ামীর	বালাগঞ্জ	
০৩	মাওলানা সুলায়মান আহমদ	জালালপুর	দক্ষিণ সুরমা	

www.pathagar.com

০৪	জনাব খাইরুন আফিয়ান চৌধুরী	লালাবাজার	দক্ষিণ সুরমা	
০৫	জনাব খলিলুর রহমান	নোয়াবই	ছাতক	
০৬	বদরুজ্জামান	পাথারিয়া	দক্ষিণ, সুনামগঞ্জ সদর	
০৭	মাও.আবু সালেহ মো. শফিকুর রহমান		চুনারুঘাট	
৮	জি.কে. মাসুক আহমদ জিহাদী	ইনাতগঞ্জ	নবীগঞ্জ	
৯	জনাব আকবর আলী	উত্তর শাহবাজ পুর	বড়লেখা	২বার নির্বাচিত
১০	জনাব আব্দুল জব্বার	দক্ষিণ শাহবাজ পুর	বড়লেখা	২বার নির্বাচিত
১১	জনাব আহমদ সুলায়মান	লক্ষ্মীপ্রসাদ পূর্ব	কানাইঘাট	
১২	জনাব ইসবাবুল ইসলাম	তিলপারা	বিয়ানীবাজার	
১৩	মাস্টার রফিক আহমদ	বাদেপাশা	গোলাপগঞ্জ	
১৪	আতাউর রহমান	সুজাতপুর	বানিয়াচং	

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়
শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন যারা

শহীদ সুহেল পারভেজ নঈম

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। জামায়াতের আত্মপ্রকাশের পর জামায়াত কর্মী যিনি শাহাদাতের পথে প্রথম কদম উঠালেন তিনি শহীদ সুহেল পারভেজ নঈম। তিনি বিয়ানীবাজার উপজেলার ঘুঙ্গাদিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুহাম্মদ দরাসিন আলীর তিন সন্তানের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। বিয়ানীবাজার হরগোবিন্দ হাই স্কুল থেকে সপ্তম শ্রেণী পাস করার পর তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় তিনি জজই পাশ করেন। সময়ের আগে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি মিডলিস্ট চলে যান। সেখান থেকে দেশে এসে স্থানীয় কাজীরবাজারে ব্যবসা আরম্ভ করেন। দাওয়াত কবুল করে তিনি জামায়াতে যোগদান করেন এবং খুবই আন্তরিকতাঁর সাথে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে থাকেন। তিনি খুবই সাহসী এবং এলাকায় প্রভাবশালী ছিলেন। তাকে স্থানীয় জামায়তের ইউনিট সহসভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১৯৮৬ সালের ৭ই মে দেশে ৪র্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াত প্রথম বারের মত স্বনামে এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এ নির্বাচনে সারাদেশে জামায়াতের ৭৬জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন সিলেট-৬ বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ আসনের প্রার্থী অধ্যাপক ফজলু রহমান। এ নির্বাচনে সুহেল পারভেজ নঈম অকুভোভয় সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি ঘোষণা করেন এ এলাকায় কেউ জাল ভোট দিতে পারবে না। আওয়ামী লীগের কর্মী বাহিনীর জালভোট দেওয়া তাদের মজ্জাগত অভ্যাস। তাঁরা যখন বুঝতে পারল নঈম জালভোট দিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তখনই তাঁরা তাঁর বাবা জনাব দরাছিন আলীকে গিয়ে বলল “চাচা আপনার ছেলেকে বলবেন সে যদি আমাদের পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে তবে তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে দেওয়া হবে।” তাঁর আব্বা ভয় পেয়ে ছেলেকে কথাগুলো বললে নঈম দৃঢ়তাঁর সাথে জবাব দেন “আমি ভীতু নই। দ্বীনের পথে প্রয়োজনে শহীদ হব তবুও বাতিলকে প্রশ্রয় দেব না ইনশাআল্লাহ।” তাঁর অলক্ষ্যে আল্লাহ তাঁর কথাগুলো শুনলেন এবং কবুল করলেন।

সুহেল পারভেজ নঈম বলিষ্ট ভূমিকায় তাঁর নির্বাচনী এলাকায় কেউ জাল ভোট দিতে সক্ষম হয় নি। আওয়ামী গুন্ডাবাহিনী এতে তাঁর প্রতি খুবই ক্ষেপে যায়। পরে ১০তারিখ রাত ৯ টায় নঈমকে তাঁর দোকানে অতর্কিত হামলা করে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে মারাত্মক আহত নঈমকে প্রথমে বিয়ানীবাজার সরকারি হাসপাতালে আনা হয়। কর্তব্যরত

www.pathagar.com

ডাক্তার তাঁর আঘাত গুরুতর দেখে তাকে সিলেট ওসমানী হাসাপাতালে নেবার পরামর্শ দেন।ওসমানী হাসপাতালে এনে তাঁর অপারেশন করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে।ঘটনাক্রমে ঐ সময় সারাদেশে ডাক্তার ধর্মঘট পালিত হচ্ছিল। ফলে সুচিকিৎসার স্বার্থে তাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার ক্রমাবনতি হয়। তাঁর চিকিৎসার সার্বিক দেখাশুনার দায়িত্বে ছিলেন ডাক্তার শফিকুর রহমান। ভাই নঈম ২২ তারিখ বাদ মাগরিব ডা.শফিক সাহেবকে বললেন -"ডা.সাহেব আমার জন্য পেরেশান হবেন না। শহীদ হবার সুযোগ পাওয়া বড়ই মুশকিল। আমি শহীদ হতে চাই। দোয়া করবেন আল্লাহ যেন শহীদ হিসেবে আমাকে কবুল করেন।" পরদিন ২৩ তারিখে সকাল ৭টায় তিনি শাহাদতের পেয়ালা পান করে ধরাধাম থেকে বিদায় নেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

ঐ দিন অপরাহ্নে বিপুল ছাত্র জনতাঁর উপস্থিতিতে সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসার ময়দানে তাঁর নামাযে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর পর দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বিয়ানীবাজার হরগোবিন্দ হাইস্কুল প্রাঙ্গনে। অতঃপর তাঁর নিজ গ্রামে ৩য় নামাযে জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

তাঁর শাহাদাতে সমগ্র দেশে এক শোকাবহ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলা দেশের ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান সুহেল পারভেজ নঈমের হত্যাকান্ডে গভীর শোক ও নিন্দা জ্ঞাপন করে বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "ভোট ডাকাতির অবৈধ কাজ নির্ভীকভাবে বাধা দিতে দিয়ে শহীদ হয়ে জনাব পারভেজ সত্য ও ন্যায়ের পতাঁরা উর্ধে তুলে ধরার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এদেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের জন্য এ হত্যা মহান অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। হত্যা ও কোরবানীর বিনিময়েই হয়ত এ ভূখন্ডেই একদিন ইসলামী আন্দোলনকে আল্লাহপাক বিজয়ী হবার তৌফিক দান করবেন।" তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে এ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

তাঁর শাহাদাতে আরো যারা বিবৃতি প্রদান করেন তাঁরা হলেন:ইসলামী ছাত্র শিবিরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা বিয়ানীবাজারের সন্তান ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক, জামায়াতে ইসলামীর সিলেট জেলার আমীর অধ্যাপক ফজলুর রহমান, জেলার নায়েবে আমীর মাওলানা ফরীদ উদ্দিন চৌধুরী, জেলা সেক্রেটারী মাওলানা সামস উদ্দিন, জেলার রাজনৈতিক সেক্রেটারী মাওলানা ফজলুল করিম আযাদ, সদর উপজেলা সেক্রেটারী মাওলানা হাবিবুর রহমান, সিলেট শহর শাখার আমীর ডা. শাহ মাহবুবুস সামাদ, বিয়ানী বাজার উপজেলা আমীর জনাব মতিউর রহমান, ছাত্র শিবির সিলেট জেলা শাখার সভাপতি হাফেজ আবুল হোসাইন খান, সিলেট শহর শাখার সভাপতি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ও সেক্রেটারী ছায়েফ আহমদ প্রমুখ।

www.pathagar.com

সিলেট অঞ্চলে শহীদ সোহেল পারভেজের পথ ধরে আরো যারা শাহাদাতের পিয়ালা পান করেছেন তাঁরা হলেন:

নং	শহীদের নাম	শাহাদাতরে বছর	বাড়ি	মন্তব্য
১	শহীদ আব্দুস সালাম পিতা:জনাব আব্দুর রহমান	৭ নভেম্বর ১৯৮৮	বিশম্ভরপুর রুয়াখাল, সড়কের পার	শিবিরের নিবেদিত প্রাণ কর্মী। গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজের এ.জ.ই পরীক্ষার ফলপ্রার্থী এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবিরের প্যানেলে সমাজকল্যাণ সম্পাদক পথপ্রার্থী ছিলেন।
২	শহীদ আব্দুল করীম পিতা:জনাব আব্দুল কুদ্দুস	৮ডিসেম্বর ১৯৯৫	কানাইঘাট নভাই গ্রাম	এম.সি. বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দর্শন বিভাগের ২য় বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীর ছাত্র এবং শিবিরের সদস্য ও ১০ নং উপশহর ওয়ার্ডের সভাপতি ছিলেন।
৩	শহীদ আলিম আহমদ তাপাদার পিতা:	৫আগস্ট ১৯৯৭	বড়লেখা দক্ষিণ ভাগ	কুলাউড়া মনসুরিয়া সিনিয়র মাদরাসার আরবী বিভাগের প্রভাষক ও জামায়াত কর্মী।
৪	শহীদ আবু নাসের হাসান হাসিবুর রহমান মহসিন। পিতা: ইঞ্জিনিয়ার খলিলুর রহমান	২৩ মে ১৯৯৮	চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলা	সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস ২য় বর্ষের ছাত্র। ছাত্র শিবিরের উপশাখার সেক্রেটারী ছিলেন।

৫	শহীদ এনামুল হক দুদু। পিতা:জনাব আব্দুল ওয়াহাব	১লা জানুয়ারি ১৯৯৯	বালাগঞ্জ উপজেলার তাজপুর ইউনিয়নের খাসিপাড়া গ্রাম	তাজপুর ডিগ্রি কলেজের স্নাতক ২য় বর্ষের ছাত্র। শিবিরের সদস্য এবং বালাগঞ্জ উপজেলার সভাপতি ছিলেন।
৬	শহীদ আব্দুল মুনিম বেলাল। পিতা:জনাব আব্দুল মালিক	২৫ডিসেম্বর ১৯৯৯	দক্ষিণ সুরমা মেদেনী মহল গ্রাম	শাহজালাল জামেয়া ইসলামীয়া পাঠানটুলা কামিল মাদরাসার আলিম ক্লাসের ছাত্র ও শিবিরের কর্মী ছিলেন।
৭	শহীদ বেলাল পিতা:	১২মে ২০০৩	বড়লেখা	ফকীরের বাজার হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ও শিবিরের স্কুল শাখার সভাপতি ছিলেন।
৮	শহীদ মুহাম্মদ আলমাছ মিয়া। পিতা:জনাব মুহাম্মদ নাদির মিয়া	৯ডিসেম্বর ২০০৩সাল	কমলগঞ্জ আলেপুর গ্রাম	মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের ৩য় বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীর ছাত্র এবং শিবিরের কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।
৯	শহীদ শোয়েব আহমদ দুলাল। পিতা : জনাব আব্দুর রব।	১২ডিসেম্বর ২০০৫সাল	জৈন্তাপুর দরবস্ত এলাকার খড়িকাপুঞ্জি গ্রাম	এ.জ.ই. পরীক্ষার্থী, শিবিরের সাথী ও জৈন্তাপুর দক্ষিণ সাথী শাখার অফিস সম্পাদক।

১০. শহীদ সৈয়দ শাহজামাল চৌধুরী; শহীদদের আলোচনায় আরো একজন শহীদের উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ শহীদ হলেন সৈয়দ শাহজামাল চৌধুরী। তিনি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী আর্মীর হাতে ধৃত হন। তাঁরপর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

www.pathagar.com

সৈয়দ শাহজামাল চৌধুরী জগন্নাথপুর উপজেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম সৈয়দপুরে চৌধুরী বাড়ির মরহুম চৌধুরী আবুল বাশারের তৃতীয় সন্তান। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ:)এর ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম সাইয়েদ শাহ সামস উদ্দিন (র) এর বংশধর। বাল্যকাল থেকেই তাঁর আমল আখলাক ছিল উঁচু মানের। স্কুল ছাত্র অবস্থায় তিনি তাঁর আত্মীয় সাইয়েদ একরামুল হক সাহবের কাছ থেকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পান। দাওয়াত কবুল করে তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের সাথে জড়িত হন। এম.সি. কলেজ সিলেটে অধ্যয়নরত অবস্থায় ১৯৬৫ সালে তাঁর স্কন্ধে ইসলামী ছাত্র সংঘের সিলেটের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতাঁর সাথে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

বর্তমান আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী তখন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা ছিলেন। তাঁর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাবনাময় ছাত্র নেতাদের খোজ খবর নেওয়া এবং তাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলা।

মফস্বল এলাকায় ছাত্র নেতৃত্বের মধ্যে যারা চৌকষ ও নেচারাল নেতৃত্বের গুণাবলির অধিকারী তাদেরকে তিনি পরিকল্পিত পন্থায় ঢাকায় আনার ব্যবস্থা করতেন। সৈয়দ শাহজামাল চৌধুরী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বাছাইতে পড়ে যান। ফলে তাকে ঢাকায় আনা হয়।

১৯৬৯ সালের ১৫আগস্ট এ দেশের ইসলামী আন্দোলনের শহীদদের পথিকৃত শহীদ আব্দুল মালেকের শাহাদাতের পর সৈয়দ শাহজামাল চৌধুরী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর উপর অর্পিত হয় ইসলামী ছাত্র সংঘের ঢাকা মহানগরীরর দায়িত্ব। দায়িত্ব গ্রহণের দুই বছরের মধ্যে তিনিও শহীদ আব্দুল মালেকের পথ ধরে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। শাহাদাতের সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন।

১৯৭১ সালে ছাত্র সংঘের অফিস থেকে দায়িত্ব পালন শেষে রাতে যখন তিনি আবাসস্থলে ফিরছিলেন, তখন পাকিস্তানী আর্মী তাকে ধরে নিয়ে যায়। তাঁরপর শত পন্থায় হাজারো চেষ্টা করেও তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। ফলে সবাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, তিনি আর্মীর হাতে শহীদ হয়েছেন।

শহীদ সৈয়দ শাহজামাল চৌধুরী অত্যন্ত অমায়িক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আমল-আখলাক ছিল খুব উন্নত মানের। তিনি যোগ্য সংগঠন ও সুবক্তা ছিলেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি খুবই প্রশংসার যোগ্য ছিল। কর্মীদের সাথে তিনি খুব দরদপূর্ণ আচরণ করতেন। দাওয়াতী কাজে তাঁর জুড়ি ছিল না। বহু লোককে তিনি ইসলামী আন্দোলনে শরীক করেছেন। এ গ্রন্থ লেখকের ইসলামী আন্দোলনে যোগদান তাঁর প্রচেষ্টার ফসল।

আল্লাহু সোবহানাহু তায়ালা সৈয়দ শাহজামাল চৌধুরীর শাহাদাতসহ সকল শহীদানের শাহাদাত কবুল করুন। তাদের মর্যাদা উন্নততর করুন। নবী রসুল ও ছিদ্দিকানের পর তাদের স্থান দান করুন! আমীন।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা

১৯৭৯ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ মে ঢাকার হোটেল ইডেনে এক সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। তাঁরপর থেকে জামায়াত ৪দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে সারা দেশে তৎপরতা চালিয়ে যায়। সারাদেশের মত সিলেটে অঞ্চলেও জামায়াতের কার্যক্রম শুরু হয়। সাংগঠনিক কার্যক্রমের পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মসূচি তথা মিটিং মিছিল আরম্ভ হয় জামায়াতের আত্মপ্রকাশে ধর্মহীন, ধর্মনিরপেক্ষ বাম ও রামপন্থীরা খুবই নাখোশ হয়। সুযোগ পেলেই তাঁরা মিটিং মিছিলে হামলা চালাত। এ সময় তাঁরা জামায়াতের অফিসও ভাংচুর করেছে। এ সময় কোন কর্মসূচি বিশেষ করে মিটিং মিছিল বাস্তবায়ন করতে খুবই সর্তক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হত। কর্মসূচি বাস্তবায়নে আগে থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হত।

জামায়াতের আত্মপ্রকাশের বছর খানেক পরে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যার কারণে সারা দেশের মত সিলেট অঞ্চলেও জামায়াতের কার্যক্রম সীমিত হয়ে যায়। ঘটনাগুলো হল :

১. ১৯৮১ সালের ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রমনা গ্রীনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রথম বারের মত দেশভিত্তিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ২০হাজার কর্মী অংশ গ্রহণ করে। ৯ তারিখ শিবিরকর্মী দুই সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে একটি সুশৃঙ্খল মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। মিছিলটি ঢাকার প্রধান প্রধান রাজপথ প্রদক্ষিণ করে সবার নজর কাড়ে। পরদিন জাতীয় প্রায় সব দৈনিক পত্রিকায় রিপোর্ট করে শিবিরের ৫০হাজার কর্মী এ মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রকাশ্যে রাজপথে এ মিছিল বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষেপিয়ে তুলে।

২. মিছিলের ১০দিন পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির ২৬টি আসনের মধ্যে ভিপি, জি এস সহ ২৩টি আসনে জয়লাভ করে। পরদিন বিভিন্ন দৈনিকে বিশেষ করে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ভিপি জিএস এর ফটো সহ এ খবর ফলাও করে প্রকাশিত হয়। এতে বিরুদ্ধবাদীরা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে। ঐদিন সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি কর্নেল নুরুযযামান ও সেক্রেটারী নইম জাহাঙ্গীর সাংবাদিক সম্মেলন করে জামায়াত শিবির উৎখাতের ঘোষণা দেয় এবং জামায়াত শিবিরের স্থাপনা ও আস্তানা গুড়িয়ে দেবার আহবান জানায়। তাদের সাথে বাম ও রামপন্থীরা জিগির তুলে। পরদিন একুশে ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষ্যে সারাদেশে জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়।

৩. পরের মাস মার্চের ২৬ তারিখ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে কর্নেল নূরুযযামানের সভাপতিত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । এ সভায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে এক পর্যায়ে বলেন- রাজাকারদের আর সহ্য করা হবে না, তাদেরকে উৎখাত করতে হবে।" এই বক্তব্যের

www.pathagar.com

পর সারাদেশের মত সিলেটেও জামায়াত শিবির উৎখাত অভিযান শুরু হয়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বাম ও রামপন্থীরা শরীক হয়। এ পর্যায়ে জামায়াতকে খুবই সন্তর্পণে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হয়।

১৯৮১ সালের ৩০মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর একাংশের হাতে নিহত হন। অতঃপর সুকৌশলে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রাজনীতিবাজদের দুর্নীতিবাজ আখ্যায়িত করে সেনাপ্রধান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সামরিক আইন জারী করে রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। ফলে অন্যান্য দলের সাথে জামায়াতের কার্যক্রমও সংকোচিত হয়ে যায়।

কিছুদিন পর জেনারেল এরশাদ দেশের বেসামরিক প্রেসিডেন্টকে সরায়ে দিয়ে নিজে প্রেসিডেন্ট হন। সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নিজে রাজনৈতিক দল গঠন করে উপজেলা সিস্টেম চালু করে উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন সম্পন্ন করেন। অতঃপর ১৯৮৬ সালে দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জামায়াত অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনের আগে ও পরে রাজনৈতিক পরিবেশ অনুকূল থাকায় সিলেটের সর্বত্র জামায়াতের প্রচুর মিটিং মিছিল হয়। নির্বাচনের পর সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা ময়দানের মত বিশাল ময়দানে জামায়াতের উদ্যোগে সর্বপ্রথম বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন জামায়াতের তৎকালীন সংসদীয় দলনেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। জনসভায় প্রচূর জনসমাগম হয়।

অতঃপর '৭৭/'৭৮ সালে সিলেট ছাত্র শিবিরের সাথে জাসদপন্থী ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এম সি কলেজে যাওয়ার পথে ছাত্রশিবিরের সাথে জাসদ ছাত্র লীগের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সংঘর্ষে জাসদ ছাত্রলীগের তিনজন নিহত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাম ও ধর্ম নিরপেক্ষবাদী জাতীয় নেতৃবৃন্দ সিলেটে অবস্থান করে উস্কানীমূলক বক্তব্য দিতে থাকেন। এতে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়। এ সময় তাদের চোরগোপ্তা হামলায় জামায়াত শিবিরের অনেকেই আহত হন। বেশির ভাগ আহত হন মসজিদে জামায়াতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যাবার বা ফিরার পথে, এসময় এ অঞ্চলে জামায়াতকে আত্মরক্ষামূলক বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। ফলে জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যক্রম কিছু দিনের জন্য স্তিমিত হয়ে যায়। এরশাদ দুনীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থের অপচয় রোধে কয়েকদিন সাইকেলে চড়ে অফিসে যাতায়াতের ভন্ডামী করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দুর্নীতি, অদক্ষতা, অনৈতিকতা ও বেহায়াপনার চরম বিস্তৃত লাভ করে। মানুষ এরশাদের চরম স্বৈরাচারী শাসনে অতীষ্ঠ হয়ে যায়। ফলে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এ সময় বি.এন.পির নেতৃত্বে ৭দল, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫দল ও জামায়াতে ইসলামী যুগপৎ আন্দোলনের সূচনা করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এম.পির নেতৃত্বে জামায়াতের ১০জন এম.পি জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের ফলশ্রুতিতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিতে বাধ্য হন।

www.pathagar.com

এ সময় সারাদেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল, সিলেটেও তাঁর পুরো ঢেউ লাগে। তখন সিলেটের রাজপথ বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের দখলে চলে আসে। এসময় সিলেটের রাজপথে জামায়াত ও ১৫দলের কর্মীদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। সিলেটে জামায়াত এককভাবে বিরাট ভূমিকা পালন করে।আন্দোলন চলাকালীন সময়ে সিলেটে ৭দল, ১৫দল ও জামায়াতের মধ্যে লিয়াঁজোর মাধ্যমে কর্মসূচি মিটিং মিছিলের স্থান ও স্ট্রেটেজি নির্ধারণ করা হত। বস্তুত এ সময় থেকে সিলেটের সবদলের নেতৃত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, সহমর্মিতা ও সহনশীলতা এমন পর্যায়ে উন্নীত হয় যে, তা সারাদেশের জন্য একটা উদাহরণ হয়ে দাঁড়ায়।

আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন হয়। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাব উদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। নির্বাচনে সবদল আলাদাভাবে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৯১ সালের এ নির্বাচনে বি.এন .পি. সংখাগরিষ্ঠতা অর্জন করে যদিও সরকার গঠনের জন্য এ সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। বি.এন.পি. জামায়াতের ১৮ জন এমপির সমর্থন কামনা করে। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকার গঠনে জামায়াতের সমর্থন কামনা করে ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খানের কাছে লিখিত চিঠি প্রদান করেন। চিঠির প্রেক্ষিতে জনাব সাইফুর রহমানের বাসভবনে বিএনপি ও জামায়াত প্রতিনিধির মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির জনাব সাইফুর রহমান, জনাব টিএইচ খান ও পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আব্দুল সালাম তালুকদার। জামায়াতের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন জনাব আলী আহসান মুজাহিদ ও জনাব কামারুজ্জামান। এ সময় আওয়ামী লীগ ও সরকার গঠনের জন্য জামায়াতের সমর্থন কামনা করে যোগাযোগ করে। দেশ ও জাতীর বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে জামায়াত বিএনপিকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠিত হয়। ১৯৯১ সালের জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অধ্যাপক গোলাম আযমের এমারত অতীতের মত আর Underground না রেখে তাকে প্রকাশ্যে আমীরে জামায়াত হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত হয়। দেশের স্বার্থে জাময়াত ইসলামী বি.এন. পিকে সমর্থন করায় বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তাদের সরকার গঠিত হয়। সরকার গঠিত হবার পর অধ্যাপক গোলাম আযমকে আমীরে জামায়াত হিসেবে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়া হয়। ঘোষণার পরপরই বাম ও রামপন্থীরা সারাদেশে হৈ চৈ সৃষ্টি করে। এ সময় ঘাদানিকের (ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি) সৃষ্টি হয়। তাঁরা ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বেআইনী গণআদালত সৃষ্টি করে অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রহসনমূলক বেআইনি বিচার অনুষ্ঠান করে। বি.এনপি সরকার এ সময় অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতাঁর করে কেন্দ্রীয় জেলে আটক করে। বাধ্য হয়ে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল ও জেল থেকে মুক্ত করার জন্য আইনী লড়াই ও গণআন্দোলন আরম্ভ করে। এ সময় সারাদেশের মত

www.pathagar.com

সিলেট অঞ্চলেও তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা হয়। আন্দোলনের কারণে সিলেটের রাজপথ প্রায়ই জামায়াত কর্মীদের দখলে থাকত। আন্দোলন ও আইনী লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল হয়। তিনি জেল থেকেও মুক্ত হন এবং বাংলাদেশের আইনসঙ্গত নাগরিক হিসেবে আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব প্রকাশ্যে আঞ্জাম দিতে থাকেন।

কেয়ারটেকার সরকার বা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইডিয়া অধ্যাপক গোলাম আযমের চিন্তার ফসল। জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা এই আইডিয়ার অনুমোদন করে। বিচারপতি শাহাব উদ্দীন আহমদের নেতৃে+ত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় পরিষদ নির্বাচন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় যদিও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সূক্ষ্ম কারচুপির কথা উল্লেখ্য করেছিলেন। দেশী বিদেশী সকল পর্যবেক্ষক এ নির্বাচনকে নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থার প্রশংসা করেন।

জামায়াতের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংবিধানে সংযোজন করার জন্য জাতীয় সংসদে কেয়ারটেকার সরকার বিল উত্থাপন করে। আওয়ামী লীগও কিছুদিন পর সংসদে কেয়ারটেকার সরকার বিল উত্থাপন করে। কিন্তু তৎকালীন বি.এন.পি. সরকার সংসদে এ বিলের উপর আলোচনা করার সুযোগ প্রদান করে নাই। কিছুদিন পর মাগুরা জেলার জাতীয় সংসদের একটি আসন শূন্য হয়। এ আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপনির্বাচনে সরকার কারচুপী করে নির্বাচনে জয়ী হয়। ফলে গোটা জাতীর কাছে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, দলীয় সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নিরপেক্ষ হবে না। এবার কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টির মধ্যে যোগাযোগ হয় । এ ইস্যুতে যুগপৎ আন্দোলন করার জন্য সবাই একমত হন। গঠিত হয় কেন্দ্রীয় লিয়াঁজো কমিটি। কমিটির মাধ্যমে যুগপৎ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু বি.এন.পি. সরকার আন্দোলনের প্রতি কর্ণপাত না করে তাদের মেয়াদ শেষে দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগ ও জাতীয়পার্টিসহ সকল বিরোধিদল নির্বাচন বয়কট করে আন্দোলন চালিয়ে যায়। এ সময় সিলেটেও যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয়। যুগপৎ আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা প্রাধান্য পায়। মিটিং মিছিলের সংখ্যা ও উপস্থিতির দিয়ে সিলেটে জামায়াতের অবস্থান ছিল সবার উপরে। আন্দোলনের এ পর্যায়ে বিশেষ একটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

সিলেট কোর্ট পয়েন্টে ও তাঁর আশেপাশে পূর্ব নির্ধারিত একই দিবসে জামায়াতে ইসলামী, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির আলাদা আলাদা সমাবেশ ও মিটিং চলছিল। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা জনাব আব্দুস সামাদ আযাদ, জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ও বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। মিটিং চলাকালীন অবস্থায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নেতা ইলিয়াস আলী তাদের দলবল নিয়ে অতর্কিত আওয়ামী লীগের মিটিং-এ

www.pathagar.com

হামলা চালায়। হামলায় আহত হন জনাব আব্দুস সামাদ আযাদ ও জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী। অনতিদূরে জামায়াতের মিটিং চলছিল। জামায়াতের মহানগরীর আমীর ডা.শফিকুর রহমান হামলার দৃশ্য অবলোকন করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মিটিং-এর কাজ স্থগিত করে কর্মীবাহিনীসহ ইলিয়াস আলী ও তাঁর দলবলকে ধাওয়া করেন। ফলে তাঁরা পালিয়ে যায়। ঐদিন যদি ধাওয়া না করা হত তাহলে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের অবস্থা খুবই সংগীণ হয়ে যেত।

যাইহোক বি.এন.পি. সরকার আন্দোলনের ভাষা ও গণসেন্টিমেন্ট প্রথম বুঝতে সমর্থ হয় নি। তাঁরা ১৯৯৬ সালের ১৫ফেব্রুয়ারি একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। এ নির্বাচন জাতি গ্রহণ করে নি। এটা বুঝতে পেরে তাঁরা সংসদ অধিবেশন ডেকে সংবিধানে নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা সংযোজন করে পদত্যাগ করে এবং সংসদ ভেঙে দেয় । এ সংসদের মেয়াদ ছিল মাত্র ১৩দিন।

এরপর থেকে সিলেটে যত আন্দোলন হয়েছে সব আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ট, বিশেষ করে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণকে কেন্দ্র করে জামায়াতের নির্দেশ নায় যে আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় তা ছিল ঐতিহাসিক।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ভবনের নামকরণ আন্দোলন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস :

সিলেট শহর থেকে ৮কি.মি. দূরে সুনামগঞ্জ রোডের উত্তর পাশে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন ৩২০ একর। ১৯৮৫-২০১৫সাল মেয়াদী মহাপরিকল্পনায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬০কোটি টাকা ব্যয় হবে।

সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি বহু পুরাতন। ১৯৩৬ সালে সিলেটের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কনভেনশন আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি উত্থাপন করা হয়। ১৯৪১ সালে আসামের শিক্ষামন্ত্রী সুনামগঞ্জের জনাব মুনাওয়ার আলী সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২য় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় এ উদ্যোগ আর অগ্রসর হয় নি। ১৯৪৫ সালে মি.জি. কে চৌধুরী 'সিলেট ইউনিভারসিটি স্কীম' তৈরি করে ২৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে প্রস্তাব করেন। ভারত বিভক্তি ও সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠানের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় আবার এ উদ্যোগ স্থগিত হয়।

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ড ফিল্ড মার্শাল আইয়ু খান সিলেট আসেন এবং এলাকাবাসীর দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুস্পষ্ট আশ্বাস প্রদান করেন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পীকার জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী আইয়ুব খানের বিদেশ অবস্থানকালীন সময়ে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হন। তিনি তড়িঘড়ি করে আইয়ুব খানের ওয়াদাকৃত সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে নিয়ে যান।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৮২ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিলেটবাসী আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা ময়দানে এক জনসভায় সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর বিশেষ প্রচেষ্টায় ১৯৮৭ সালের ১৮ মার্চ জাতীয় সংসদে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয় এবং ১৯৯১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ১২০ জন ছাত্রছাত্রী ও তিনটি বিভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

হযরত শাহজালাল (র) এর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেটে তাঁরই নামানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়। সিলেটবাসীর চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম তৈরি করা হয়। মনোগ্রামের অফিসিয়েল ব্যাখ্যায় বলা হয় : The monogram of Shahjalal University of Science & Technology expresses the greatest respect for the holy life of the famous saint Hazrat Shahjalal (R).

Islamic arch & minar have been used in decoration of the monogram symbolizing the mighty steps that had been taken by Hazrat Shahjalal (R) in propagating Islam.

The boat below signifies `Kisti'.There goes a heresay that he used his `Jainamaz' as `Kisti' to cross the river and canals.

The book in the middle signifies knowledge. Atom and compass have been used to put more emphasis on sciencece & technology.

`Two leaves and a bud' point to the characteristic features of Sylhet region, famous for tea plantation.

সিলেটবাসীর প্রত্যাশা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবারে সবাই এখানকার মানুষের আশা-আকাঙ্খা এবং এখানকার চিরায়ত ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মুখ পানে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সিলেটবাসীর প্রত্যাশা ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন একদিকে যেমন সিলেটবাসীর আবেগ-অনুভূতি ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে গড়ে তুলবে ঠিক তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ভবনের নামকরণের ক্ষেত্রে হযরত শাহজালাল (র) সঙ্গী-সাথী সিলেটের জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অগ্রাধিকার দেবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসন সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হল ও ভবনের নামকরণের ক্ষেত্রে ইসলাম ও সিলেট বিদ্বেষী মানসিকতার পরিচয় দেয়। অথচ সিলেটবাসীর আবেগ-অনুভূতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিন্ডিকেট নামকরণের ব্যাপারে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঠিক করে রেখেছিল। হযরত শাহজালাল (র) এর প্রধান আউলিয়াদের

www.pathagar.com

নামে শাবির ছাত্র হল সমূহের নামকরণ হবে আর ছাত্রী হল সমূহের নাম হবে সিলেটের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রধান নদী যথা সুরমা, কুশিয়ারা, মনু ও খোয়াই'র নামানুসারে। এই সিদ্ধান্তের আলোকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র হলের নামকরণ করা হয় 'হযরত শাহপরান হল'। কিন্তু ৩০ আগস্ট '৯৯ শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডেকেটের ৮৭তম সভা আগের স্থিরকৃত সিদ্ধান্ত না মেনে নিজেদের খেয়াল খুশিমত নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিলেন, সংকট সৃষ্টি করলেন। তাঁরা একটি মাত্র ছাত্র হলের নাম রাখলেন "জাহানারা ইমাম হল" সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের নাম দেওয়া হল "জি.সি দেব ভবন।" অন্য দুটি ভবনের নাম দেওয়া হল সত্যেন বোস ভবন ও ডা.কুদরতে খুদা ভবন। অস্তিত্বহীন ছাত্র হলের নাম দেওয়া হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল।

আন্দোলনের সূচনা

বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী সিলেটের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ভবনের নামকরণের ক্ষেত্রে এই বিশেষত্বের দিকে নজর না দেয়ার খবরটি তাৎক্ষণিকভাবে সিলেটের জনগণ জানতে পারে নি। প্রায় ১ মাস শাবি কর্তৃপক্ষ তথ্য গোপন করে রাখেন। ৩০ সেপ্টেম্বর সিলেটের একটি দৈনিকে এ খবর প্রকাশিত হয়। খবর প্রকাশিত হবার পর ছাত্র সমাজ ও সিলেটবাসীর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ডা.শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতৃবৃন্দের যৌথ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নামকরণের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য ও সিলেট উন্নয়ন যুব সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের আহবায়ক মনোনীত হন আহমদ রিপন মন্ডল, যুগ্ম আহবায়ক মোহাম্মদ আলম এবং সদস্য সচিব সুরমান আলী। সিলেট উন্নয়ন যুব সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক ছিলেন মাহমুদুল হোসেন তোফা, সেক্রেটারী এডভোকেট আলিম উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক মো.খালেদ নুর।

বিতর্কিত নামকরণের প্রতিবাদে প্রথম ছাত্র ধর্মঘট

৬ অক্টোবর শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ভবনের বিতর্কিত নামকরণের প্রতিবাদে ও সিলেটের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নামে নামকরণের দাবিতে সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের আহবানে সিলেটের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়।

৭ অক্টোবর খেলাফত মজলিশ সিলেট মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা এম.এন.জামান ও সেক্রেটারী ডাক্তার আখলাক আহমদ বিতর্কিত নামকরণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দেন। ১১ অক্টোবর সিলেট উন্নয়ন যুব সংগ্রাম পরিষদ কোর্ট পয়েন্টে সমাবেশের আয়োজন করে। এখানে বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা বারের সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা এডভোকেট আব্দুর রকিব, জাগপার দক্ষিণ সুরমা আহবায়ক আব্দুল মালেক, জাগপা যুবলীগ নেতা দীপক রায়, আঞ্জুমানে তালামীয়ে

ইসলামীয়ার সিলেট জেলা সেক্রেটারী হাফিজ ফখরুল ইসলাম, সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের আহবায়ক আহমদ রিপন মন্ডল, মাদরাসা ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক আলিম উদ্দিন, স্বাধীন বাংলা উলামা পরিষদ সিলেটের সেক্রেটারী মাওলানা আলী হায়দার, সিলেট যুব ফোরাম সভাপতি ফয়জুল্লাহ বাহার, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নেতা আ. ফ.ম. খালেদ চৌধুরী, ছাত্র নেতা মিয়া মোহাম্মদ আনছার প্রমুখ। এখান থেকে ১৫ অক্টোবর জেলা বার লাইব্রেরী হলে সর্বদলীয় মতবিনিময় সভার ঘোষণা দেওয়া হয়।

১৫ অক্টোবর 'শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল এবং সিলেটবাসীর প্রত্যাশা' শীর্ষক সর্বদলীয় মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও ভবনের নামকরণের ব্যাপারে সিন্ডিকেটের অযৌক্তিক ও সিলেট বিদ্বেষী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, তা না হলে সিলেটবাসী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করবেই। সিলেট উন্নয়ন যুব সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মাহমুদুল হোসেন তোফার সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন মদনমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী সিলেট মহানগরী আমীর ডা.শফিকুর রহমান, সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক বোরহান উদ্দিন খান, জামায়াতে ইসলামী সিলেট জেলা দক্ষিণের আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, সিলেট জেলা বারের সাবেক সহ-সভাপতি বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এডভোকেট আব্দুর রকিব, গণদাবি পরিষদের সিলেট জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আলাউদ্দিন চৌধুরী, জিয়া পরিষদ সিলেটের সভাপতি এডভোকেট আব্দুল মান্নান, বিশিষ্ট আইনজীবী আলহাজ্ব খন্দকার মোবাশ্বির আলী ও বৃহত্তর সিলেট উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ডা. হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সর্বসম্মতিক্রমে পরবর্তী কর্মসূচি ১৬অক্টোবর থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত গণসংযোগ ও পাড়া-মহল্লায় প্রতিবাদ সমাবেশ ও ২৩ অক্টোবর পৌরপয়েন্টে জন সমা বেশ এবং ২৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা ও বিশ্ববিদ্যায়ের প্রধান ফটকে অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

২৩ অক্টোবর প্রথম গণজমায়েত : যে দিন আন্দোলনের ভিত রচিত হয়

২৩ অক্টোবর '৯৯। পড়ন্ত বিকেলে সিলেট উন্নয়ন যুব সংগ্রাম পরিষদের আহবানে অনুষ্ঠিত হয় বিরাট গণজমায়েত। এ গণ জামায়েতে সিলেটের নেতৃবৃন্দের ঐক্যের সৃষ্টি হয় তা একটি বিরল দৃষ্টান্ত । সমাবেশে বক্তারা 'বিতর্কিত মহিলা' জাহানারা ইমামসহ অন্যান্য বিতর্কিত ব্যক্তিদের নামে শাবির হল ও ভবনসমূহের নামকরণের প্রতিবাদ করেন এবং সিলেটের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নামে নামকরণের দাবি জানান। তাঁরা বলেন, নাস্তিক মহিলার নামে নামকরণ শাহজালাল (র) সাথে বেয়াদবীর সামিল। পরিষদ সভাপতি মাহমুদুল হোসেন তোফার সভাপতিত্বে এবং এডভোকেট আলিম উদ্দিন ও খালেদ নুরের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বি.এন.পির সভাপতি এম.এ হক, জেলা জাতীয়

www.pathagar.com

পার্টি সভাপতি এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন, মহানগর জামায়াতের আমির ডা.শফিকুর রহমান, ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা এডভোকেট আব্দুর রকিব, জেলা দক্ষিণ জামায়াতের আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, খেলাফত মজলিসের জেলা নির্বাহী সভাপতি হাফেজ মো.মজদুদ্দিন, জেলা জাগপার আবহায়ক মকসুদ হোসেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল, ইসলামী ছাত্রশিবির, সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য, মাদরাসা ছাত্র আন্দোলন পরিষদ নেতৃবৃন্দ।

দানা বেঁধে উঠল আন্দোলন

ড.জাফর ইকবালের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের চাঁদ-তাঁরা নিয়ে অমার্জনীয় ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বিতর্ক সৃষ্টিকারী ড.জাফর ইকবাল ৪ নভেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে নিবন্ধের মাধ্যমে সিলেটের সর্বস্তরের ছাত্র জনতাঁর বিতর্কিত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য' ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প' বলে একদিকে যেমন তিনি সিলেটের সর্বস্তরের জনমতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, পাশাপাশি নিজেকে সিন্ডিকেট সদস্য বলে দম্ভোক্তি প্রকাশ করে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করাতে পারবে না বলে সিলেটবাসীর প্রতি প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন।

শিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও সিলেট শহর শাখার সভাপতি মো.সেলিম উদ্দিন প্রকাশ্যে ড.জাফর ইকবালের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেন, ' আমরা সিলেটবাসী ড.জাফর ইকবালের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম, প্রয়োজনে আমরা জীবন দেব; বিতর্কিত নামকরণ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সিলেটবাসী ঘরে ফিরে যাবে না।'

পদযাত্রাকে সামনে রেখে ব্যাপক গণসংযোগ : ৭০ আইনজীবীর বিবৃতি

১৪ নভেম্বর পদযাত্রাকে সামনে রেখে উন্নয়ন যুব সংগ্রাম পরিষদ ব্যাপক গণ-সংযোগ করে। সিলেটের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়, পাড়া মহল্লায় সভা সমাবেশের মাধ্যমে একটি গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। এ সময় সিলেট বারের ৭০জন আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী হলের প্রস্তাবিত নাম বিতর্কিত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় অভিযুক্ত জাহানার ইমামের নামে নামকরণ প্রত্যাহার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, জাহানারা ইমাম জীবিত থাকাবস্থায় সিলেটের পবিত্র মাঠিতে পা রাখতে পারেনি। সিলেটের মানুষ কোনভাবেই জাহানার ইমামের নামে হলের নামকরণ মেনে নিতে পারে না।

সিলেট উন্নয়ন যুব সংগ্রাম পরিষদের জন্য সবচেয়ে বড় কর্মসূচি ছিল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা। ১৪ নভেম্বর সকাল ১০টায় সমাবেশ ও সাড়ে বারটায় চৌহাট্টা পয়েন্ট থেকে এ পদযাত্রা শুরু হয় এবং বেলা ২টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান

www.pathagar.com

ফটকে অবস্থান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পদযাত্রা শেষ হয়। শহরের চৌহাট্টা থেকে প্রায় ৬কিলোমিটার দূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকমুখী এ পদযাত্রায় কয়েক হাজার ছাত্র জনতা অংশ গ্রহণ করে।

সংগ্রাম পরিষদ গঠন

২০ নভেম্বর সিলেট উন্নয়ন যুব সংগ্রাম পরিষদের আহবানে স্থানীয় একটি হোটেলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ্ হিতৈষী সংঘের সভাপতি এবং সিলেট গণদাবি পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি আলহাজ্ব আলাউদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল বৈঠকেই রাজনৈতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবনার আলোকে পরদিন অর্থাৎ ২১নভেম্বর জেলা বিএনপির সভাপতি জনাব এম.এ হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে গঠন করা হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। ঘোষণা দেওয়া হয় ৩ ও ৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধের এবং ৫ডিসেম্বর সিলেট শহরে সকাল সন্ধ্যা হরতালের। অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয় ভি.সি হাবিবুর রহমান এবং সিন্ডিকেট সদস্য ড.জাফর ইকবালকে। আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে প্রতিটি দলের প্রধানকে সদস্য করে ৮সদস্য বিশিষ্ট প্রেসিডিয়াম ও একজন সদস্য সচিব করে ৪৭সদস্য বিশিষ্ট সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। প্রেসিডিয়াম সদস্যবৃন্দ হলেন জেলা বিএনপির সভাপতি এম.এ হক, জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি এডভোকেট গিয়াস উদ্দীন আহমেদ, মহানগর জামায়াতের আমীর ডা.শফিকুর রহমান, খেলাফত মজলিসের জেলা নির্বাহী সভাপতি মাওলানা মজদুদ্দিন, মুসলিম লীগের আলহাজ্ব আলাউদ্দিন চৌধুরী, আল-ইসলাহর গৌসুল হক, জাগপার মকসুদ হোসেন ও নেজামে ইসলাম পার্টির ইসহাক আহমদ। সদস্য সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয় সিলেট উন্নয়ন যুব সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মাহমুদ হোসেন তোফাকে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন বিএনপির জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক চৌধুরী, শহর বিএনপির সভাপতি এহিয়া রাজা চৌধুরী, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবুল কাহের শামীম, জাতীয় পার্টি জেলা সহসভাপতি জহির উদ্দিন পল্টু, সাবেক প্রচার সম্পাদক আব্দুশ শহীদ লস্কর, জাতীয় পার্টি জেলা সমবায় সম্পাদক আব্দুল মালেক খান, জামায়াতে সিলেট জেলা দক্ষিণ শাখার আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, উত্তর জেলা আমীর আজীজুর রশীদ চৌধুরী, জামায়াতে ইসলামীর মহানগর সেক্রেটারী হাফেজ আব্দুল হাই হারুন, খেলাফত মজলিশের জেলা সহ সভাপতি মাওলানা রেজাউল করিম, শহর শাখার সেক্রেটারী ডা.আখলাক আহমদ, মাওলান সিরাজুল ইসলাম সিরাজী, মুসলিম লীগের এডভোকেট আহমদ আলী, নেজামে ইসলাম পার্টির জেলা সহসভাপতি নুরুদ্দীন চৌধুরী, আঞ্জুমানে আল ইসলাহর জেলা সেক্রেটারী অধ্যক্ষ মাওলানা মনোহর আলী, জাগপার আব্দুল মালেক, জাসাস সিলেট মহানগরী সভাপতি ডা. শাহরিয়ার হোসেন চৌধুরী, বঞ্চিত সিলেটবাসীর মহাসচিব আলহাজ্ব

www.pathagar.com

আতাউর রহমান, বৃহত্তর সিলেট শিক্ষা উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ডা.হাবিবুর রহমান, সিলেট সাহিত্য সংস্কৃতির পরিষদের আহবায়ক মোহাম্মদ রেদওয়ানুর রহমান, জাগো সিলেটের সভাপতি আলাউদ্দিন আলো, জাতীয় যুব কমান্ডের সহসভাপতি জোযাহিদ বখত পাপলু, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সিলেট শহর শাখার সভাপতি মো. সেলিম উদ্দিন, সেক্রেটারী রাজু মোহম্মদ শিবলী, ছাত্রদলের জেলা সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী মিজান, সেক্রেটারী আব্দুল ওয়াসেহ চৌধুরী জুবের, জাতীয় ছাত্র সমাজের সিলেট জেলা শাখার সভাপতি ও সেক্রেটারী, ছাত্র মজলিশের সিলেট শহর শাখার সভাপতি আব্দুল হান্নান, সেক্রেটারী সোয়ালেহীন করিম চৌধুরী তালামীযের জেলা সভাপতি আতাউর রহমান, সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম, জাগপা ছাত্রলীগ সভাপতি বনি হায়দার মান্না, মুসলিম ছাত্র পরিষদের সেক্রেটারী আব্দুস সালাম প্রমুখ।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন

শাবির নামকরণ বাতিলের আন্দোলনকে আরো তীব্র করার লক্ষ্যে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নীতিমালার আলোকে ২৮নভেম্বর গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

১লা ডিসেম্বর সিলেট কোর্ট পয়েন্টে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল কোর্ট পয়েন্টে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে প্রথম বড় ধরনের সভা। সমাবেশ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে শাবির হল ও ভবনের বিতর্কিত নামকরণ প্রত্যাহারের আহবান জানানো হয়। ঐ রাতে মহানগরী জামায়াতের অফিসে মহানগরী আমীর ডা.শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সংগ্রাম পরিষদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩ ও ৪ ডিসেম্বর শাবি অবরোধের ও ৫ ডিসেম্বর হরতাল কর্মসূচি সফল করে তোলার লক্ষ্যে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়।

৫ ডিসেম্বর সিলেট শহরে পালিত হয় নজির বিহীন ও শান্তিপূর্ণ সর্বাত্মক হরতাল।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও ভবনের বিতর্কিত নামকরণ বাতিল ও ৩৬০ আউলিয়ার মধ্য থেকে নামকরণের দাবিতে ৭ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য শাবিতে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এ ধর্মঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। সকল বর্ষের ঘোষিত সকল পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়।

সিলেটের জেলা প্রশাসক ১০ডিসেম্বর শাবি কর্তৃপক্ষ ও সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে এক যৌথ সভার আয়োজন করেন। সিলেটের ডিসি মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয় সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এক মাসের মধ্যে সিন্ডিকেটের সভা আহবান করার অনুরোধ করলে কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মত হন এবং এক মাসের মধ্যে সিন্ডিকেটের সভা আহবান করে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার আশ্বাস দেন। কিন্তু তিন দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে সমঝোতার কথা অস্বীকার করেন। ফলে আবার নতুন করে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ শাবি প্রশাসনের এ ধরনের উস্কানীমূলক আচরণ ও বিবৃতির তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিজেদের বিতর্কিত নামকরণকে যে কোন উপায়ে বাস্তবায়ন করার যে অপকৌশলে লিপ্ত রয়েছেন তাঁর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে চরম মূল্য দিতে হবে।

সংগ্রাম পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯ ডিসেম্বর সিলেটের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দেয়।১৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সম্মুখে অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে গেলে পুলিশ বিডিআরের যৌথ বাহিনী শান্তিপূর্ণ অবস্থানে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে বাধা প্রদান করে । এর প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষুব্ধ জনতা প্রশাসনিক এলাকায় শক্ত অবস্থান গড়ে তুলে। ফলে ঘন্টাখানেকের জন্য গোটা শহর অচল হয়ে পড়ে। অবস্থান ধর্মঘট সফলভাবে পালন শেষে সংগ্রাম পরিষদ ২২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে জঙ্গী মিছিল এবং ২৩ ডিসেম্বর সিলেটে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হয়।

২২ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পূর্বঘোষিত শাবি অভিমুখে জঙ্গী মিছিলে জনতাঁর ঢল নামে ।

বেলা ১টার দিকে সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ আখালিয়া আনসার ক্যাম্পের সামনের অবস্থান থেকে পুনরায় জঙ্গী মিছিল নিয়ে কোর্ট পয়েন্টের দিকে চলে আসেন। বেলা ২টায় জঙ্গী মিছিল যখন কোর্ট পয়েন্ট পেরিয়ে পত্রিকা পয়েন্ট ঘুরে পৌর পেয়েন্ট দিয়ে সুরমা মার্কেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন বন্দর বাজার পুলিশ ফাঁড়ির সামনে অবস্থানরত দাঙ্গা পুলিশ বিনা উস্কানিতে মিছিলে লাঠি চার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এসময় পুলিশের নির্বিচার লাঠি চার্জে শতাধিক সংগ্রাম পরিষদ নেতা কর্মী আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য জামায়াতের আমীর ডা.শফিকুর রহমান ও দক্ষিণ জেলা আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান সামনে এগিয়ে গেলে পুলিশ সিলেটের এককোটি মানুষের প্রাণ প্রিয় নেতা জনাব ডা. শফিকুর রহমানের উপর নির্মম আঘাত হানে এবং এক পর্যায়ে জামায়াতের দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমানকে গ্রেফতাঁর করে। সংঘর্ষ চলাকালে জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি এডভোকেট গিয়াসউদ্দিন আহমদ ও সেক্রেটারী আবুল কাশেম মন্টু পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জে আহত হন। মাওলানা হাবিবুর রহমানের গ্রেফতারের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্র জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠে। এ সময় পুলিশের সাথে জনতাঁর প্রচন্ড সংঘর্ষ হয় । এ সময় মহানগরী আমীর ডা.শফিকুর রহমান ঘোষণা করেন- ১৫মিনিটের মধ্যে মাওলানা হাবিবুর রহমানকে মুক্তি না দিলে জনতা কোর্ট পয়েন্ট ছাড়বে না। এ ঘোষণার পর বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। পরে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ মাওলানা হাবিবুর রহমানকে ১৫মিনিটের মাথায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ২৫ ডিসেম্বর শনিবার সিলেটে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেয়া হয়।

www.pathagar.com

ডেটলাইন ২৫ডিসেম্বর '৯১ : যে দিন বুলেটে ঝাঁঝরা হয় বিলালের বুক

পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২৫ ডিসেম্বর সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঐদিন কোর্ট পয়েন্টে বেলা ১১টায় গণ জমায়েতের কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হয়। ঐদিন রেজিষ্টারী মাঠে আন্দোলন বিরোধি শাবির নামকরণ বহাল রাখার পক্ষে মুক্তিযোদ্ধা জনতাঁর ব্যানারে আওয়ামী বামপন্থীরা সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনু, দীলিপ বড়ুয়া, ফয়েজ আহমদ, শাহরিয়ার কবির প্রমুখ।

সংগ্রাম পরিষদের হাজার হাজার কর্মী কোর্ট পয়েন্টের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশ বিডিআর বাধা প্রদান করে। সংগ্রাম পরিষদ নেতা ডা.শফিকুর রহমান, জনাব এম.এ হক ও মাওলানা হাবিবুর রহমান বাধা প্রদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট পরিতোষের সাথে কথা বলেন। অতঃপর তাঁরা জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারের সাথে ফোনে আলাপ করেন। কিন্তু বাধা অপসারিত না হওয়ায় সামনের মসজিদে তাঁরা জোহরের নামাজ পড়ার সুযোগ চান। কিন্তু প্রশাসন সে সুযোগও না দেওয়ায় জনতা রাস্তায় জোহরের নামায আদায় করে। নামাযের পর জনতা সামনে অগ্রসর হলে বিডিআর গুলি চালায়। রাইফেলের গুলিতে জিন্দাবাজার রাস্তায় শাহাদাতবরণ করেন শিবির নেতা শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া পাঠানটুলা মাদরাসার ছাত্র আব্দুল মুনিম বেলাল। আহত হন শতশত নেতা কর্মী। বেলালের শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে জনতা বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত রাস্তায় নেমে আসে। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রশাসন রাস্তার ব্যারিকেড তুলে নেয়। অতঃপর কোর্ট পয়েন্টে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদকে সিলেটে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। পরদিন হরতাল আহবান করা হয়।

২৬ডিসেম্বর হরতাল পালিত হয়। ঐদিন কোর্ট পয়েন্টে শহীদ বেলালের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় সর্বস্তরের মানুষ অংশ গ্রহণ করে। জানাযায় অংশ গ্রহণ করতে ঢাকা থেকে ছুটে আসেন ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। এছাড়াও অসুস্থ বর্ষীয়ান জননেতা খন্দকার আব্দুল মালিক জানাযায় অংশ গ্রহণ করেন এবং আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তব্য রাখেন।

২৭ডিসেম্বর রেজিস্টারী মাঠ থেকে বিশাল শোক মিছিল বের হয়। শোক মিছিল অংশ গ্রহণ করতে এবং সিলেটবাসীর আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করতে ঢাকা থেকে আগমন করেন কেন্দ্রীয় লিয়াঁজো কমিটির অন্যতম সদস্য এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা। তিনি বলেন শহীদ বেলালের রক্ত আজ আর শুধু সিলেটবাসীর সম্পদ এবং প্রেরণার উৎস নয়, সারা বাংলাদেশের তৌহিদী জনতাঁর প্রেরণার উৎস হয়ে গেল।

তিনি জনতাকে অবগত করেন শহীদ আব্দুল মুনিম বেলালের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় লিয়াজো কমিটি সারা দেশ ব্যাপী বিক্ষোভ পালন করবে।

www.pathagar.com

নাগরিক কমিটির গণ-সেমিনার

শাবির নামকরণ বাতিলের আন্দোলনে গোটা সিলেট যখন অগ্নিগর্ভ তখন সিলেট নাগরিক কমিটি আয়োজন করে গণ-সেমিনারের। মূলত, এই গণ-সেমিনারের মধ্য দিয়ে দেশের বুদ্ধিজীবীরা বিতর্কিত নামকরণ বাতিলের আন্দোলনে মাঠে নেমে পড়েন।

৫ফেব্রুয়ারি শহীদ সোলেমান হলে এ গণ-সেমিনারে অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীন সাংবাদিক বোরহান উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক দৈনিক জালালাবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আজিজুল হক মানিক। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সাবেক সেনাবাহিনীর প্রধান লে.জে (অব:) মাহবুবুর রহমান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড.আফতাব আহমদ, বিশিষ্ট মঞ্চ-টিভি অভিনেতা ও নাট্যকার আরিফুল হক, কলামিস্ট ও সাপ্তাহিক এভিডেন্স এর উপদেষ্টা সম্পাদক সাদেক খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রব, বিশিষ্ট কবি আব্দুল হাই শিকদার, সাংবাদিক এলাহী নেওয়াজ খান প্রমুখ।

বিভাগীয় সমাবেশ

৭ ফেব্রুয়ারি কোর্ট পয়েন্টে আযোজন করা হয় বিভাগীয় সমাবেশ। এ সমাবেশে কোর্ট পয়েন্ট থেকে পশ্চিমে তালতলা হয়ে কীনব্রীজ, উত্তরে জিন্দাবাজার পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। এ সমাবেশ অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় ব্যক্তিত্ব জনাব এম সাইফুর রহমান, হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলি, আল্লামা নুর উদ্দিন গহরপুরী, ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক। এ সমাবেশ থেকে ১৩ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লাগাতাঁর ৫দিনের হরতাল পালন করার আহবান জানানো হয়। ঘোষণা অনুযায়ী সিলেটে নজীর বিহীন হরতাল পালিত হয়।

ডেটলাইন ২৬শে মার্চ : পুলিশ বিডিআরের সহায়তায় হুমায়ূন আহমদের অনশন নাটক

২৬মার্চ ২০০০সাল। পুলিশ আর বিডিআরের নজীর বিহীন নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে এ দিন শাবির প্রধান ফটকে অনশন নাটক মঞ্চস্থ করলেন নাট্যকার হুমায়ূন আহমদ। আসলেই জীবন নাটকের চেয়ে আরো বেশি নাটকীয়তাঁর প্রমাণ করলেন হুমায়ূন আহমদ।

সড়কের মাঝপথ মদিনা মার্কেটের কাছে বিক্ষুব্ধ জনতা হুমায়ূন আহমদ ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের কে পাদুকা প্রদর্শন করে। এখানে জনতা হুমায়ূন আহমদের বইয়ের অগ্নিসংযোগ করে । অনশনে হাজার হাজার হুমায়ূন ভক্তের অংশ গ্রহণ করার কথা থাকলেও ঢাকা থেকে আশা হুমায়ূন আহমদের পরিবারের সদস্যসহ ৩০/৪০জন বন্ধু-বান্ধব ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে আবার ৭/৮জন স্থানীয় জনতা কর্তৃক হয়েছেন লাঞ্ছিতও।

www.pathagar.com

শাবি প্রধান ফটকে শহীদ বেলালের মায়ের অবস্থান ধর্মঘট

১৮এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল ৯টা ২৭মিনিটে শহীদ আব্দুল মুনিম বেলালের মাতা হালিমা খাতুন শাবি প্রধান ফটকে পৌঁছান। ৯.৩০মিনিটে তিনি বিশেষভাবে জনতা কর্তৃক নির্মিত প্যান্ডেলে অবস্থান গ্রহণ করেন। প্যান্ডেলে শহীদ জননীর সাথে বিপুল সংখ্যক মহিলাও অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর মেয়ে শাহানা খাতুন এবং ছেলে আব্দুল মুহিত দুলালও অবস্থান ঘর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেন।

শহীদ বেলালের মাতা হালিমা খাতুন অবস্থান ধর্মঘটে তাঁর লিখিত বক্তব্যে (পড়ে শুনান মাওলানা সুহেল আহমদ) বলেন, শহীদ বেলালের স্বপ্ন আওয়লিয়াদের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সমূহের নামকরণ হলেই আমি মনে করব শহীদ বেলালের রক্তদান সফল হয়েছে এবং এ ভাবেই আমি পুত্র হত্যার ন্যায় বিচার পেতে চাই।

শহীদ আব্দুল মুনিম বেলালের মাতাঁর অবস্থান ধর্মঘট পালনের পরও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নামকরণ প্রত্যাহারের দাবি মেনে না নিলে সংগ্রাম পরিষদ একের পর এক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এ সময় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর উদ্ভূত সমস্যার দ্রুত সমাধান করে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবিতে সিলেট শহরে, শাবি ক্যাম্পাসে এবং ঢাকা শহরে ব্যাপক কর্মসূচি পালন করে। ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে হস্তক্ষেপের আহবান জানায়। ঢাকাতে তাঁরা আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করে।

সংগ্রাম পরিষদ ৭মে সিলেটের প্রশাসনিক এলাকায় মহা-অবস্থান কর্মসূচি ঘোষণা করে।

এ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মহল সমঝোতাঁর উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন। শাবির সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন পৌর চেয়ারম্যান, সিলেট প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুকতাবিস উননুর, ইত্তেফাকের সিনিয়র সাংবাদিক হাসান শাহরিয়ার, দৈনিক প্রথম আলোর সিলেট ব্যুরো প্রধান আহমদ নুর সহ সিলেটের সিনিয়র সাংবাদিকগণ ।

এদিকে পরিস্থিতি যাতে আরো ঘোলাটে না হয় সে জন্যে সিলেটের সাংবাদিকগণ পত্রিকার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানকল্পে গাইডলাইন প্রধান করেন। মূলত এ নির্দেশনার আলোকেই সংগ্রাম পরিষদ, জেলা প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন যার যার অবস্থান থেকে কিছুটা নমনীয় হয়ে আসে। এরই ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর হাবিবুর রহমান সিন্ডিকেটের জরুরি সভা আহবান করেন।

সিন্ডিকেটের সভায় ভি.সি প্রফেসর হাবিবুর রহমান সিন্ডিকেটকে অবহিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বিচারপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন আহমেদ শাবির হল ও ভবনের নামকরণ স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

ভিসির এই ঘোষণা পত্রিকায় আসার পর জেলা প্রশাসক এর ভিত্তিতে সিলেটের সংগ্রাম পরিষদকে প্রথম দফা সমঝোতাঁর আহবান জানান।

www.pathagar.com

ত্রিপক্ষীয় বৈঠক : দাবি মেনে নিলেন শাবি কর্তৃপক্ষ

৮মে ২০০০ সোমবার । শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের বৈঠকে সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সিলেটের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নামকরণের বিষয়ে চ্যান্সেলর স্থগিতাদেশ সম্পর্কে সভাকে নিশ্চিত করে বলেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সিন্ডিকেটের সভায় এটা সদস্যদের অবহিত ও কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সভায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি এম.এ হক, জামায়াতে ইসলামী মহানগরী আমীর ডা.শফিকুর রহমান, জেলা জাপার সভাপতি এডভোকেট গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, খেলাফত মজলিশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুর রহরমান, জামায়াতে ইসলামী জেলা দক্ষিণের আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আরিফুল হক চৌধুরী, খেলাফত মজলিসের বিভাগীয় সমন্বয়কারী নেজাম উদ্দিন, শহর বিএনপির সভাপতি এহিয়া রেজা চৌধুরী, জেলা জাপার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাই কাইয়ুম, আঞ্জুমানে আল ইসলাহ কেন্দ্রীয় নেতা রফিকুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি সৈয়দ আবু নসর এডভোকেট পিপি, সাধারণ সম্পাদক আ.ন.ম শফিকুল হক। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো.আব্দুল আজীজ, রেজিস্ট্রার জামিল আহমদ চৌধুরী, শহপরান হল প্রভোস্ট প্রফেসর ড. গৌরাঙ্গ দেব রায়। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পৌরসভার চেয়ারম্যান বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, সিলেট প্রেসক্লাব সভাপতি মুকতাবিস উননুর ও পুলিশ সুপার এম.এ হানিফ।

সভার সমাপ্তিতে সভাপতির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ইতিবাচক সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক আখ্যায়িত করে বলেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘদিনের উদ্বেগ উৎকন্ঠার অবসান হল।

বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে এ সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সাহসী, আন্তরিক ও প্রত্যয়দীপ্ত ভূমিকা পালন করে মিথ্যার পতন নিশ্চিত করা যায়, কাংখিত বিজয় অর্জন করা যায়।মহান আল্লাহ পাকের ঘোষণা 'সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী' এ ওয়াদা মিথ্যা হতে পারে না। তাই দীর্ঘ আন্দোলনে শাবি কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। সফল হলো তৌহিদী জনতাঁর রক্তাক্ত প্রয়াস প্রচেষ্টা।

বি:দ্র: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সিলেট শাখার ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন স্মারক ২০০২ উজান মিছিল-এ প্রকাশিত এ.এম হারুনুর রশীদের প্রবন্ধ অবলম্বনে।

www.pathagar.com

দুর্গত মানবতাঁর পাশে জামায়াত

বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এ অঞ্চল। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশ প্রায়ই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি হয়ে থাকে। জামায়াতের ৩য় দফা কর্মসূচি আর্তমানবতাঁর সেবা করা। সংগঠন তাঁর সীমিত সামর্থ দিয়ে যা কিছু জোগাড় করা সম্ভব তা নিয়ে সর্বদা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৫৪ সালে এ অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা হয়। দুর্গত মানবতাঁর পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রচুর রিলিফ দ্রব্য নিয়ে আসেন। তাঁরা সিলেট থেকে সামসুল হক সাহেবকে সংগে নিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে রিলিফ পরিচালনা করেন। ষাট দশকের প্রথম দিকে জেনারেল আযম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর থাকাকালীন অবস্থায় চট্টগ্রামসহ সমগ্র উপকূল অঞ্চলে ভয়াবহ সাইক্লোন আঘাত হানে। এতে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সময় জামায়াতের সিলেট শাখার নেতৃবৃন্দ প্রচূর রিলিফ দ্রব্য সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম গমন করে। এ টীমের একজন সদস্য ছিলেন জনাব হেলাল উদ্দিন। ত্রাণ কার্য পরিচালনায় হেলাল সাহেবের কর্মতৎপরতা ও নিষ্ঠা তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগীয় আমীর জনাব আব্দুল খালেকের নযরে পড়ে। তিনি হেলাল উদ্দিনকে চট্টগ্রামে রাখার ব্যাবস্থা করেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে তাকে গড়ে তুলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিস সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করেন।

এভাবে দেশে যতবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, সিলেট অঞ্চল থেকে সাধ্যমত কমবেশ সহযোগিতাঁর হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৪ সালে দেশ ব্যাপক বন্যা কবলিত হয়। এ সময় মনু নদীর তীরে অবস্থিত মৌলভীবাজার শহর রক্ষা বাঁধ ও জুড়ী নদীর বাঁধে ব্যাপক ভাঙন সৃষ্টি হয়। ফলে মৌলভীবাজার শহরসহ জেলার অধিকাংশ অঞ্চল বানের পানিতে তলিয়ে যায়। জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সময় সিলেট থেকে উপদ্রুত অঞ্চলে যথেষ্ট ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সাধারণ জনগণ উদার হস্তে জামায়াতের রিলিফ ফান্ডে সহযোগিতা প্রদান করে।

১৯৯২ সালে দেশ আরো এক ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়। বন্যায় গোটা সিলেট অঞ্চল খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময় জেলার নেতা ও কর্মীবৃন্দ ত্রাণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রিলিফ সংগ্রহ অভিযানে বহু অপরিচিত ব্যক্তি জামায়াতের রিলিফ ফান্ডে ধারণাতীত অর্থ প্রদান করে। ফলে জামায়াত বন্যাউত্তর পুনর্বাসন কাজে অংশ গ্রহণ করে এবং শতাধিক টিউবয়েল ও দুশতাধিক আবাসগৃহ নির্মাণ করে দেয়।

এরপর ২০০৪ সালে খোদ সিলেট শহর ও সিলেট অঞ্চলে রেকর্ড ভঙ্গকারী, নজিরবিহীন বন্যার সম্মুখীন হয়। এসময় সিলেট পৌর এলাকার তিন-পঞ্চমাংশ জলমগ্ন হয়ে যায়। উপ শহর ছড়ারপার, কামালগড়, মাছিমপুর, কুশীঘাট, কালীঘাট, কাষ্টগড়, শেখঘাট, কুয়ারপাড়, খুলিয়াপাড়া ও সুরমা নদীর দক্ষিণপারস্থ বসতবাড়ি পানিতে তলিয়ে যায়। তখন শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে নৌকাই হয়ে যায় বাহন। সুপানীঘাট পয়েন্ট এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মুখস্থ তালতলা হয়ে যায় নৌকা ভিড়ার ঘাট ।

www.pathagar.com

এ সময় প্রচুর জামায়াত কর্মী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতদসত্ত্বেও জামায়াতের কর্মীগণ ব্যাপকভাবে রিলিফ কাজে অংশ গ্রহণ করেন। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জামায়াতের রিলিফ ফান্ডে সহযোগিতা প্রদান করে। বন্যাকালীন সময়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়। জামায়াতের কর্মীগণ সর্বপ্রথম বোতলজাত বিশুদ্ধ খাবার পানি ও পানি বিশুদ্ধ করণ টেবলেট আক্রান্ত পরিবারসমূহে পৌঁছায়ে দেয়। তাঁরপর মোমবাতি, দিয়াশলাই, শুকনা খাবার ও চিড়াগুড় ইত্যাদি পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে রান্না করা খাবার যেমন খিচুড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যাম্পে ও গৃহে পৌঁছে দেওয়া হয়। দূর্যোগকালীন এ সময়ে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও জামায়াতের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও আঞ্জুমানে খেদমতে কুরআন সিলেটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রখ্যাত মুফাচ্ছির কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাইদী সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্য সিলেটে তশরীফ আনেন। জামায়াত বন্যাউত্তর পুনর্বাসন কাজে অংশগ্রহণ করে। জামায়াতের ত্রাণ তৎপরতা জনগণের কাছে খুবই প্রশংসিত হয়। জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত দোয়া ও সহযোগিতা করে।

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ইদানিংকালে সর্ববৃহৎ ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলাসমূহে মারাত্মক আঘাত হানে। এ ঘূর্ণিঝড়ে বাতাসের গতিবেগ ছিল ২৫০ কিলোমিটারেরও অধিক। ঝড়ের আঘাতে দক্ষিণাঞ্চল ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। দশ সহস্রাধিক বনি আদম প্রাণ হারায়। সম্পদের ক্ষতি হয় অপূরণীয়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 'ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট' সুন্দরবনের এক-তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ ধবংস হয়ে যায়। বহু প্রজাতির পশু ও পাখি প্রাণ হারায়। দুর্যোগ পরবর্তী পিরিয়ডে তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়ে সিলেট মহানগরীর আমীর ডা.শফিকুর রহমান, সিলেট উত্তর জেলার আমীর জনাব আজিজুর রশীদ চৌধুরী ও সিলেট দক্ষিণ জেলার নায়েবে আমীর জনাব প্রিন্সিপাল আব্দুল হান্নানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী রিলিফ টীম প্রচুর পরিমাণ রিলিফ সামগ্রী নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলা পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরিশাল ও বাগেরহাটের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সফর করে এবং স্বহস্তে রিলিফ বিতরণ করে।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

জেলা ও থানা/উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের তালিকা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সিলেট মহানগরীর দায়িত্বশীলদের তালিকা

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	ডা. শফিকুর রহমান		হাফিজ আব্দুল হাই	
১৯৯৯	" "	" "	" "	
২০০০	ডা. শফিকুর রহমান		হাফিজ আব্দুল হাই	
২০০১	" "		" "	
২০০২	" "	হাফেজ আব্দুল হাই হারুন, ডা.সায়েফ আহমদ	এহসানুল মাহবুব জুবায়ের	
২০০৩	" "	" "	" "	
২০০৪	" "	হাফেজ আব্দুল হাই হারুন, এহসানুল মাহবুব জুবায়ের	ডা.সায়েফ আহমদ	
২০০৫	" "	" "	" "	
২০০৬	" "	এহসানুল মাহবুব জুবায়ের	ডা.সায়েফ আহমদ	
২০০৭	" "	এহসানুল মাহবুব জুবায়ের	ডা.সায়েফ আহমদ	
২০০৮	এহসানুল মাহবুব জুবায়ের	ডা.সায়েফ আহমদ	সিরাজুল ইসলাম শাহীন	

সিলেট মহানগরীর মহিলা দায়িত্বশীলদের তালিকা

সাল	দায়িত্বশীলার নাম	সেক্রেটারীর নাম
১৯৯৮	সৈয়দ মমতাজ বেগম	

www.pathagar.com

১৯৯৯	অধ্যাপিকা মাহফুজা সিদ্দিকা	
২০০০	" "	
২০০১	" "	
২০০২	" "	
২০০৩	" "	
২০০৪	" "	
২০০৫	" "	ডা. সুলতানা রাজিয়া
২০০৬	" "	" "
২০০৭	" "	" "
২০০৮	" "	" "

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সিলেট উত্তর সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বশীলদের তালিকা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	আজীজুর রশীদ চৌধুরী	মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী	আনওয়ার হোসাইন খান	
১৯৯৯	আজীজুর রশীদ চৌধুরী	মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী	আনওয়ার হোসাইন খান	
২০০০	আজীজুর রশীদ চৌধুরী	মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী	আনওয়ার হোসাইন খান	
২০০১	আজীজুর রশীদ চৌধুরী	মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী	আনওয়ার হোসাইন খান	
২০০২	আজীজুর রশীদ চৌধুরী	মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী	আনওয়ার হোসাইন খান	
২০০৩	আজীজুর রশীদ চৌধুরী	মাওলানা .আব্দুল মালিক চৌধুরী	আনওয়ার হোসাইন খান	
২০০৪	আজীজুর রশীদ চৌধুরী	মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী	আনওয়ার হোসাইন খান	
২০০৫	আজীজুর রশীদ চৌধুরী	মাওলানা আব্দুল মালিক চৌধুরী	আনওয়ার হোসাইন খান	

www.pathagar.com

২০০৬	আজীজুর রশীদ চৌধুরী	হাফেজ আনওয়ার হোসাইন খান	সৈয়দ ফয়জুল্লাহ বাহার	
২০০৭	আজীজুর রশীদ চৌধুরী	হাফেজ আনওয়ার হোসাইন খান	সৈয়দ ফয়জুল্লাহ বাহার	
২০০৮	" "	" "	" "	

সিলেট উত্তর সাংগঠনিক জেলার মহিলা দায়িত্বশীলাদের তালিকা

সাল	*দায়িত্বশীলার নাম*	সেক্রেটারীর নাম
২০০১	তাহেরা বেগম	
২০০২	" "	
২০০৩	" "	
২০০৪	" "	
২০০৫	" "	
২০০৬	" "	
২০০৭	" "	

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সিলেট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বশীলদের তালিকা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাও.হাবিবুর রহমান	অধ্যাপক আব্দুল হান্নান	মো. আব্দুল বাছিত	
১৯৯৯	" "	" "	" "	
২০০০	" "	" "	মো: মতিউর রহমান	
২০০১	" "	" "	" "	
২০০২	" "	" "	" "	
২০০৩	" "	" "	" "	
২০০৪	" "	" "	" "	
২০০৫	" "	" "	" "	
২০০৬	" "	" "	" "	

২০০৭	" "	" "	" "	
২০০৮	" "	" "	মাওলানা ফারুক আহমেদ	

সিলেট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার মহিলা দায়িত্বশীলাদের তালিকা

সাল	দায়িত্বশীলার নাম	সেক্রেটারীর নাম
১৯৯৮		
১৯৯৯		
২০০০		
২০০১		
২০০২		
২০০৩	গুলশাহানা খানম	
২০০৪	" "	
২০০৫	" "	
২০০৬	" "	
২০০৭	" "	
২০০৮	" "	

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সুনামগঞ্জ জেলার দায়িত্বশীলদের তালিকা

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাও.আহমদ হোসাইন	আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ সালেহ	মুহাম্মদ হাতিমুর রহমান	
১৯৯৯	আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ সালেহ		মুহাম্মদ হাতিমুর রহমান	
২০০০	" "		" "	
২০০১	" "		" "	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	" "		" "	

২০০৪	" "		" "	
২০০৫	মুহাম্মদ হাতিমুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)		মাও.তোফায়েল আহমদ খান (ভারপ্রাপ্ত)	
২০০৬	মুহাম্মদ হাতিমুর রহমান		মাও.তোফায়েল আহমদ খান	
২০০৭	মুহাম্মদ হাতিমুর রহমান		মাও.তোফায়েল আহমদ খান	

সুনামগঞ্জ জেলার মহিলা দায়িত্বশীলদের তালিকা

সাল	*দায়িত্বশীলার নাম*	*সেক্রেটারীর নাম*
১৯৯৮	ফাতেমা খাতুন	
১৯৯৯	রাবিয়া খাতুন	
২০০০	" "	
২০০১	" "	
২০০২	" "	
২০০৩	" "	
২০০৪	আয়েশা খাতুন	
২০০৫	আয়েশা খাতুন	
২০০৬	আয়েশা খাতুন	
২০০৭	রাহেলা খাতুন	
২০০৮	রাহেলা খাতুন	

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মৌলভীবাজার জেলার দায়িত্বশীলদের তালিকা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	*সেক্রেটারীর নাম*	*মন্তব্য*
১৯৯৮	দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব		মাওলানা আনোয়ার হোসেন খান	
১৯৯৯	দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব		আব্দুল মান্নান	

www.pathagar.com

২০০০	দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব		" "	
২০০১	দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব		" "	
২০০২	দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব		" "	
২০০৩	দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব		" "	
২০০৪	আব্দুল মান্নান		খন্দকার আব্দুস সোবহান	
২০০৫	" "		" "	
২০০৬	" "		মো.শাহেদ আলী	
২০০৭	" "		" "	

মৌলভীবাজার জেলার মহিলা দায়িত্বশীলদের তালিকা

সাল	*দায়িত্বশীলার নাম*	সেক্রেটারীর নাম
১৯৯৮	মুহতারামা জাহানারা নুর	
১৯৯৯	মুহতারামা জাহানারা নুর	
২০০০	মুহতারামা জাহানারা নুর	
২০০১	মুহতারামা শামসুন্নাহার আক্তার	
২০০২	মুহতারামা শামসুন্নাহার আক্তার	
২০০৩	মুহতারামা জাহানারা নুর	
২০০৪	মুহতারামা জাহানারা নুর	
২০০৫	মুহতারামা নাজমুন নাহার নাসরিন	
২০০৬	মুহতারামা নাজমুন নাহার নাসরিন	
২০০৭	মুহতারামা নাজমুন নাহার নাসরিন	
২০০৮	মুহতারামা নাজমুন নাহার নাসরিন	

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ হবিগঞ্জ জেলার দায়িত্বশীলদের তালিকা

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাওলানা মখলিছুর রহমান		আব্দুশ শহীদ এডভোকেট	
১৯৯৯	" "		" "	
২০০০	" "		অধ্যাপক আলী আযম সিদ্দিকী	
২০০১	" "		" "	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	" "		" "	
২০০৪	অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ উদ্দিন		" "	
২০০৫	" "		" "	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮				

হবিগঞ্জ জেলার মহিলা দায়িত্বশীলাদের তালিকা

সাল	দায়িত্বশীলার নাম	সেক্রেটারীর নাম
১৯৯৮		
১৯৯৯		
২০০০		
২০০১		
২০০২	শামসুন্নাহার শাহানা	
২০০৩	শামসুন্নাহার শাহানা	
২০০৪	" "	মাহফুজা সুলতানা
২০০৫	" "	" "
২০০৬	" "	" "
২০০৭	" "	" "

www.pathagar.com

থানা দায়িত্বশীলদের তালিকা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

সিলেট মহানগরী ১ নং সাংগঠনিক থানা

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
২০০৫	মাওলানা সুহেল আহমদ		ক্বারী আলী হায়দার	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		" "	

সিলেট মহানগরী ২ নং সাংগঠনিক থানা

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
২০০৫	সিরাজুল ইসলাম শাহীন		মাওলানা আব্দুল মুকিত	
২০০৬	সিরাজুল ইসলাম শাহীন		মাওলানা আব্দুল মুকিত	
২০০৭	সিরাজুল ইসলাম শাহীন		মাওলানা আব্দুল মুকিত	
২০০৮	মাওলানা আব্দুল মুকিত		মোহাম্মদ আব্দুর রব	

সিলেট মহানগরী ৩ নং সাংগঠনিক থানা

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
২০০৫	আব্দুশ শাকুর		মো. মজির উদ্দিন	
২০০৬	আব্দুশ শাকুর		মো. মজির উদ্দিন	
২০০৭	আব্দুশ শাকুর		মো. মজির উদ্দিন	
২০০৮	" "		" "	

www.pathagar.com

সিলেট মহানগরী ৪ নং সাংগঠনিক থানা

সাল	***আমীরের নাম***	***নায়েবে আমীরের নাম***	***সেক্রেটারীর নাম***	***মন্তব্য***
২০০৫	এফ.কে.এম শাহজাহান		মওলানা আমিনুল ইসলাম	
২০০৬	এফ.কে.এম শাহজাহান		মাস্টার আব্দুর রব	
২০০৭	" "		আব্দুল্লাহ আল মুনিম	
২০০৮	" "		" "	

সিলেট মহানগরী ৫নং সাংগঠনিক থানা

সাল	***আমীরের নাম***	***নায়েবে আমীরের নাম***	***সেক্রেটারীর নাম***	***মন্তব্য***
২০০৫	এডভোকেট জিয়া উদ্দিন নাদের		সোলায়মান আহমদ	
২০০৬	মুস্তাকিম আলী		সোলায়মান আহমদ	
২০০৭	এডভোকেট জিয়া উদ্দিন নাদের		জসিম উদ্দিন	
২০০৮	" "		" "	

সিলেট মহানগরী

সাল	***আমীরের নাম***	***নায়েবে আমীরের নাম***	***সেক্রেটারীর নাম***	***মন্তব্য***
২০০৫	জাহেদুর রহমান চৌধুরী		মাওলানা মুজিবুর রহমান	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		" "	

বি. দ্র. সিলেট মহানগরীতে ২০০৫ সালে সাংগঠনিক ৬টি থানায় কার্যক্রম শুরু হয়। এর পূর্বে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে মহানগরীর কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

www.pathagar.com

উপজেলা/থানা দায়িত্বশীলদের তালিকা

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

সিলেট উত্তর সাংগঠনিক জেলা

থানা : কোম্পানীগঞ্জ

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মো. নুরুল ইসলাম			
১৯৯৯			মো. আজমান আলী	
২০০০			" "	
২০০১			" "	
২০০২			" "	
২০০৩	মো. আব্দুল মালিক		" "	
২০০৪	মো. আব্দুল মালিক		" "	
২০০৫			" "	
২০০৬				
২০০৭			তোফায়েলুর রহমান	
২০০৮	আমিনুল ইসলাম			

থানা : গোয়াইন ঘাট

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	ডা. মুস্তাজিম আলী		আখলাকুল আম্বিয়া	
১৯৯৯	ডা. মুস্তাজিম আলী		" "	
২০০০	ডা. মুস্তাজিম আলী		" "	
২০০১	ডা. মুস্তাজিম আলী		" "	

২০০২	ডা. মুস্তাজিম আলী	আখলাকুল আম্বিয়া	মনজুর আহমদ	
২০০৩	ডা. মুস্তাজিম আলী	" "	মনজুর আহমদ	
২০০৪	ডা. মুস্তাজিম আলী		আখলাকুল আম্বিয়া	
২০০৫	মাও.আখলাকুল আম্বিয়া		দেলওয়ার হোসাইন	
২০০৬	আব্দুল মান্নান		মাও.আখলাকুল আম্বিয়া	
২০০৭	আব্দুল মান্নান		মাও.আখলাকুল আম্বিয়া	
২০০৮	মাও.আখলাকুল আম্বিয়া		মওলানা নেছার আহমদ	

থানা : জৈন্তাপুর

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাও.আব্দুল মান্নান		মো. জাকারিয়া	
১৯৯৯	মাও.আব্দুল মান্নান		মো. জাকারিয়া	
২০০০	মাও.আব্দুল মান্নান		মো. জাকারিয়া	
২০০১	মো. জাকারিয়া		মাও.আব্দুল মান্নান	
২০০২	মো. জাকারিয়া		মাও.মামুনুর রশীদ	
২০০৩	মো. জাকারিয়া		সিদ্দিকুর রহমান	
২০০৪	মো. জাকারিয়া		মাও.মামুনুর রশীদ	
২০০৫	মো. জাকারিয়া		মাও.মামুনুর রশীদ	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	

www.pathagar.com

থানা: কানাইঘাট

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাও.আব্দুল মালিক		মাও.সাইদুল ইসলাম	
১৯৯৯	মাও.আব্দুল মালিক		মাস্টার ফখর উদ্দীন	
২০০০	মাও.আ.হাই/ মাও.আ.করিম		মাও.কামালউদ্দীন	
২০০১	" "		মাও. কামালউদ্দীন	
২০০২	মওলানা আব্দুল হাই		মাও. কামালউদ্দীন	
২০০৩	" "		মাও. কামালউদ্দীন	
২০০৪	" "		মাও.জামাল আহমদ	
২০০৫	" "	মাও.আ.করিম	মাও.জামাল আহমদ	
২০০৬	মওলানা আব্দুল করিম		মাও.জামাল আহমদ	
২০০৭	মওলানা আব্দুল করিম		" "	

থানা: জকিগঞ্জ

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাস্টার আব্দুল খালিক		মো. জালাল উদ্দীন	
১৯৯৯	মাস্টার আব্দুল খালিক		মো. জালাল উদ্দীন	
২০০০	মাও.আব্দুল ওয়াহিদ		মো. জালাল উদ্দীন	
২০০১	মাও.আব্দুল ওয়াহিদ		মো. জালাল উদ্দীন	

www.pathagar.com

২০০২	মাও.আব্দুল ওয়াহিদ		মো. জালাল উদ্দীন	
২০০৩	মাও.আব্দুল ওয়াহিদ		মো. জালাল উদ্দীন	
২০০৪	মাও.আব্দুল ওয়াহিদ		মো. জালাল উদ্দীন	
২০০৫	মাও.আব্দুল ওয়াহিদ		মো. জালাল উদ্দীন	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	

থানা: সিলেট সদর

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	আব্দুর রব		এ.টি.এম শামসুদ্দীন	
১৯৯৯	আব্দুর রব		এ.টি.এম শামসুদ্দীন	
২০০০	আব্দুর রব		এ.টি.এম শামসুদ্দীন	
২০০১	নাসির উদ্দীন		এ.টি.এম শামসুদ্দীন	
২০০২	নাসির উদ্দীন		এ.টি.এম শামসুদ্দীন	
২০০৩	নাসির উদ্দীন		এ.টি.এম শামসুদ্দীন	
২০০৪	এ.টি.এম শামসুদ্দীন		মাও.হারিছ উদ্দীন	
২০০৫	এ.টি.এম শামসুদ্দীন		মাও.হারিছ উদ্দীন	
২০০৬	আব্দুর রব		" "	
২০০৭	আব্দুর রব		আব্দুর রব	
২০০৮	আব্দুর রব		ইসলাম উদ্দিন	

www.pathagar.com

উপজেলা/থানা দায়িত্বশীলদের তালিকা

সিলেট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা বালাগঞ্জ উপজেলা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	শাহ্ ইমরান আলী		সাজিদ মোহাম্মদ	
১৯৯৯	" "		" "	
২০০০	সাজিদ মোহাম্মদ		আব্দুস সাত্তার	
২০০১	" "		" "	
২০০২	আব্দুস সাত্তার		আছরারু্র রহমান	
২০০৩	" "		" "	
২০০৪	" "		" "	
২০০৫	" "		আব্দুল জলিল	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮				

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বালাগঞ্জ থানার খন্দকার বাজার এলাকায় ১৯৬০ দশকের মধ্যবর্তী সময়ে জামায়াতের প্রাথমিক কাজের সূচনা হয়। এ সময়ে যারা জামায়াতের সাথে জড়িত হন তারা হলেনঃ মাস্টার অহিদুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা আতাউর রহমান খান, মুন্সি ওমর আলী ও মোহাম্মদ ওয়ারিছ খান।

ওসমানী নগর থানা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮				
১৯৯৯				
২০০০				
২০০১				
২০০২	সাজিদ মোহাম্মদ		সোহরাব আলী	

২০০৩	" "		" "	
২০০৪	" "		" "	
২০০৫	" "		" "	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮		সোহরাব আলী	আনহার আহমদ	

থানা : বিশ্বনাথ

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	*সেক্রেটারীর নাম*	*মন্তব্য*
১৯৯৮	অধ্যাপক হাশমত উল্লাহ		মো. আব্দুল কাইয়ুম	
১৯৯৯	" "		" "	
২০০০	মো. আব্দুল কাইয়ুম		মাওলানা আখতার ফারুক	
২০০১	" "		" "	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	" "	আখতার ফারুক	নিজাম উদ্দিন সিদ্দিকী	
২০০৪	" "	" "	" "	
২০০৫	" "	" "	" "	
২০০৬	" "	" "	" "	
২০০৭	" "	" "	" "	
২০০৮	" "	আখতার ফারুক, এমাদ উদ্দিন	" "	

থানা : ফেঞ্চুগঞ্জ

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	*সেক্রেটারীর নাম*	*মন্তব্য*
১৯৯৮	আব্দুল মান্নান	মাওলানা	মঈন উদ্দিন	

www.pathagar.com

		খলিলুর রহমান চৌধুরী		
১৯৯৯	" "	" "	" "	
২০০০	" "	" "	" "	
২০০১	" "	" "	" "	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	" "	এফ আই চৌধুরী	" "	
২০০৪	আবুল কালাম আজাদ	আব্দুল মান্নান ও এফআই চৌধুরী	হাবিবুর রহমান	
২০০৫	" "	" "	সাইফুল্লাহ আল হোসাইন	
২০০৬	আব্দুল মান্নান	আবুল কালাম আজাদ	" "	
২০০৭	" "	" "	" "	
২০০৮	" "	আবুল কালাম আজাদ, হাবিবুর রহমান		

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ফেঞ্চুগঞ্জে জামায়াতের কাজের সূচনা করেন জনাব সালাহ্ উদ্দিন খাদেম, হাবিলদার ইসহাক ও খন্দকার রফিক প্রমুখ। তাঁর ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানার অস্থানীয় চাকরিজীবী ছিলেন। তাদেরকে স্থানীয় মুরুব্বী ও জামায়াতের সুধী মাস্টার মোতাহির আলী, মাস্টার আখলাকুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ বিশেষ সহায়তা দান করেন।

থানা: দক্ষিণ সুরমা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাওলানা ফারুক আহমদ			
১৯৯৯	" "		আব্দুল কুদ্দুস	
২০০০	" "		আব্দুল কুদ্দুস	

২০০১	" "		আব্দুল কুদ্দুস	
২০০২	" "	আব্দুল কুদ্দুস	মাও. লোকমান আহমদ	
২০০৩	" "	আব্দুল কুদ্দুস	" "	
২০০৪	মো. আব্দুল মতলিব দুদু মিয়া	মাও.আ.গফ্ফার বাবুল	" "	
২০০৫	" "	" "	আব্দুল কুদ্দুস	
২০০৬	" "	" "	" "	
২০০৭	" "	" "	" "	
২০০৮	" "	মাও.আ.গফ্ফার বাবুল, খাইরুল আফিয়ান চৌধুরী	" "	

থানা : গোলাপগঞ্জ

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	*সেক্রেটারীর নাম*	*মন্তব্য*
১৯৯৮	সৈয়দ নাসির উদ্দীন		হাফেজ নজমূল ইসলাম	
১৯৯৯	সৈয়দ নাসির উদ্দীন		হাফেজ নজমূল ইসলাম	
২০০০	সৈয়দ নাসির উদ্দীন	হাফেজ নজমূল ইসলাম	মো. কুতুব উদ্দীন	
২০০১	সৈয়দ নাসির উদ্দীন	হাফেজ নজমূল ইসলাম	মো. কুতুব উদ্দীন	
২০০২	সৈয়দ নাসির উদ্দীন	হাফেজ নজমূল ইসলাম	মো. কুতুব উদ্দীন	
২০০৩	সৈয়দ নাসির উদ্দীন	হাফেজ নজমূল ইসলাম	মো. কুতুব উদ্দীন	
২০০৪	আব্দুস সালাম আযাদ	হাফেজ নজমূল ইসলাম মো. কুতুব উদ্দীন	জিন্নুর আহমদ চৌধুরী	

www.pathagar.com

২০০৫	হাফেজ নজমূল ইসলাম	মো. কুতুব উদ্দীন	জিন্নুর আহমদ চৌধুরী	
২০০৬	" "	আব্দুস সালাম আযাদ	" "	
২০০৭	" "	" "	" "	
২০০৮	" "	আব্দুস সালাম আযাদ, জিন্নুর আহমদ চৌধুরী	আব্দুল আজিজ জামান	

থানা: বিয়ানীবাজার

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মো: মতিউর রহমান		সৈয়দ আবু কয়ছর	
১৯৯৯	" "		মাওলানা ফয়জুল ইসলাম	
২০০০	মাওলানা ফয়জুল ইসলাম	মো. আব্দুর রহীম	সৈয়দ আবু কয়ছর	
২০০১	" "	" "	" "	
২০০২	" "	" "	" "	
২০০৩	" "	" "	" "	
২০০৪	" "	" "	" "	
২০০৫	" "	" "	" "	
২০০৬	" "	সৈয়দ আবু কয়ছর	মাওলানা মোস্তফা উদ্দিন	
২০০৭	" "	" "	" "	
২০০৮	" "	সৈয়দ আবু কয়ছর, আব্দুর রহীম	" "	

বি:দ্র: বিয়ানীবাজার থানায় জামায়াতের কাজের সূচনা করেন মাওলানা ছফিউর রহমান, মাওলানা আব্দুল মান্নান, জনাব আব্দুল খালিক ও জনাব আব্দুল হাকিম তাপাদার।

www.pathagar.com

সুনামগঞ্জ জেলার উপজেলা/থানা দায়িত্বশীলদের তালিকা

থানা : সুনামগঞ্জ সদর উত্তর

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাস্টার আব্দুল হাকিম			
১৯৯৯	" "			
২০০০	মমতাজুল হাসান আবেদ		মাওলানা মতিউর রহমান	
২০০১	" "		" "	
২০০২	" "		লুৎফুল করীম	
২০০৩	" "		মাওলানা মতিউর রহমান	
২০০৪	মাও. তোফায়েল আহমদ খান		মোমতাজুল হাসান আবেদ	
২০০৫	মোমতাজুল হাসান আবেদ		মাও.আবু হানিফ নোমান	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		জাকির হোসেন রুবেল	

থানা: সুনামগঞ্জ সদর দক্ষিণ

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮				
১৯৯৯	মো. বদরুজ্জামান			
২০০০	মাস্টার আব্দুল হাকিম			
২০০১	" "			
২০০২	মো. বদরুজ্জামান			

www.pathagar.com

২০০৩	" "			
২০০৪	মাওলানা তোফায়েল আহমদ খান		মমতাজুল হাসান আবেদ	
২০০৫	মমতাজুল হাসান আবেদ		মাওলানা আবু হানিফ নোমান	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	মাওলানা আবু হানিফ নোমান			

সুনামগঞ্জ পৌরসভা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	*সেক্রেটারীর নাম*	*মন্তব্য*
১৯৯৮	এডভোকেট ইকবাল হোসেন		মমতাজুল হাসান আবেদ	
১৯৯৯	" "		" "	
২০০০	" "		মাওলানা তোফায়েল আহমদ খান	
২০০১	মাওলানা তোফায়েল আহমদ খান		এডভোকেট ইকবাল হোসেন	
২০০২	মাওলানা সাজিদুর রহমান		" "	
২০০৩	" "		" "	
২০০৪	" "		" "	
২০০৫	" "		" "	
২০০৬	এডভোকেট শামসুদ্দিন		" "	
২০০৭	" "		মাওলানা আবুল কালাম আজাদ	
২০০৮	" "		মাওলানা আবুল কালাম আজাদ	

www.pathagar.com

থানা: বিশ্বম্ভরপুর

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	হাফেজ শামছুল ইসলাম		আব্দুল্লাহ	
১৯৯৯	বদর উদ্দীন		আব্দুল্লাহ	
২০০০	বদর উদ্দীন		আব্দুল্লাহ	
২০০১	বদর উদ্দীন		আব্দুল্লাহ	
২০০২	অধ্যাপক আব্দুল্লাহ		হোসাইন আহমদ	
২০০৩	" "		হোসাইন আহমদ	
২০০৪	" "		হোসাইন আহমদ	
২০০৫	" "		হোসাইন আহমদ	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		" "	

থানা: ছাতক

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ		শাহ আলম	
১৯৯৯	মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ		শাহ আলম	
২০০০	মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ		শাহ আলম	
২০০১	মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ		শাহ আলম	
২০০২	মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ		মাও.মুখছুছুর রহমান	

www.pathagar.com

২০০৩	মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ		মাও.মুখছুছুর রহমান	
২০০৪	মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ		মাও.মুখছুছুর রহমান	
২০০৫	মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ		মাও.মুখছুছুর রহমান	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		" "	

ছাতক পৌরসভা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
২০০২	মাওলানা আহমদ হোসেন		জনাব শাহ আলম	
২০০৩	" "		" "	
২০০৪	জনাব শাহ আলম		মাওলানা মুজিবুর রহমান	
২০০৫	" "		" "	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		" "	

থানা: ধর্মপাশা

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাওলানা শরফ উদ্দিন			
১৯৯৯	" "			
২০০০	মাওলানা বোরহান উদ্দিন			

www.pathagar.com

২০০১	" "		সিদ্দিকুর রহমান ভুঁইয়া	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	" "		" "	
২০০৪	" "		মো. আব্দুল কাদির	
২০০৫	" "			
২০০৬	মো. আব্দুল কাদির		লুৎফুর রহমান	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "			

থানা: দিরাই

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	*সেক্রেটারীর নাম*	*মন্তব্য*
১৯৯৮	মো. নজরুল ইসলাম		গোলাম রব্বানী	
১৯৯৯	মো. নজরুল ইসলাম		হা. নুরুল আলম	
২০০০	মো. নজরুল ইসলাম		ইমারান হোসাইন	
২০০১	মো. নজরুল ইসলাম		ইমারান হোসাইন	
২০০২	মো. নজরুল ইসলাম		ইমারান হোসাইন	
২০০৩	মো. নজরুল ইসলাম		ইমারান হোসাইন	
২০০৪	হাফেজ নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী		নজরুল ইসলাম	
২০০৫	হাফেজ নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী		নজরুল ইসলাম	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস	
২০০৮	" "		মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস	

www.pathagar.com

থানা: শাল্লা

সাল	সভাপতির নাম		সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মো. হাফিজুর রহমান		মাওলানা ফখরুল ইসলাম	
১৯৯৯	" "		" "	
২০০০	হাফিজ নুরুল আলম সিদ্দিকী		মো. হাফিজুর রহমান	
২০০১	" "		" "	
২০০২	সোলাইমান মিয়া		" "	
২০০৩	হাফেজ নুরুল আলম সিদ্দিকী			
২০০৪	২০০৪ সাল থেকে শাল্লাকে দিরাই থানার একীভূত করা হয়			

থানা : দোয়ারাবাজার

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাও.আব্বাছ আলী		ডা. হারুনর রশীদ	
১৯৯৯	মাও.আব্বাছ আলী		ডা. হারুনর রশীদ	
২০০০	মাও.আব্বাছ আলী		ডা. হারুনর রশীদ	
২০০১	মাও.আব্বাছ আলী		ডা. হারুনর রশীদ	
২০০২	মাও.আব্বাছ আলী		ডা. হারুনর রশীদ	
২০০৩	মাও.আব্বাছ আলী		ডা. হারুনর রশীদ	
২০০৪	মাও.আব্বাছ আলী+আ.ছাত্তার		ডা. হারুনর রশীদ	
২০০৫	আব্দুস ছাত্তার		ডা. হারুনর রশীদ	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	মওলানা আতিকুর রহমান		খলিলুর রহমান	

www.pathagar.com

থানা: জগন্নাথপুর

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	সৈয়দ শাহনুর চৌধুরী		সৈয়দ সালেহ আহমদ	
১৯৯৯	সৈয়দ সালেহ আহমদ			
২০০০	মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন		দেওয়ান রুহুল আমীন	
২০০১	সৈয়দ শাহনুর চৌধুরী		মাওলানা শফিকুল ইসলাম	
২০০২	মাও.শফিকুল ইসলাম			
২০০৩	মাও.শফিকুল ইসলাম		মাও.নেছার উদ্দীন	
২০০৪	মাও.শফিকুল ইসলাম		মাও.নেছার উদ্দীন	
২০০৫	মাও.শফিকুল ইসলাম		মাও.নেছার উদ্দীন	
২০০৬	" "		মাওলানা লুৎফুর রহমান	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		" "	

থানা: জামালগঞ্জ

সাল	সভাপতির নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাওলানা সুসলেহ উদ্দীন		মো. আব্দুল মহিত	
১৯৯৯	হাবিবুর রহমান		নুরুল আলম	
২০০০	হাবিবুর রহমান		নুরুল আলম	
২০০১	মাওলানা সুসলেহ উদ্দীন		নুরুল আলম	

২০০২	নুরুজ্জামান (ভারপ্রাপ্ত)		আব্দুল আহাদ	
২০০৩	নুরুজ্জামান		আব্দুল আহাদ	
২০০৪	মো.আবুল হাসান		নুরুল আলম	
২০০৫	মো.আবুল হাসান		নুরুল আলম	
২০০৬	মওলানা হাবিবুর রহমান		" "	
২০০৭	" "		হাবিবুর রহমান	
২০০৮	মওলানা হাবিবুর রহমান		হাবিবুর রহমান	

থানা: মধ্যনগর

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাস্টার মনির উদ্দিন			
১৯৯৯	" "			
২০০০	" "			
২০০১	" "			
২০০২	" "			
২০০৩	" "		মাওলানা এনামূল হক তালুকদার	
২০০৪	" "		মো. লুৎফর রহমান	
২০০৫	" "		" "	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	ধর্মপাশা উপজেলার সাথে একীভূত			

থানা: তাহিরপুর

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য

www.pathagar.com

১৯৯৮	মো. শামসুল আলম		মিজানুর রহমান	
১৯৯৯	মো. শামসুল আলম		মিজানুর রহমান	
২০০০	মো. শামসুল আলম		মিজানুর রহমান	
২০০১	মো. শামসুল আলম		মিজানুর রহমান	
২০০২	মো. শামসুল আলম		মিজানুর রহমান	
২০০৩	মো. শামসুল আলম	মো. রুকন উদ্দীন	মিজানুর রহমান	
২০০৪	মো. শামসুল আলম	মো. রুকন উদ্দীন	মিজানুর রহমান	
২০০৫	অধ্যাপক রুকন উদ্দীন	মিজানুর রহমান	সিরাজুল ইসলাম	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		মাওলানা ফরিদ উদ্দিন	
২০০৮	মো. শামসুল আলম		মাওলানা ফরিদ উদ্দিন	

মৌলভীবাজার জেলার উপজিলা/থানা দায়িত্বশীলদে তালিকা

থানা: মৌলভী বাজার সদসর

সাল	আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	জনাব আইয়ূব আলী	সাইফুল ইসলাম	
১৯৯৯	" "	" "	
২০০০	" "	" "	
২০০১	" "	" "	
২০০২	ডা.আব্দুন নূর	মোস্তফা কামাল আখলাক	

www.pathagar.com

২০০৩	" "	" "	
২০০৪	" "	আলাউদ্দিন শাহ	
২০০৫	আলাউদ্দিন শাহ	আইয়ূব আলী	
২০০৬	" "	সাইয়েদ তারিকুল হামিদ	
২০০৭	" "	" "	

মৌলভীবাজার পৌরসভা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	ডা.আব্দুন নূর			
১৯৯৯	" "			
২০০০	" "			
২০০১	নজরুল ইসলাম শুয়েব			
২০০২	মো. ফারুক		সাদিকুর রহমান	
২০০৩	" "		" "	
২০০৪	শফিকুর রহমান		শহিদুজ্জামান আনসার	
২০০৫	মো. শাহেদ আলী		অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম	
২০০৬	অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম		মাওলানা হারুনুর রশীদ	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		আহমদ ফারুক	

থানা : কুলাউড়া

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	খন্দকার আব্দুস সোবহান		আব্দুল হামিদ খান	
১৯৯৯	" "		" "	

২০০০	" "		" "	
২০০১	" "		" "	
২০০২	নজরুল ইসলাম শুয়েব		" "	
২০০৩	" "		জাকির হোসাইন	
২০০৪	" "		" "	
২০০৫	অধ্যাপক আব্দুল মুছাব্বির		আব্দুন নুর	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		" "	

থানা : কুলাউড়া দক্ষিণ সাংগঠনিক

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	**সেক্রেটারীর নাম**	**মন্তব্য**
২০০৬	জাকির হোসেন		আব্দুল বাসিত	
২০০৭	জাকির হোসেন		আব্দুল বাসিত	
২০০৮	জাকির হোসেন		আব্দুল বাসিত	
২০০১	জাকির হোসেন		আব্দুল বাসিত	

থানা : কুলাউড়া পশ্চিম সাংগঠনিক

২০০৬	হাফিয খান		আতাউর রহমান আলম	
২০০৭	হাফিয খান		আতাউর রহমান আলম	
২০০৮	হাফিয খান		আতাউর রহমান আলম	

থানা : কমলগঞ্জ

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	**সেক্রেটারীর নাম**	**মন্তব্য**
১৯৯৮	আব্দুল গনি তরফদার		সৈয়দ আমিরুল ইসলাম	

www.pathagar.com

১৯৯৯	" "		" "	
২০০০	" "		" "	
২০০১	" "		" "	
২০০২	আনওয়ার উদ্দিন আহমদ		" "	
২০০৩	" "		" "	
২০০৪	আব্দুল গনি তরফদার		" "	
২০০৫	হাফেজ আব্দুল মতিন আমির		" "	
২০০৬	আব্দুল গনি তরফদার		" "	
২০০৭	" "		আজিজ আহমদ কিবরিয়া	
২০০৮	" "		আজিজ আহমদ কিবরিয়া	

থানা: শমশের নগর (সাংগঠনিক)

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
২০০৫	মাওলানা আব্দুল মুছাব্বির		আতিকুর রহমান চৌধুরী	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		আতাউর রহমান	
২০০৮	" "		আতাউর রহমান	

থানা : বড়লেখা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	আব্দুল মালিক		আজির উদ্দিন	
১৯৯৯	" "		" "	

২০০০	" "		" "	
২০০১	" "		" "	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	কমর উদ্দিন		মাওলানা ইসলাম উদ্দিন	
২০০৪	" "		" "	
২০০৫	" "		আজির উদ্দিন	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	আব্দুল মান্নান		" "	
২০০৮	আব্দুল মান্নান		" "	

থানা : রাজনগর

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	*সেক্রেটারীর নাম*	*মন্তব্য*
১৯৯৮	আব্দুল মান্নান		দেওয়ান মিসবাউল মজিদ কালাম	
১৯৯৯	দেওয়ান মিসবাউল মজিদ কালাম		শহিদুজ্জামান আনসার	
২০০০	" "		" "	
২০০১	" "		ফখল ইসলাম	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	" "		" "	
২০০৪	" "		" "	
২০০৫	" "		সোলাইমান হোসাইন	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		আবু রায়হান শাহীন	
২০০৮	" "		আবু রায়হান শাহীন	

থানা : শ্রীমঙ্গল

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	আব্দুল বাছিত হেলাল		আব্দুল বাছিত আহাদ	
১৯৯৯	" "		" "	
২০০০	মাওলানা ইসমাইল হোসেন		শেখ আব্দুল গাফ্ফার	
২০০১	" "		আব্দুল আওয়াল তরফদার	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	আব্দুল আওয়াল তরফদার		শেখ আব্দুল গাফ্ফার	
২০০৪	" "		মো. আব্দুল মতিন	
২০০৫	" "		" "	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		এটিএম শাহেদ গাজী	
২০০৮	" "		মো. আব্দুল মতিন	

থানা : জুড়ি

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮				
১৯৯৯				
২০০০				
২০০১				
২০০২	মাওলানা নজমূল ইসলাম	আব্দুল মুনিম হেলাল		

২০০৩	" "	" "		
২০০৪	মাওলানা আব্দুর রহমান		আব্দুল হাই হেলাল	
২০০৫	" "		" "	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		" "	

হবিগঞ্জ জেলার উপজেলা থানা দায়িত্বশীলদের তালিকা

থানা : হবিগঞ্জ সদর

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	আলী আজম সিদ্দিকী		শেখ আব্বাস আলী	
১৯৯৯	আব্দুর রহমান		শেখ আব্বাস আলী	
২০০০	আব্দুর রহমান		শেখ আব্বাস আলী	
২০০১	নুমান বিন আজিম		আব্দুল কুদ্দুস	
২০০২	নুমান বিন আজিম		আব্দুল কুদ্দুস	
২০০৩	নুমান বিন আজিম		আব্দুল কুদ্দুস	
২০০৪	কাজী মাহমুদুল হাসান		আব্দুল কুদ্দুস	
২০০৫	কাজী মাহমুদুল হাসান		আব্দুর রহমান	
২০০৬	কাজী মাহমুদুল হাসান		আব্দুল কুদ্দুস	
২০০৭	ক্বারী আব্দুস সাত্তার		আব্দুল কুদ্দুস	
২০০৮	আব্দুল কুদ্দুস		আব্দুর রহমান	

www.pathagar.com

থানা: আজমিরিগঞ্জ

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	ইকবাল আহমদ		মো. হাবিবুর রহমান	
১৯৯৯	ইকবাল আহমদ		মো. হাবিবুর রহমান	
২০০০	ইকবাল আহমদ		মো. হাবিবুর রহমান	
২০০১	ইকবাল আহমদ		আমিরুল হক তালুক.	
২০০২	ইকবাল আহমদ		মো. হাবিবুর রহমান	
২০০৩	ইকবাল আহমদ		মো. হাবিবুর রহমান	
২০০৪	ইকবাল আহমদ		মো. হাবিবুর রহমান	
২০০৫	ইকবাল আহমদ		মো. হাবিবুর রহমান	
২০০৬	ইকবাল আহমদ		মো. হাবিবুর রহমান	
২০০৭	ইকবাল আহমদ		মো. হাবিবুর রহমান	

থানা : বাহুবল

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	ডা.মো.আ.ওয়াদুদ		মাওলানা লুৎফর রহমান	
১৯৯৯	ডা.মো.আ.ওয়াদুদ		মাওলানা লুৎফর রহমান	
২০০০	ডা.মো.আ.ওয়াদুদ		আ.রউফ বাহার	

২০০১	ডা.মো.আ.ওয়াদুদ		আ.রউফ বাহার	
২০০২	ডা.মো.আ.ওয়াদুদ		আ.রউফ বাহার	
২০০৩	ডা.মো.আ.ওয়াদুদ		আ.রউফ বাহার	
২০০৪	ডা.মো.আ.ওয়াদুদ		মো. নাজির হোসাইন	
২০০৫	ডা.মো.আ.ওয়াদুদ	কাজী মনির উদ্দীন	মো. নাজির হোসাইন	
২০০৬	ডা.মো.আ.ওয়াদুদ		" "	
২০০৭	মো.সিরাজুল ইসলাম		মো. হাফিজুল ইসলাম	

থানা : বানিয়াচং

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	*সেক্রেটারীর নাম*	*মন্তব্য*
১৯৯৮	মাও.আব্দুর রাজ্জাক খান		মাও.মুবাশ্বির আহমদ	
১৯৯৯	" "		" "	
২০০০	মাও.আতাউর রহমান		মাও.লুৎফর রহমান খান	
২০০১	মাও.আব্দুর রাজ্জাক খান		ডা.খন্দকার তালেব উদ্দীন	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	" "		" "	
২০০৪	" "		" "	
২০০৫	ডা.খন্দকার তালেব উদ্দীন		মাস্টার হাফিজুর রহমান চৌ.	
২০০৬				
২০০৭				

থানা : চুনারুঘাট

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	কাজী মাওলানা আব্দুল জলিল		ইকরামুল মজিদ দুলাল	
১৯৯৯	ইকরামুল মজিদ দুলাল		মাওলানা আব্দুল মোছাব্বির	
২০০০	শাহ আব্দুর রব	মাওলানা আব্দুল মোছাব্বির	হাফিজ কামরুল ইসলাম	
২০০১	" "	" "	" "	
২০০২	মাওলানা আব্দুল মোছাব্বির		" "	
২০০৩	" "		" "	
২০০৪	শাহ আব্দুর রব	মাওলানা আব্দুল মোছাব্বির	হাফিজ কামরুল ইসলাম	
২০০৫	মাওলানা আব্দুল মোছাব্বির		" "	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	মাওলানা ইদ্রিস আলী	মাওলানা আব্দুল মোছাব্বির	শাহ আব্দুর রব	

থানা : লাখাই

সাল	আমীরের নাম	নায়েবে আমীরের নাম	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাওলানা আবু সাঈদ মো.জুনাইদ		মাওলানা জালাল আহমদ	
১৯৯৯	" "		" "	
২০০০	মাওলানা মাহমুদুল হাসান		মাওলানা ইমদাদুল ইসলাম চৌধুরী	
২০০১	মাওলানা ইমদাদুল ইসলাম চৌধুরী	মাওলানা জালাল আহমদ	একেএম তোয়াহা	

২০০২	মাওলানা আবু সাঈদ মো.জুনাইদ		মাওলানা ও জহিরুল ইসলাম	
২০০৩	" "		মাওলানা ইমদাদুল ইসলাম	
২০০৪	" "		একেএম তোয়াহা	
২০০৫	" "		" "	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	মাওলানা মাহমুদুল হাসান		মাওলানা আবু সাঈদ মা.জুনাইদ	

থানা: মাধব পুর

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মুহা.আলা উদ্দীন ভূইয়া	মুহা.আব্দুস শহীদ	মুহা.ছিদ্দিকুর রহমান	
১৯৯৯	" "	" "	" "	
২০০০	" "	" "	" "	
২০০১	" "	" "	" "	
২০০২	" "	" "	" "	
২০০৩	" "	" "	" "	
২০০৪	" "	" "	" "	
২০০৫	" "	" "	" "	
২০০৬	" "	" "	" "	
২০০৭	" "	" "	" "	

থানা: নবীগঞ্জ

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাওলানা আশরাফ আলী		মো. নূরুল হক	

১৯৯৯	মাওলানা আশরাফ আলী		মাওলানা আব্দুল আলীম	
২০০০	" "		" "	
২০০১	" "		" "	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	ডা.সিফাত আলী	মাওলানা আশরাফ আলী	মাওলানা আব্দুল আলীম	
২০০৪	" "	" "	" "	
২০০৫	" "	" "	" "	

থানা : নবীগঞ্জ উত্তর (সাংগঠনিক)

২০০৬	ডা.সিফাত আলী	মাওলনা আনসারুল ইসলাম	মাওলানা আব্দুল মুহিন	
২০০৭	" "		মাওলানা নুরুদ্দিন	

থানা : নবীগঞ্জ দক্ষিণ (সাংগঠনিক)

২০০৬	মাওলানা মোশাহিদ আলী	মাওলানা আশরাফ আলী	সাইদুল হক চৌধুরী	
২০০৭	" "	মাওলনা আনসারুল ইসলাম	মো. নুরুল হক	
২০০৮	মাওলানা আশরাফ আলী		মো. নুরুল হক	

থানা : শায়েস্তাগঞ্জ

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	মাও.আ.জলিল		ডা.শামসুর রহমান	
১৯৯৯	মাও.আ.জলিল		" "	
২০০০	ডা.শামসুর রহমান		মো: নুরুল হক	

২০০১	ডা.শামসুর রহমান		অলি উল্লাহ জহির	
২০০২	ডা.শামসুর রহমান		" "	
২০০৩	ডা.শামসুর রহমান		" "	
২০০৪	ডা.শামসুর রহমান		" "	
২০০৫	ডা.শামসুর রহমান		" "	
২০০৬	" "		" "	
২০০৭	" "		" "	
২০০৮	" "		" "	

হবিগঞ্জ পৌরসভা

সাল	*আমীরের নাম*	*নায়েবে আমীরের নাম*	সেক্রেটারীর নাম	মন্তব্য
১৯৯৮	আলী আযম সিদ্দিকী		শেখ আব্বাস আলী	
১৯৯৯	মো. আব্দুর রহমান		" "	
২০০০	নুর হোসেন এডভোকেট		" "	
২০০১	" "		" "	
২০০২	" "		" "	
২০০৩	মো.আব্দুর রহমান		নুর হোসেন এডভোকেট	
২০০৪	" "		" "	
২০০৫	মাওলানা মখলিছুর রহমান		মীর নুরুন্নবী উজ্জ্বল	
২০০৬	মো.আব্দুশ শহীদ এডভোকেট		" "	
২০০৭	মীর নুরুন্নবী উজ্জ্বল		কাজী মহসিন আহমদ	
২০০৮	কাজী মহসিন আহমদ		আব্দুল মুকিত পাঠান	

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ১ : একনজরে সিলেটের নাযেম/আমীরবৃন্দের তালিকা

নং	নাম	সময়কাল	পদবী
১	জনাব কামিল খান	১৯৫৩-১৯৫৬	নাযেম
২	মরহুম সামসুল হক	১৯৫৬-১৯৬৭	আমীর
৩	মরহুম হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান	১৯৬৭-১৯৬৯	আমীর
৪	মরহুম সামসুল হক	১৯৬৯-১৯৭১	আমীর
৫	মরহুম সামসুল হক	১৯৭১-১৯৮১	আমীর
৬	অধ্যাপক ফজলুর রহমান	১৯৮১-১৯৮৮	আমীর
৭	মাওলান ফরীদ উদ্দিন চৌধুরী	১৯৮৮-১৯৯০	আমীর
৮	ডা.শফিকুর রহমান	১৯৯১-১৯৯৮	আমীর
	সিলেট মহানগরী		
১	ডা.শফিকুর রহমান	১৯৯৮-	আমীর
	সিলেট দক্ষিণ জেলা		
১	মাওলানা হাবিবুর রহমান	১৯৯৮-	আমীর
	সিলেট উত্তর জেলা		
১	জনাব আজিজুর রশীদ চৌধুরী	১৯৯৮-	আমীর
	মৌলভীবাজার জেলা		
১	দেওয়ান সিরাজুল ইসলাম মতলিব	১৯৮৩-২০০৩	আমীর
২	জনাব আব্দুল মান্নান	২০০৪-	আমীর
	সুনামগঞ্জ জেলা		
১	মাওলানা আহমদ হোসাইন	১৯৮৪-১৯৯৮	আমীর
২	জনাব আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ সালেহ	১৯৯৯-২০০৪	আমীর
৩	জনাব হাতিমুর রহমান	২০০৫-	আমীর
	হবিগঞ্জ জেলা		
১	মাওলানা সাইদুর রহমান	১৯৮৫(অক্টোবর)-১৯৮৯	আমীর
২	সৈয়দ জে শাহ আলাম হোসেন এডভোকেট	১৯৮৯-১৯৯৫	আমীর

www.pathagar.com

৩	মাওলানা মখলিসুর রহমান	১৯৯৬-২০০৩	আমীর
৪	অধ্যাপক মাওলানা আশরাফ উদ্দিন	২০০৪-	আমীর

পরিশিষ্ট-২

বৃহত্তর সিলেটের রুকনদের মধ্যে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের তালিকা

নং	নাম	বাড়ি	ইন্তেকালের তারিখ ও সন	মন্তব্য
১	মরহুম সামসুল হক	কানাইঘাট	১৮.০৪.১৯৮৯	লন্ডনে ইন্তেকাল করেন।
২	মরহুম হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান	” ”	২৯.০৪.১৯৯৮	বিলাতে ইন্তেকাল করেন
৩	মরহুম মাওলানা আব্দুন নুর	লাওয়াই	৫.১১.২০০৬	লন্ডনে ইন্তেকাল করেন
৪	মরহুম সিরাজুল ইসলাম	জগন্নাথপুর	১৪.০৬.১৯৯৪	
৫	মরহুম আজির উদ্দীন আহমদ	শেখ ঘাট	২৯.১০.২০০২	
৬	মরহুম মাওলানা এখলাছুল মুওমিনিন	গোলাপগঞ্জ	১৫.১১.১৯৮৯	
৭	মরহুম আতাউর রহমান খান	বালাগঞ্জ	০৪.০২.১৯৯৫	
৮	মরহুম নূরুযযামান	গোয়াইনঘাট		ঢাকায় রুকন হন
৯	মরহুম নূর আলী চৌধুরী	বিয়ানী বাজার		খুলনায় ইন্তেকাল করেন
১০	মরহুম চৌধুরী আজিজুল হক	বালাগঞ্জ		ঢাকায় ইন্তেকাল করেন

www.pathagar.com

১১	মরহুম শাহ মাহবুবুস সামাদ	সিলাম	১১.০৩.১৯৯২	
১২	মরহুম সোহেল আহমদ চৌধুরী	গোলাপগঞ্জ	১৮.১১.১৯৯৫	
১৩	মরহুম এড.লুৎফুর রহমান জায়গীরদার	বালাগঞ্জ	০৫.০৬.১৯৯৫	
১৪	মরহুম ডা.হাবিবুর রহমান	বিয়ানীবাজার	১৬.০৯.১৯৯৩	
১৫	মরহুম রইস উদ্দিন আহমদ মীর	লক্ষীপুর	২০০০ সালে ৩রা রমজান	নিউইওর্কের রোড এক্সিডেন্ট ”
১৬	মরহুম হরমুজ আলী	উমাইরগাঁও		
১৭	মরহুম ছমির উদ্দীন	” ”		
১৮	মরহুম মাওলানা আব্দুল হাই	” ”		
১৯	মরহুম মাস্টার মইন উদ্দীন	” ”	২৬.০৮.০৪	
২০	মরহুম সালাহ উদ্দিন খাদেম	আখাউড়া	০৩.০৩.২০০৪	
২১	মরহুম ডা.কামরুল হুদা	কুমিল্লা	২৭.০৫.২০০৫	
২২	মরহুম আব্দুল খালিক	বিয়ানী বাজার		
২৩	মরহুম এডভোকেট সাইদুল হক	সিলাম	১৭.০৭.২০০৬	
২৪	মরহুম আব্দুল হাই	কানাইঘাট	২৫.০৩.২০০৬	
২৫	মরহুম ডা.সামসুল ইসলাম	ফেঞ্চুগঞ্জ	০৪.১২.২০০৪	
২৬	মরহুম ক্বারী মছদ্দর আলী	জগন্নাথ পুর	১১.১২.২০০৩	

www.pathagar.com

২৭	মরহুম হযরত মাওলানা ইদ্রিস শিবনগরী	কানাইঘাট	২৮.০৮.২০০৭	
২৮	" আলা উদ্দিন	সোনারপাড়া, সিলেট	২৬.১১.২০০৭	

মৌলভীবাজার জেলা

১	মরহুম এড.আব্দুল জালাল চৌ.	কুলাউড়া	০৩.০৭.১৯৯৬	
২	মরহুম আনিসুর রহমান মোক্তার	কুলাউড়া	১২.০৩.১৯৯৬	
৩	মরহুম সাংবাদিক বুরহান উদ্দিন খান	সিলাম	০২.০২.২০০৬	
৪	মরহুম মাস্টার বশির আহমদ	বড়লেখা	০৩.০৭.২০০৬	
৫	মরহুম আতিকুল হোসেন চৌধুরী	কুলাউড়া	১৮.০২.২০০১	
৬	মরহুম মাওলানা মুদাচ্ছির আলী	বড়লেখা	০২.০২.২০০২	
৭	মরহুম কুতুব উদ্দিন	বড়লেখা	১৭.০৮.২০০২	
৮	মরহুম অধ্যাপক শহীদুল্লাহ		১৪.০৮.২০০৭	

সুনামগঞ্জ জেলা

১	মরহুম এডভোকেট আব্দুল মতিন	ছাতক		
২	মরহুম মাওলানা সিরাজুল ইসলাম	জামালগঞ্জ	২৯.০৯.১৯৯৯	
৩	মরহুম আজির উদ্দিন নাযির	সুনামগঞ্জ সদর		
৪	মরহুম আলী হায়দার	বিশ্বম্ভর পুর	৩১.০৯.২০০২	
৫	মরহুম সৈয়দ শাহ নূর চৌধুরী	জগন্নাথ পুর	২১.০৮.২০০৪	
৬	মরহুম কাজী মাওলানা সৈয়দ মুশর্তাঁর আহমদ	জগন্নাথ পুর	২১ সেপটেম্বর ১৯৯৮	

www.pathagar.com

৭	মরহুম সৈয়দ দবির আহমদ	জগন্নাথ পুর	০৮.০৭.২০০৪	
৮	মরহুম এড.আব্দুর রউফ	সুনামগঞ্জ সদর		
৯	মরহুম আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সালেহ	ছাতক	২৫অক্টোবর ২০০৭	

হবিগঞ্জ জেলা

১	মরহুম এড. গোলাম রহমান চৌ.		২৩.১২.২০০৫	

পরিশিষ্ট-৩

জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আমীর ও সেক্রেটারীর তালিকা

১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল

আমীর : চৌধুরী আলী আহমদ খান

সেক্রেটারী : মাওলানা আব্দুর রহিম

১৯৫৬ থেকে ১৯৬৯ সাল

আমীর : মাওলানা আব্দুর রহীম

সেক্রেটারী : অধ্যাপক গোলাম আযম

১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ সাল

আমীর : অধ্যাপ গোলাম আযম

সেক্রেটারী : জনাব আব্দুল খালেক

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও বিজয় লাভের পর জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। এ সময় বিপর্যস্ত কর্মীদেরকে পুনর্বাসন কাজে যারা প্রধান ভূমিকা পালন করেন ক্রমানুসারে তাঁদের তালিকা :

১. মাওলানা আব্দুল জব্বার।
২. মাস্টার শফিকুল্লাহ।
৩. জনাব আব্দুল খালেক।
৪. মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী
৫. মাওলানা আব্দুর রহীম।
৬. অধ্যাপক গোলাম আযম।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর আমীর : অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০০সাল।

বি:দ্র: অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহাল না হওয়ায় ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৪সাল সাল পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মরহুম আব্বাস আলী খান। অতঃপর তিনি ১৯৯৯সাল পর্যন্ত আমরণ সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী ২০০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত।

www.pathagar.com

সেক্রেটারী জেনারেল

জনাব সামসুর রহমান : ১৯৭৯-১৯৮০ সাল।

মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ : ১৯৮১-১৯৮৩ সাল ।

মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী : ১৯৮৪- ২০০০সাল।

জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ : ২০০১- আজ পর্যন্ত।

যারা কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য জেলায় দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের তালিকা :

১. মরহুম সামসুল হক - প্রাদেশিক সাংগঠনিক সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলা ও বিভাগের সেক্রেটারী।
২. মরহুম নূরুযযামান - প্রাদেশিক প্রচার সম্পাদক।
৩. মরহুম হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান - কুমিল্লা জেলার সংগঠক।
৪. ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক - কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল।
৫. অধ্যাপক ফজলুর রহমান - সাবেক ঢাকা মহানগরী সমাজকল্যাণ বিভাগের সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য।
৬. মাওলানা ফরীদ উদ্দিন চৌধুরী - কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য।
৭. ডা.শফিকুর রহমান - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য।
৮. জনাব সিরাজুল ইসলাম মতলিব - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
৯. মাওলানা আহমদ হোসাইন - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
১০। মাওলানা হাবিবুর রহমান - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
১১. জনাব আজিজুর রশীদ চৌধুরী - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
১২. সৈয়দ শাহ আলম হোসাইন, এডভোকেট - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
১৩. জনাব আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সালেহ - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
১৪. মাওলানা মখলিছুর রহমান - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
১৫. ডা. ইয়াকুব - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
১৬. জনাব অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
১৭. জনাব আব্দুল মান্নান - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
১৮. জনাব হাতিমুর রহমান - কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য।
১৯. মরহুম নূর আলী চৌধুরী- খুলনা জেলা জামায়াতের আমীর ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য।

www.pathagar.com

২০. মরহুম চৌধুরী আযিযুল হক- ঢাকা মহানগর কর্মপরিষদ সদস্য।
২১. জনাব হেলাল উদ্দিন- চট্টগ্রাম বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর অফিস সম্পদাক।
২২. জনাব এহসানুল মাহবুব জুবায়ের-কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও মজলিশে শুরা সদস্য
২৩. জনাব ডা. সায়েফ আহমদ-কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য।

পরিশিষ্ট ৪ : সিলেটের বাসিন্দা প্রবাসী রুকনদের তালিকা

ক্রমিক	নাম	অবস্থান	মন্তব্য
০১	মাওলানা শামস উদ্দিন	ইংল্যান্ড	
০২	মাওলানা মোকাররম আলী	ইংল্যান্ড	
০৩	সৈয়দ সুহেল আহমদ	ইংল্যান্ড	
০৪	মাওলানা সৈয়দ সালেহ আহমদ	ইংল্যান্ড	
০৫	মাওলানা হাফিজ আবুল হোসাইন খান	ইংল্যান্ড	
০৬	মাওলানা নুরুল মতিন চৌধুরী	ইংল্যান্ড	
০৭	মাওলানা রেজাউল করিম	ইংল্যান্ড	
০৮	মাওলানা ফখরুল ইসলাম	ইংল্যান্ড	
০৯	মাহবুবুর রহমান চৌধুরী	ইংল্যান্ড	
১০	মোস্তাকিম আলী	ইংল্যান্ড	
১১	ডা.মালেকা বেগম	আমেরিকা	
১২	আব্দুল মালেক	আমেরিকা	
১৩	কমর উদ্দিন	আমেরিকা	
১৪	ফয়সল আহমদ	আমেরিকা	
১৫	মাওলানা আব্দুস শহীদ	আমেরিকা	
১৬	আব্দুল করিম	সৌদি আরব	

পরিশিষ্ট ৫ : রেফারেন্স বইয়ের তালিকা

১. Encyclopidia of India-
২. ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ - মাওলানা মওদুদী
৩. সিয়াসী কাশমাকাস - ” ”
৪. ইসলামী বিপ্লবের পথ - ” ”
৫. জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর - ” ”
৬. ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি - ” ”
৭. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস - আব্বাস আলী খান

www.pathagar.com

৮. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস - ” ”
৯. মাওলানা মওদুদী একটি জীবন, একটি ইতিহাস - ” ”
১০. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী - এ.কে.এম নাযির আহমদ
১১. জীবনে যা দেখলাম -অধ্যাপক গোলাম আযম
১২. পলাশী থেকে বাংলাদেশ - ” ”
১৩. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর - আবুল মনসুর আহমদ
১৪. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ’৭৫ - অলি আহাদ
১৫. একশ বছরের রাজনীতি - আবুল আসাদ
১৬. চিন্তাধারা ইসলামী সেমিনার সংকলন
১৭. ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র
১৮. বাংলাদেশের সংবিধান
১৯. সিলেট বিভাগের পরিচিতি - সৈয়দ মোস্তফা কামাল
২০. সিলেটের মাটি ও মানুষ - ফজলুর রহমান
২১. জালালাবাদের কথা - দেওয়ান নুরুল আনওয়ার হোসেন চৌধুরী
২২. সিলেটে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি - আব্দুল হামিদ মানিক
২৩. Lives of Robert Lindsay অনুবাদ - আব্দুল হামিদ মানিক
২৪. উজান মিছিল - ইসলামী ছাত্রশিবির সিলেট শাখার ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলন স্মারক।
২৫. অনুভবের অলিন্দে
২৬. যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি - লে.কর্ণেল শরীফুল হক ডালিম
২৭. তিন সেনা অভ্যুত্থান ও না বলা কিছু কথা - কর্ণেল হামিদ
২৮. চলমান জালালাবাদ : ইসলামী রেনেসাঁয় অনন্য যারা -মাওঃ শায়েখ তাজুল ইসলাম

সমাপ্ত

www.pathagar.com

কিছু কথা

বৃহত্তর সিলেটে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে অধ্যাপক ফজলুর রহমান উপমহাদেশের ইতিহাস থেকে অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ফলে বইটিতে এদেশে মুসলিম শাসনের অনেক খণ্ডচিত্র পাওয়া যায়।

সাত-আটশ বছরের দীর্ঘ ইতিহাস অধ্যয়ন করা যাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এ বইটি থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য তারা সহজেই পেয়ে যাবে।

–অধ্যাপক গোলাম আযম
সাবেক আমীরে জামায়াত
ও ভাষা সৈনিক